# ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা

[ অর্থাৎ চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম। ]

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

[ আদিপুরাণ ]

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক
বিরচিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা,
২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৭।

# সূচীপত্র।

# অবতরণিকা।

ভক্তাবতার শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রের সুবিমল মুখকান্তি বিগত চারি শত বৎসরের মধ্যে এত দূর মলিন ও বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে যে তাঁহার চরিত্রের যথার্থ ছবি অঙ্কিত করা এক্ষণে অতিশয় দুরূহ কার্য্য বলিয়া মনে হয়। এমন একটি স্বর্গীয় জীবন ভ্রান্তি কুসংস্কার মেঘে আবৃত হইয়া থাকিবে ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। চৈতন্যদেব আমাদের দেশের এবং জাতির গৌরব স্থল। ভূত কালের অন্ধকার হইতে তাঁহার প্রেমরঞ্জিত জীবনরত্ন যদি আমরা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে জাতিসাধারণের একটি পরম মঙ্গল সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যে তাঁহার মহচ্চরিত, অদ্ভুত কার্য্য বর্ণন করিব তদুপযুক্ত ধারণা শক্তি কোথা? ইহাত সামান্য ঘটনা বা সাধারণ মানবচরিত্র নহে যে ইচ্ছা করিলেই লিখিতে পারিব? গভীরাত্মা ভক্তগণ কখন কোন্ অভিপ্রায়ে কি কার্য্য করেন তাহা সামান্য বুদ্ধিতে কি হৃদয়ঙ্গম করা যায়? প্রকৃত বিশ্বাসী সাধুরা সেই অনন্ত গুণাকর জগদীশ্বরের মহিমার কণিকা মাত্র যাহা উপলব্ধি করিতে পারেন তাহার কিয়দংশ মাত্র ভাষা এবং বাহ্য ব্যবহার দ্বারা বাহিরে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহার অন্তর্গত যথার্থ তত্ত্ব গতানুগতিক শিষ্যপরম্পরায় নানাবিধ বিপরীত অর্থ এবং টীকার মধ্যে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া পড়ে, সুতরাং এক জনের জীবনগত প্রত্যক্ষ জ্ঞানলব্ধ পরমার্থতত্ত্ব অপরের বুদ্ধিগত পরোক্ষ জ্ঞানে কদাপি অনুভূত হইবার নহে। সাধু মহাজনেরা যে অবস্থায় যে ভাবে যে সত্যসুধা আস্বাদন করিয়াছেন, ঠিক তদবস্থাপন্ন তদ্ভাববিশিষ্ট না হইলে অন্যে তাহা কি রূপে উপলব্ধি করিবে? কিন্তু ভক্তচরিত্রের উপরিভাগে যে সকল সামান্য ঘটনা স্বভাবতঃ উদ্ভাসিত হয়, রসিক সাধুগণ তাহার অভ্যন্তরেই তাঁহাদের হৃদগত স্বর্গীয় প্রতিভা অবলোকন করিয়া থাকেন; এই ভরসায় চৈতন্যচরিতাখ্যান রচিত হইল। এই ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের জীবনক্ষেত্রে যে সকল আশ্চর্য্য অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে তাহা যেমন একদিকে কুতার্কিক বাহ্যদর্শী জ্ঞানীদিগের প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের দুরধিগম্য, তেমনি অপরদিকে বিজ্ঞানবিমুখ অন্ধোৎসাহী বিধিবাদিগণের

অবিশুদ্ধ ভক্তি বিশ্বাস এবং ভাবুকতারও অগোচর; কেবল তাহা নহে,স্বর্গীয় ভক্তি, এবং অধ্যাত্ম প্রেমরাজ্যের এমন সকল নিগূঢ় ঘটনা এবং অদ্ভুত ক্রিয়া আছে যাহা সাধারণ ধার্ম্মিকদিগেরও জ্ঞান বুদ্ধির অতীত। যিনি এই ত্রিবিধ সম্প্রদায়স্থ মানবস্বভাবের উদ্ধদেশে ভক্তিলীলার অত্যুচ্চ বিধানোপত্যকায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তিনিই কেবল সে সমুদায়ের প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণে সক্ষম। অদৃশ্য চিচ্ছক্তি এই ভক্তির প্রভাব যখন একটি আত্মা হইতে অপরাত্মাতে সংক্রামিত হয় তখন বিজ্ঞান বুদ্ধির অদর্শনীয় অনেক নূতন অলৌকিক কার্য্যও সংঘটিত হইয়া থাকে। সাধারণ লোকচক্ষুর অগোচরে বিশ্বাসী ভক্তগণের সম্মুখে বিজ্ঞানঘন ঈশ্বর এমন এক চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন যাহা কল্পনাতেও কখন আমরা অনুভব করিতে পারি না। বিশ্বাসী সেবক ভিন্ন প্রভুর গুপ্ত ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজি অন্য কেহ সম্ভোগ বা দর্শনে অধিকারী নহে। ঈদৃশ দৈবশক্তিশালী চৈতন্যের জীবন এবং ক্রিয়ার প্রকৃত ছবি চিত্রিত করিতে আমরা কত দূর সক্ষম হইব তাহা জানি না। সাধু ইচ্ছার প্রেরণায় এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা গেল। ভক্তিপথাবলম্বী হৃদয়বান্ সাধুসজ্জনগণ স্বীয় স্বীয় প্রজ্ঞা এবং প্রেমপ্রতিভানুসারে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া লইবেন। চৈতন্যচন্দ্রের প্রবল আকর্ষণে যে ভক্তিসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া এই বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিয়াছিল এবং যাহা মন্থন করিয়া তিনি এবং তাহার শিষ্যগণ বহুল ধনরত্ন আচণ্ডালে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, আনুসঙ্গিক তদ্বিষয়ক বিবরণও কিঞ্চিৎ ইহাতে থাকিল। চৈতন্যজীবনের হরিভক্তি ব্যাকুলতা প্রেমোন্মত্ততা বৈরাগ্য, এবং অন্যান্য ভক্তগণের ধর্ম্মভাব আলোচনা করিলে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয়। "চৈতন্যভাগবত" "চৈতন্যচরিতামৃত" "চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ভক্ত বৈষ্ণবগণের সাহায্য অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইল, এ নিমিত্ত আমরা ঐ সকল মহাত্মাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। এই পুস্তকের মধ্যে যে কেবল মানবজীবনের তরল কমনীয় বিভাগের বিচিত্র বিকাশমাত্র দৃষ্টিগোচর হইবে তাহা নহে, পদ্মরাগ মণির ন্যায় ঘনীভূত প্রেমবিজ্ঞান,এবং ভক্তিরসরঞ্জিত উজ্জ্বল হীরক সদৃশ দিব্যজ্ঞানের কঠিন সত্য সকলও ইহাতে দেখিয়া চিন্তাশীল সারগ্রাহী বিজ্ঞজনেরা আনন্দানুভব করিবেন। শ্রীমান গৌরচন্দ্রকে সেই সচ্চিদানন্দ প্রেমময় ঈশ্বরের অপরূপ প্রেমলীলার একখানি সুন্দর ছবি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অবশ্য আমরা যে চক্ষে গৌরলীলা দর্শন করিতেছি সকলেই কিছু সেরূপ দেখিবেন না। অনেকে মনে করিতে পারেন, বিজ্ঞানালোকিত সভ্যতার সময় বৈষ্ণব বৈরাগীর কথা আর কেন? ইহার ভিতর এমন কি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে যাহার জন্য অমূল্য সময় ব্যয় করা যাইতে পারে? বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক্ষণে যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে সহসা একরূপ প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু যাহারা হরিভক্তিকে ভাবান্ধতা, সাধু সম্মাননাকে নীচতা এবং অজ্ঞতা বলিয়া মনে করেন—মহাত্মা চৈতন্যদেব এবং তদীয় জ্ঞানবান্ উন্নত পদারূঢ় শিষ্যগণ কিরূপ উচ্চ প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন, তাহাদের চরিত্র কেমন বিশুদ্ধ এবং স্বভাব কেমন কোমল ছিল, এই সমগ্র দেশকে এক সময় তাহারা হরিভক্তিতে কেমন আন্দোলিত করিয়া গিয়াছেন,—তৎসমুদায় যদি তাহারা অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এ সম্বন্ধে কোনরূপ কুসংস্কার তাহাদের মনে স্থান পাইত না। আশা করি, ভগবানের কৃপায় কোন না কোন সময়ে প্রত্যেকেই ইহার আস্বাদন পাইয়া কৃতার্থ হইবেন।

পৃথিবীতে সাধু মহাপুরুষেরাই আদর্শ মনুষ্য। মানবজীবনের যদি কিছু গৌরব থাকে, তবে তাহা ঐ সকল ব্যক্তিদিগের দ্বারাই সপ্রমাণিত হইয়াছে। বহু সহস্র জ্ঞানী সভ্য ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকে তুলাদণ্ডের বামদিকে রাখিয়া দক্ষিণদিকে যদি এক জন পবিত্রাত্মা মহাপুরুষকে স্থাপন করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, দক্ষিণের কাটা ঝুলিয়া পড়ে।—রক্ত মাংস বিদ্যা বুদ্ধি মান ঐশ্বর্য্যের ভারে নহে, কিন্তু হরিভক্তির গুরুত্বে ঝুলিয়া পড়ে। এক এক জন মহাপুরুষের পবিত্র নিঃশ্বাসে এই পৃথিবীতে শত শত ধর্ম্মবীর উৎপন্ন হইয়া জনসমাজকে নীতি ও ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন। বিপুল পরাক্রমশালী ভূপতি ও সংগ্রামকুশল বীর পুরুষেরা বহু সহস্র সৈন্য এবং শাণিত যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা কত দেশ মহাদেশ জয় করিতে পারেন, তথাপি কাহারো হৃদয়কে তাহারা বশীভূত করিতে সক্ষম হন না। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষেরা কেবল ক্ষমা প্রেম দীনতার অস্ত্রে কত কত রাজ্য এবং দেশকে পদানত করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের ধন জন নাই যুদ্ধাস্ত্র বুদ্ধিকৌশল নাই, অতি দুঃখীর ন্যায় পৃথিবীতে আসিয়া, বহুল নির্য্যাতন অপমান সহ্য করিয়া তাঁহারা চলিয়া যান; পরিণামে তাহাদের মরণে লোকের জীবন, তাহাদের দুঃখ শোক অপমানে লোকের প্রচুর সুখ শান্তি মঙ্গল প্রসূত হয়

ঈশ্বরের কার্য্য যেমন আড়ম্বরশূন্য, অথচ তাহা অতি মহান্ ফল উৎপাদন করে, সাধু মহাপুরুষের কার্য্যও তেমনি প্রথমে প্রচ্ছন্ন, পরে দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া জগতে আলোক বিতরণ করে। যখন আমাদের ন্যায় মায়াবদ্ধ জীবগণ পাপপ্রবৃত্তিদিগকে দমন করিতে অক্ষম হইয়া ভগ্ন-হৃদয়ে অনুশোচনা করে, এক বিন্দু শান্তিরসের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়ায়, পরীক্ষা প্রলোভন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া হতাশ হয়, তখন দেখি হরিভক্ত সাধু অটল পর্ব্বতের ন্যায় শান্তভাবে সকল বহন করিতেছেন, বিশ্বাস ভক্তির বলে পৃথিবীতে বসিয়া সহস্র বিঘ্নের মধ্যেও শান্তি ও স্বর্গভোগ করিতেছেন। শত শত বিজ্ঞ পণ্ডিত যে তত্ত্ব শিক্ষা দিতে পারেন না, এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান কিংবা সূত্রধরের তনয় তাহা সহজে দেখাইয়া দেয়। ভগবান্ কি পদার্থ তাহা ভক্তকে না দেখিলে কেহ বুঝিতে পারিত না। ভক্তেরা জীবের দুর্গতি ভগবান্‌কে বলেন, এবং ভগবানের ঐশ্বর্য্য মহিমা জীবের নিকট প্রকাশ করেন। লোকগুরু ধর্ম্মাচার্য্যগণ ভগবান্ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে প্রেরিত। আত্মাদরপরায়ণ শিক্ষিত ব্যক্তিরা জ্ঞান সভ্যতার যতই অভিমান করুন না কেন, ইহাঁরা ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারেন না। পৃথিবীর উপার্জ্জিত বিদ্যা উপাধি ধন মানের কি এই দেবদত্ত প্রতিভার সঙ্গে তুলনা হয়? এখনকার কালে সাধারণতঃ শিক্ষিত দলের মধ্যে পাণ্ডিত্য এবং ধর্ম্মাভিমানের বড়ই প্রাদুর্ভাব। এই জন্য তাঁহারা উন্নতাত্মা ভক্তজনকে ভক্তি করিতে চাহেন না। প্রভাবশালী কবি, প্রতিভান্বিত বিজ্ঞানী, মহা যশস্বী ধনী, রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত, সমরকুশল বীর, ইহাঁরা জনসমাজের শিরোভূষণ বলিয়া গৃহীত হই-বেন, কেবল হরিভক্ত সাধুজনের প্রতিই বীতরাগ প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহার নিগূঢ় কারণ বহু দূরে নহে। সিদ্ধপুরুষ পবিত্রচরিত্র ভক্তগণ যাহা কিছু সৎ সে সমুদায় ঈশ্বরেতে আরোপ করেন। নিজেদের অসাধারণ মহত্ত্ব এবং শৌর্য্য বীর্য্য প্রতিভা সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র আমিত্ব সেখানে স্থান পায় না। ঈশ্বর ভিন্ন সত্য সাধুতা মঙ্গল কার্য্যের কর্ত্তা কেহ নাই, এই তাঁহাদের বিশ্বাস। কিন্তু আধুনিক জ্ঞানাভিমানী সাধুবিদ্বেষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা নিতান্ত অসহনীয়। আপনাদের বল বুদ্ধি ক্ষমতা সদনুষ্ঠান যাহা কিছু সমস্তই ইহাঁরা আপনাদের মহিমাপ্রতিপাদক জ্ঞান করত 'আমি কর্ত্তা" "আমি জ্ঞানী" ইত্যাকার অহং সূচক ভাব দ্বারা সর্ব্বদা পরিচালিত

হয়েন। যাহাতে আমিত্ব চরিতার্থ হয় না, নিজের অসার গরিমা লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না, সে সকল কার্য্যে ইহাঁদিগকে দেখিতে পাইবে না। প্রেরিত মহাপুরুষদিগকে গ্রাহ্য কবিও না, কিন্তু আমাদিগকে সুশিক্ষিত মার্জ্জিতবুদ্ধি কর্ত্তব্যপরায়ণ দেশহিতৈষী বলিযা জয়পত্র লিখিয়া দাও, আমাদের মত ও কার্য্যের অনুগামী হও, এই ইহাঁদের আন্তরিক অভিলাষ। উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ তাহা এখন সকলে বুঝিয়া লউন। কোন সৎ কার্য্যকে ঈশ্বরাভিপ্রেত বলিলে ঐ সকল লোকেব শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিবে, ভগবানেব প্রীতিকামনায় তাবৎ কার্য্য সাধন করা উচিত ইহা বলিলে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, কিন্তু বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত, বহুলোকসম্মত যে কার্য্য তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও শিরোধার্য্য। ইহাঁবা ঈশ্ববেব বিচার-সিংহাসনে উপবেশন কবত আত্মগৌরব চরিতার্থ করেন, অথচ মুখে তাঁহাকে সর্ব্বোপরি দেবতা বলিয়া জগতে ঘোষণা করিয়া থাকেন। সাধু পুরুষের প্রত্যাদিষ্ট বাক্য সহস্র অজ্ঞান অল্পবিশ্বাসীব বিচারে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে, হায! কি ঘোর কলি! জড় জগতে জড়প্রিয মানবেব জড়যন্ত্রপ্রসূত কার্য্যই এখন অভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। রক্ত মাংস অস্থি এবং বিষযবুদ্ধির দ্বাবা সাধুব দিব্যজ্ঞানালোক আচ্ছাদিত হয়, কি দুর্দ্দশা!

এ প্রকার পুস্তক যে জড়বাদী ভক্তিবিদ্বেষী জ্ঞানীদিগের পক্ষে রুচিকব হইবে না তাহা এক প্রকার নিশ্চয়; কেন না, সভ্যসমাজে শিক্ষিত দলেব ভিতরে জীবন্ত জ্ঞান ও কাবিত্বরস নাই, কেবল পুথিগত মৃত জ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রই সর্ব্বস্ব। তবে সভ্যতার নযনমুগ্ধকব নীতি ও বিজ্ঞানসম্বন্ধে ইহারা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত বটেন। কিন্তু আধুনিক জ্ঞান সভ্যতার যিনি যত কেন প্রশংসা করুন না, সেকেলে লোকাদগকে যতই কেন নির্ব্বোধ অসভ্য বলুন না, যথার্থ কথা বলিতে কি, পূর্ব্বকালেব লোকদিগের মত ইহঁাদের ঈশ্বরভক্তি দয়া প্রেম সরলতা এবং দৈববিদ্যা নাই। জ্ঞানী যুবক, তুমি হয়ত বলিবে, জ্ঞানের অল্পতা বশতঃ তাহাদেব বিশ্বাস ভক্তি অধিক ছিল, ইহা বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত না হওয়া, কল্পনাশক্তি অধিক থাকা এবং বস্তুতত্ত্ব না জানার ফল; বুদ্ধি কিঞ্চিৎ পবিমার্জ্জিত হইলে ভক্তি বিশ্বাস ঈশ্বর পরকাল ধর্ম্মসাধন এ সমুদায়েব আব কোন প্রয়োজন থাকিবে না, এক সভ্যতা প্রভাবেই সকল অভাব পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু

ইহা নিতান্ত ভুল। স্বাভাবিক বিশ্বাস ভক্তি বিজ্ঞানমন্দিরের সভ্যতার চরম শিখরের উপরে চির দিন বিরাজ করিবে। পূর্ব্বকালের সহজজ্ঞানসম্পন্ন হরিভক্তদিগের স্বাবলম্বিত বুদ্ধি ক্ষমতা বড় কমও ছিল না। দৈববলে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহারা যাহা বলিয়া এবং করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক কৃতবিদ্য-নামধারী যুবকদল শরীর পাত করিলেও তেমনটি পারিবেন না। এখন বিবিধ বিলাস সুখ সম্ভোগ করিয়া এবং উজ্জ্বল বিজ্ঞানালোক লাভ করিয়াও যে কেহ সুখী হইতে পারিতেছেন না তাহার কারণ এই যে,ইহাঁদের জীবনে হরিভক্তি এবং কবিত্বরস নাই। কেবল অঙ্ক কসিয়া সাধারণ নিয়ম দ্বারা চালিত হওয়া, ঈশ্বরের গূঢ় এবং উচ্চ নিয়মে বিশ্বাস না করাই ইহার কারণ। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মের অনেক উচ্চ কথা বলিয়া নিজেদের গৌরব ঘোষণা করেন, তাঁহাদের মধ্যেও শান্তিরসের বড় অভাব। অনেকে আবার নূতনবিধ কুসংস্কারে পতিত হইয়া ক্রমাগত অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছেন। ধর্ম্মের মধ্যে যাহা সার হরিভক্তি তাহা অধিকাংশের নিকট কল্পনা বলিয়া প্রতীত হয়। একে বিশ্বাস দুর্ব্বল, তাহাতে ভক্তি নাই, সাধনতত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞতাও যথেষ্ট, অথচ তাহার সঙ্গে সাধুতার অভিমান আছে, সুতরাং তাঁহাদের রোগ বড় কঠিন।

এক্ষণে জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি সভ্যতার উন্নতিসম্বন্ধে যেরূপ সুচারু বিধি স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় যেন সকল বস্তু কলের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে। বাস্তবিকও তাহাই বটে। জ্ঞান সভ্যতার প্রকাণ্ড কল ঘুরিতেছে, মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া যাই তাহার মধ্যে একবার পড়িল, অমনি মানুষ হইয়া গেল, কোন বিষয়েরই আর অভাব নাই। লোকে এখন আর কোন কার্য্য দৈহিক পরিশ্রম দ্বারা করিতে ইচ্ছা করে না। যদি এমন কোন কল থাকিত, তবে জীবনের সমুদায় দায়িত্ব ভাবনা চিন্তা তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হইত। এমন লোকও আছেন যাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার পর্য্যন্ত ভুল ধরিয়া থাকেন। এক্ষণে লোকের বুদ্ধির উপর এত নির্ভর হইয়াছে যে, ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব অনেকে স্বীকার করে না; যাহারা করে তাহারা বলে তিনি থাকেন থাকুন, আমাদের সঙ্গে তাঁহার কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। আদিমকালে যেমন প্রত্যেক ভৌতিক কার্য্য দৈবকার্য্য বলিয়া প্রতীত হইত, এখন তেমনি সমুদায় ব্যাপার বল বুদ্ধির অধীন, এইরূপ অনেকে মনে করেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে পেনসেন্ দিয়া

নিষ্ক্রিয় করিয়া বিদায় করিতে চাহেন, কিন্তু পারেন না। বিপদ ও মৃত্যু-কালে, স্ত্রীবিয়োগ বা পুত্রশোকের সময় তাঁহাদিগকে হয়ত আবার পঞ্চানন মঙ্গলচণ্ডী ষষ্ঠী মাকালের পূজা করিতে হয়। জ্ঞান সভ্যতার চরম উন্নতি হইলে অন্যান্য বিষয়ে কি হয় বলা যায় না, কিন্তু ঈশ্বরের নিজের কার্য্যও যে কল দ্বারা সম্পন্ন হইবে, এ কথাত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

দেবত্বপরিভ্রষ্ট হইয়া যে মনুষ্যগণ এইরূপে জড়যন্ত্রবৎ থাকিতে চায় ইহা তাহাদের পক্ষে ঘোর বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান এবং কবিত্বের মাধুর্য্যরস আস্বাদনের অভাবেই এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। অবোধ লোকেরা আপনার স্বভাবকে বিকৃত এবং বিনষ্ট করিয়া উন্নত হইতে চাহে। কিন্তু সে বিধাতার সৃজিত জীব, তাহার ভিতরে ভগবানের শক্তি অবস্থিতি করিতেছে ইহা সে জানে না; যখন জানিতে পারিবে তখন নিশ্চয় লজ্জিত হইবে।

আমরা যে বিষয়ের এক্ষণে অবতারণা করিলাম ইহা মানবস্বভাবের প্রাকৃতিক মহত্ত্বকে পরিপোষণ করিবে, এবং অসার জ্ঞানগর্ব্ব, বুদ্ধির অভিমানের অপদার্থতা বুঝাইয়া দিবে। ভক্তি এবং চৈতন্য যদিও এক্ষণে বৈষ্ণবদিগের আদৃত বিষয় বলিয়া সামান্যতঃ উপেক্ষিত হয়, কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধায়ী হরিভক্ত জনের নিকট ইহার আদর চিরকাল আছে এবং থাকিবে। যে সকল স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি মাতৃভূমির গৌরব ঘোষণা করিয়া থাকেন, মহাভাগ চৈতন্যের জীবন এবং ধর্ম্মসম্প্রদায় একটি অনুসন্ধেয় এবং সুখকর পাঠ্য বলিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নামের গুণে এই বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে। এই মহাত্মার জীবন যাঁহারা ভক্তির সহিত অধ্যয়ন করিবেন তাঁহাদের প্রাণ বিগলিত এবং হৃদয় পরিতৃপ্ত হইবে। এ প্রকার প্রেম-রসময় জীবন বর্ত্তমান কালের শান্তিরসহীন মায়ামুগ্ধ জীবগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন জানিয়া এবং মহাত্মা চৈতন্যের নাম সভ্যসমাজে চিরকাল উজ্জ্বল থাকিবে, ভক্তিপ্রার্থী দীনাত্মাদিগের নিকট তাঁহার জীবন আদর্শরূপে গৃহীত হইবে এই আশা করিয়া, আমরা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। দয়াময় সিদ্ধিদাতা হরি আমাদের সহায় হউন!

এই "ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা" পাঠে কোন তাপিত হৃদয় ভক্তিপিপাসু নরনারীর অন্তরে যদি বিন্দুমাত্র প্রেমরসের সঞ্চার হয়, তবে তাঁহারা যেন তাহার কিঞ্চিৎ অংশ গ্রন্থকারকে দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন।

# ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা।

## নবদ্বীপের প্রাচীনাবস্থা।

যে সময় চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন, তখন নবদ্বীপ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান ও জনসমূহের জ্ঞানধর্ম্মনীতিসম্বন্ধে যেরূপ অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিলে অনেক শিক্ষা লাভ হয়; এবং বর্ত্তমান কালের সঙ্গে তাহার তুলনা করিয়া দেখিলে অনেক বিষয়ে ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। এই নবদ্বীপ হিন্দু রাজত্বের শেষ অভিনয়ের রঙ্গভূমি। ইংরাজি ১২০৩ সালে মুসলমান সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজি যখন কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে নবদ্বীপ নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন হইতেই হিন্দু রাজত্বের সৌভাগ্যসূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। ভীরু স্বভাব লাক্ষ্মণের শূর সেন যবনসেনাপতির সমাগমবার্ত্তা যাই শুনিলেন, অমনি পশ্চাদ্দ্বার দিয়া সপরিবারে নৌকারোহণপূর্ব্বক জগন্নাথক্ষেত্রে পলায়ন করিলেন, মুসলমানেরা দেশ অধিকার করিয়া লইল। এই সেনবংশীয় রাজাদিগের ভগ্নাবশেষ চিহ্ন কিছু কিছু এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে যে স্থান নবদ্বীপ বলিয়া খ্যাত, ইহার উত্তর পূর্ব্ব অর্দ্ধক্রোশ দূরে রাজা বল্লাল সেন একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় এক বৃহৎ দীঘী খনন করেন। ইহা বল্লালদীঘী নামে প্রসিদ্ধ। দীঘী ও বাটীর চিহ্ন অদ্যাপি কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে। দীঘীর উত্তর দিকে বল্লালের ঢিবি নামে একটি উচ্চ স্থান দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে মৃত্তিকাগর্ভে অনেকানেক প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ চিহ্ন সকল বর্ত্তমান ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষেরা এই স্থান হইতে অনেক পাথর এবং পাথরের থাম লইয়া গিয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ আছে। ঐ উচ্চভূমি অগ্রে পুরাতন নবদ্বীপ ছিল। সে নবদ্বীপ এখন আর নাই, গঙ্গার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্বে এই নগরের দক্ষিণে পশ্চিমে গঙ্গা ও পূর্ব্বদিকে খড়িয়া নদী বহমানা ছিল। এই দুই নদী গোয়ালপাড়া নামক গ্রামের নিকট গিয়া মিলিত হয়। কিছু

দিনান্তে ভাগীরথীস্রোত পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া নবদ্বীপের উত্তরাংশ ভগ্ন করত বল্লালদীঘীর দক্ষিণে থড়িয়া নদীর মধ্যে গিয়া পড়ে। গঙ্গার স্রোতে নগরের উত্তর দিক্ ভগ্ন হওয়াতে অধিবাসিগণ ক্রমে দক্ষিণ দিকে আসিয়া বাস করেন, এই স্থান এখন নবদ্বীপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কিছু দিন পর্য্যন্ত ইহা একটি সামান্য পল্লীর ন্যায় ছিল। পরে অনুমান চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এক জন যোগী এখানে আসিয়া এক দেবীর ঘটস্থাপন করেন। তিনি এক জন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবীর মাহাত্ম্যও চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়ে। এই উপলক্ষে এবং সংস্কৃত অধ্যয়ন ও গঙ্গাস্নান করিবার মানসে নানা স্থান হইতে লোক সকল আসিয়া এই স্থানকে ক্রমে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে। এক্ষণে নবদ্বীপের উত্তর পূর্ব্বদিকে নির্ম্মলসলিলা স্রোতস্বতী ভাগীরথী প্রবাহিতা। কিন্তু নবদ্বীপকে একটি গণ্ডগ্রাম ভিন্ন এখন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না।

বহু পূর্ব্বে হিন্দুরাজত্বের সময় হইতে এক্ষণ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের মধ্যে এই নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চ্চাসম্বন্ধে একটি প্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, তথায় বহু লোকের বাস ছিল, লক্ষ লক্ষ লোক এক ঘাটে স্নান করিত, এবং অধ্যাপক পণ্ডিত ঘরে ঘরে। সামান্য জনসাধারণেও পণ্ডিতের ন্যায় কথা কহিত। এত দূর হউক না হউক, সে সময় যে নবদ্বীপ বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান স্থান ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তৎকালে ঐ অঞ্চলের লোকদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি কি রূপ ছিল, তাহারা কি ভাবে দিন কর্ত্তন করিত, তৎসম্বন্ধে কিছু লিখিলে বোধ হয় পাঠক মহাশয়দের বিরক্তিকর হইবে না।

মুসলমান নবাবদিগের আমলে এ দেশের উন্নতির দ্বার প্রায় সমস্তই বন্ধ ছিল। যেমন তাহাদের শাসনপ্রণালী, আচার বিচার, তেমনি তাহাদের চরিত্র; তখন কাহার শ্রাদ্ধ কে করিত তাহার ঠিক ছিল না। তবে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের জন্য কেহ ভাবিত না, প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি দেশে সঞ্চিত থাকিত। কিন্তু রাজা যদি অলস বিলাসপরায়ণ অসভ্য জ্ঞানহীন অস্থিরমতি হয়, তবে আর রাজ্যের মঙ্গল কিরূপে হইতে পারে? নবাবি আমলে প্রজারা এক প্রকার অতি অসভ্য বর্ব্বরের ন্যায় কাল যাপন করিত। সে সময় গৌড় নগর বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। কয়েক জন মিশর দেশীয় কাফ্রি দাস তখন প্রবল হইয়া রাজসিংহাসন অধিকার

করে। গৌরাঙ্গের জন্মের অব্যবহিত-পূর্ব্বে মল্লিক আণ্ডেল্ নামে এক কাফ্রি সেনাপতি তদীয় মনিব কোন এক ক্লীব নরপতিকে হত্যা করিয়া সে আপনি রাজা হয়। এই কাফ্রি মুসলমানেরা প্রজাবর্গের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিত।

বঙ্গীয়সমাজ অতি আধুনিক সমাজ, পূর্ব্বে এ দেশে সাঁওতাল ধাঙ্গড় কোল্ প্রভৃতিরই বসবাস ছিল। আর্য্যগণ কিরূপে এখানে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিলেন, বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি কি প্রণালীতে হইল, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। বোধ হয়, রাজা আদিশূরের কিছু পূর্ব্ব সময় হইতে দেশীয় আদিম অসভ্য এবং আর্য্যবংশের সম্মিলনে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইয়া থাকিবে এবং তাহারাই হিন্দুরাজত্বকালে ক্রমে ভদ্র বঙ্গীয় সমাজ সংগঠন করিয়াছে। মুসলমানদিগের উৎপীড়নে সামাজিক উন্নতির স্রোত কিছু দিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। বাঙ্গালীর ভিতরে যে এত গুণগ্রাম ছিল তাহা পূর্ব্বে কেহ জানিত না। এখন ইহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে বিলক্ষণ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। গায়ে আর একটু বেশী বল এবং মনে কিঞ্চিৎ সাহস ভরসা থাকিলে এমন কি ইহারা ইংরাজদিগের সঙ্গে লড়াই করিতেও পারিত। ফলে বঙ্গসমাজে এখন এক মহা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সে কালের সঙ্গে এখন আর কিছুরই প্রায় ঐক্য দেখা যায় না।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি ভদ্রলোকদিগের সামাজিক অবস্থা অবশ্য কতক পরিমাণে তখন ভাল ছিল। কায়স্থেরা পার্সি বিদ্যা শিখিয়া নবাবসংসারে রাজকর্ম্ম করিতেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা টোলধারী তাঁহাদের মধ্যেই শাস্ত্রচর্চ্চা অধিক ছিল, তদ্ব্যতীত গুরু পুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও নামমাত্র কিছু কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন, অপর ব্রাহ্মণগণ পাঁচ রকম উঞ্ছ বৃত্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বাঙ্গালা ভাষার তখন জন্ম হয় নাই, প্রাকৃত গ্রাম্য ভাষা পার্সি এবং উর্দ্দুর সহিত মিলিত হইয়া এক প্রকার প্রচলিত ভাষা প্রস্তুত হয়, তাহা দ্বারা কার্য্য চলিত। অধিকাংশ ভদ্রাভদ্র লোকই মূর্খ ছিল। বিদ্যা বুদ্ধি শাস্ত্র ধর্ম্ম এ সমস্ত অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণেরা আপনাদের নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখনকার স্ত্রী পুরুষদিগের শরীর দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং মন অত্যন্ত সাদা সিদে ছিল। পুরুষেরা খুব খাইতে পারিত, নিমন্ত্রণে গিয়া কেহ কেহ হয়ত

এক বগুনা ডালই খাইয়া ফেলিত। আহারের বিষয়ে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে, সে সব কথা থাকুক। দাড়ি গোঁফ রাখার প্রথা ছিল না, কিন্তু সকলের মাথায় টিকি শোভা পাইত। ঘাড় কামান, থরকাটা, ঝুল্পি এবং দীর্ঘ কেশ তাহারা ভালবাসিত। জুতা পায় দেওয়ার রীতি প্রায় ছিল না, অনেকেই খড়ম ব্যবহার করিতেন। আহারের মধ্যে মোটা চাউল, পরিধান দেশীয় সূতার স্থূল বসন। চাকুরে লোকেরা অপেক্ষাকৃত সৌখীন ছিলেন। প্রাচীনেরা এখনকার মত পাড়ওয়ালা ফিন্‌ফিনে কাপড় পরা, বার্ণিষযুক্ত বুট পায়, গোঁফে কলপ মাখান সুখপ্রিয় বাবু ছিলেন না, তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; পাড়া প্রতিবাসীর প্রতি যথেষ্ট স্নেহ মমতা করিতেন, আত্মীয় কুটুম্ব ভাই বন্ধু সকলকে লইয়া এক পরিবারে থাকিতেন, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেন। বাশুলী ও বিষহরির পূজা, মঙ্গলচণ্ডীর গান, ঢাকের বাদ্য, ভেড়ার ঢুঁ, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি আমোদের বিষয় ছিল। বগুাগোচের ভদ্রলোকেরা খুব পাঁঠা মহিষ ভেড়া বলিদান করিতে পারিত। স্ত্রীলোকেরা মোটা মোটা রূপার গহনা এবং নিজহাতে কাটা সূতার কাপড় পরিতেন। সমস্ত দিন ভাত রাঁধা, ধান ভানা, গোবরনেদি দেওয়া, পৈতা তৈয়ার করা, শিকে বুনান, এই তাঁহাদের কার্য্য ছিল। পুরুষদের শাসনে স্ত্রীলোকেরা কাঁপিত, ঘোমটা একটু কম কিংবা কথা একটু উচ্চ হইলে তাহার নিন্দা বাহির হইত। কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই চরিত্র সাধারণতঃ বিনম্র ধর্ম্মভীত ছিল। তখন সুখ বিলাসের প্রতি লোকের এত দৃষ্টি পড়ে নাই।

ধর্ম্মসম্বন্ধে এখনও যেমন তখনও প্রায় তেমনি, ভূতপ্রেত দৈত্য দানব বিষহরি মঙ্গলচণ্ডী ঘেঁটু ষষ্ঠী প্রভৃতি গ্রাম্যদেবতার উপর ভয়মূলক এবং সুবিধাপ্রসূ বিশ্বাসেরই অধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যাইত। প্রভেদ এই, এখন লোকে বিশ্বাসের শিথিলতার সঙ্গে অনুষ্ঠানের দৃঢ়তা অনেক ত্যাগ করিয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না; স্বার্থের অনুরোধে, সমাজের এবং বসন্ত ওলাউঠার ভয়ে ধর্ম্মভাব সকলেই প্রকাশ করিতেন। এখন যেমন অবিশ্বাস সন্দেহ নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হয় তখন এরূপ ছিল না। ভয় বা স্বার্থমূলক ধর্ম্মবিশ্বাস হইলেও সে কালের নরনারীগণ দেবতার দৈবশক্তি ক্ষমতার উপর নিঃসন্দেহ বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। ব্রাহ্মণদের ভয়ানক প্রতাপ ছিল, তাহাতেই সাধারণ লোকদিগকে ধর্ম্মকার্য্য সাধনে বাধ্য করিত। গুরু পুরোহিতের সঙ্গে কোন কথার তর্ক বিচার চলিত না,

তাঁহারাই এক প্রকার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। কায়স্থ নবশাখ প্রভৃতি জাতিকে ব্রাহ্মণেরা অনায়াসে বাপান্ত করিতে পারিতেন, তাহাতে কাহারো দ্বিরুক্তি করিবার সাহস হইত না। তখন শূদ্রদিগের পক্ষে মহা সঙ্কটের কাল ছিল, তাঁহারা ব্রাহ্মণের সঙ্গে একত্র বসিতেও পাই-তেন না।

ধর্ম্মের নিয়ম অনেকে পালন করিতেন, কিন্তু কেবল অক্ষরে, ভাব রক্ষা করিতে পারিতেন না। দুই পাঁচ জন অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমুদয় স্ত্রীপুরুষ স্বার্থকামনায় এবং ভয়প্রযুক্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিত। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি তাহা না জানিয়া তাহারা কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সংসারবাসনা চরিতার্থ করিত। নিষ্পাপ হইয়া ভগবানের পদারবিন্দ লাভ করিব, সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিব, চিন্তা বাক্য কার্য্য পবিত্র হইবে, ইন্দ্রিয়গণ বশে থাকিবে, ইষ্ট দেবতার প্রতি প্রেম ভক্তি অনুরাগ বিকসিত হইবে, এ সকল মহৎ ভাব তখন ছিল না, এক্ষণেও সাধারণতঃ তাহা নাই। সন্তান সন্ততি আত্মীয় স্বজনের সঙ্কট পীড়া উপস্থিত হইলে সত্যনারায়ণের সিন্নী এবং মঙ্গলচণ্ডীর পূজা দেওয়া, সর্পভয়ে বিষহরির গান শুনা, ধন পরমায়ু বৃদ্ধি এবং সন্তানাদি লাভ, ভয় বিপদ হইতে উদ্ধার ইত্যাদি নিকৃষ্ট কামনা চরিতার্থের জন্য দেবতাবিশেষকে মানস করিয়া পূজা ভোগ বলিদান দেওয়া হইত। ইহা ব্যতীত অন্য অভাব-বোধ ছিল না, সুতরাং ঠাকুরের অন্য কোন গুণ কেহ দেখিতে পাইত না। গুরু পুরোহিতেরা এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানকে সংস্কৃত বাক্য দ্বারা সপ্রমাণ করত নিজেদের সংসারযাত্রানির্ব্বাহের পথ পরিষ্কার রাখিতেন। যজমান সাংসারিক কুশল ও পারিবারিক শান্তির জন্য ধর্ম্মকর্ম্মে অনুরাগী, ধর্ম্মযাজক-গণও আপনাদের সুবিধার জন্য তাহাতে উৎসাহী, এইরূপে উভয়ে উভয়কে ধর্ম্মের নামে বিষম প্রলোভনে ফেলিয়া মায়াজালে জড়িত করিতেন। আবার উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপক পণ্ডিত শাস্ত্রিগণ বিশেষরূপে শাস্ত্রবচন প্রমাণ দ্বারা বিস্তৃত কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করত প্রচলিত আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতেন। এই ত্রিবিধ শ্রেণীর লোক পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া বাহ্য ধর্ম্মক্রিয়াসকল পালন করিত। অধিকাংশ ভদ্রলোক শাক্ত ছিল, অল্প দুই পাঁচ জন বৈষ্ণব ছিলেন; কিন্তু সমাজের মধ্যে তাঁহাদের কোন প্রাধান্য দেখা যাইত না।

জ্ঞানী হিন্দু দুই এক জন গীতা ভাগবত পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু তাহার যথার্থ তাৎপর্য কেহ প্রায় বুঝিতে পারিতেন না।

এক দিকে শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম ও ব্যবহারশাস্ত্র হস্তগত করিয়া বিদ্যাচর্চ্চা এবং উচ্চ দরের কোন কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রচলিত আচার ব্যবহারকে ধর্ম্ম এবং মোক্ষ বলিয়া প্রচার করিতেন, অপরদিকে অজ্ঞানান্ধ সাধারণ নরনারী ইহলোকের পার্থিব ভোগবাসনার পরিণত অবস্থাকে স্বর্গ কল্পনা করত বিষয়লালসা ও মায়া-বন্ধনে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া তাঁহাদের পথ অনুসরণ করিত, মধ্যবিধ অর্দ্ধ-শিক্ষিত ভদ্রসমাজ এই সকল ধর্মের আমোদ আহ্লাদ পান ভোজনের অংশ গ্রহণ করিয়া সুখী হইত। প্রকৃত বিশ্বাস ভক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান অতি অল্প লোকের মধ্যেই ছিল। দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত কেহ কোন নিয়মের অন্যথাচরণ করিলে তজ্জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রচারিত ছিল। ভিতরে ভিতরে অনেকেই অনেক নিয়ম ভাঙ্গিতেন, প্রকাশ হইলেই তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। ব্রাহ্মণের শূদ্রান্নভোজন, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন, সাক্ষ্যদান, শূদ্রের দান প্রতিগ্রহণ, ভিন্ন জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন ইত্যাদি কার্য্য নিষিদ্ধ, কিন্তু বিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিলে এ সকল কার্য্যে বিশেষ আপত্তি থাকিত না। একবার প্রকাশ্যরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরে যাহা ইচ্ছা করিতে পার, এই প্রচলিত বিধি; এ বিষয়ে সেকালে এবং একালে কোন বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। মিথ্যা কথা বলিলে নরক হয়, কিন্তু অবস্থাবিশেষে তাহা বলিবে। অন্যায় উপার্জ্জিত ধনের কিয়দংশ যদি দেবদেবীপূজায়, ব্রাহ্মণভোজনে, কিংবা দাতব্যকার্য্যে ব্যয় করা যায়, তবে তাহাতে আর কোন দোষ স্পর্শে না। যজমানেরা যত পাপ কেন করুক না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গুরু পুরোহিত সে সমস্ত আপনাদের মস্তকে লইতে পারেন, যদি উচিত মত তাঁহাদের সেবার ব্যবস্থা হয়। এমন সকল পুণ্য কার্য্য তাঁহারা দেখাইয়া দিতেন, যাহা করিলে কোটি জন্মের পাপ ভস্ম হইয়া যাইবার কথা। একবার কোন বিশেষ পর্ব্বে, বা চূড়ামণিযোগে গঙ্গাস্নান করিয়া কিংবা গ্রহণের সময় পুরশ্চরণ করিয়া তাহার পর পাপ পুণ্যের জমা খরচ কাটিয়া দেখ, পুণ্য চিরকাল বাকি দাঁড়াইবে! একবার গঙ্গায় অবগাহন করিলে যদি কোটি জন্মের পাপ ক্ষয় হয়, তবে তুমি কত পাপ করিবে? এ প্রকার পুণ্যকার্য্য শত শত ছিল, যাহা অতি

সহজে লোকে সম্পন্ন করিতে পারিত। ধর্ম্মনিয়ম, সমাজশাসন যেমন একদিকে কঠোর এবং অলঙ্ঘনীয়, অন্যদিকে আবার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে সহজ, এই জন্য কাহারও কোন কষ্ট হইত না। প্রায়শ্চিত্ত বিধির সুদৃঢ় বন্ধন, সহজসাধ্য পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা এমনি শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে, লোকে পাপ করিয়া সঞ্চিত পুণ্যকে নিঃশেষ করিতে পারিত না। মনু বলিয়া গিয়াছেন, "কৃত্বা পাপংহি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥" অর্থাৎ পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে মনুষ্য মুক্ত হয়। এমত কর্ম্ম আর করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়। "অজ্ঞানাদ্ যদি বা জ্ঞানাৎ কৃত্বা কর্ম্ম বিগর্হিতং। তস্মাদ্ বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ দ্বিতীয়ন্ন সমাচরেৎ॥" কোন ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে পাপাচরণ করিয়া তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে সে আর দ্বিতীয় বার তাহা করিবে না। কিন্তু এ কথা কয় জন ব্যক্তি মানবে? এমন অবস্থায় কেহ যদি হঠাৎ আসিয়া বলে যে সংসারবাসনা ছাড়িয়া বৈরাগী হও, চরিত্রকে পবিত্র কর, প্রেম ভক্তিতে মাত, সাধুসঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে যে নিতান্ত উপেক্ষিত অপদস্থ হইতে হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? মহাত্মা চৈতন্যের সময় ঠিক এইরূপ ছিল। সোমাজের ভক্তিবিরোধী শাক্তগণ এক অদ্ভুত জীব ছিলেন। তাঁহাদের কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, গলে রুদ্রাক্ষমালা, হস্তে সুরাপূর্ণ নর-কপাল, গাত্রে কালীনামাঙ্কিত নামাবলী; যখন মদ্যমাংসাদি পঞ্চমকারের সেবার্থ ভৈরবীচক্রে তাঁহারা উপবেশন করিতেন, তখনকার ভীম মূর্ত্তি দেখিলে হৃৎকম্প হইত। সুরাপান করিয়া ইহারা রাক্ষসের ন্যায় পথে পথে বিচরণ করিতেন। কেহ কেহ বলিতেন, আমরা সুরাকে গঙ্গাজল, এবং মাংসকে জবাফুল করিতে পারি। তাঁহাদিগকে আর আর সকলে সিদ্ধ পুরুষ বলিত। সিদ্ধ পুরুষদের কিছুতেই নেশা ধরিত না। ভৈরবীচক্রের গুণে বস্তুর ভেদাভেদ বোধশক্তি যখন চলিয়া যায়, তখন এইরূপ বোধ হওয়া কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে। শক্তি উপাসনার সমধিক প্রাবল্য হেতু সে সময় অনেক লোক মাংসাশী হইয়াছিল। যাহারা নিতান্ত ষণ্ডামার্ক তাহারা নেশার ঝোঁকে কখন কখন কৃষ্ণবর্ণ কুকুর দুই একটা ধরিয়া টানাটানি করিত। বামাচারীরা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিয়াও তাহা পাপ বলিয়া বুঝিতে পারিত না।

এক দিকে ব্রাহ্মণত্বের গৌরব, জাত্যভিমান, মায়াবাদের কঠোর ধর্ম্মমত, তার্কিকতা, অসার ধর্ম্মাভিমান, অপর দিকে ধর্ম্মযাজকদিগের কপট ব্যবহার, স্বার্থপরতা, বামাচারীদিগের পঞ্চমকার, এবং সাধারণ লোকের সাংসারিকতা, কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, প্রেমভক্তিবিহীনতা, ইহারই মধ্যে ভক্তিভাজন চৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করিলেন। সে সময়ে নবদ্বীপে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ যে কয়জন লোক ছিলেন তাহার মধ্যে অদ্বৈত আচার্য্য প্রধান। নিবাস ইহাঁর শান্তিপুরে, কিন্তু নবদ্বীপেও মাঝে মাঝে তিনি থাকিতেন। আর শ্রীহট্ট প্রদেশের শ্রীবাস এবং শ্রীরাম পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর দেব এবং মুরারি গুপ্ত। এই চারিজন এবং চট্টগ্রামবাসী বাসুদেব দত্ত ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি; এই কয় ব্যক্তি ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। ইহাঁরা সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। হরিভক্তি যে তখন একেবারে ছিল না, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তির প্রথম প্রবর্ত্তক, গীতা ও ভাগবতোক্ত ভক্তির কথা সকল তাঁহারই মুখ[illegible]নির্গত। অর্জ্জুন ও উদ্ধবের সঙ্গে তাঁহার এ বিষয়ে যে কথা বার্ত্তা হয় তাহা অতি [illegible]হর। পূর্ব্বকালে ব্যাস, নারদ, যুধিষ্ঠির অম্বরীষাদি দেবর্ষি রাজর্ষিগণে[illegible] ও ধ্রুব প্রহ্লাদের এবং পরে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে মধ্বাচার্য্য এবং রামানুজ সম্প্রদা[illegible]য় যে ভক্তিভাব ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এ সময় বঙ্গদেশেও দেখা যাইত। তদ্ব্য[illegible] শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনবিহার হইতেও এ দেশে নানা স্থানে সরস ধর্ম্মভাব অনেক পরি[illegible]চারিত হয়। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈদিক অদ্বৈতবাদ এবং মুসলমানদিগের কঠোর রাজ্যশাসনে সে ভাব বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। যে কয় জন বৈষ্ণবের নাম উপরে উল্লিখিত হইল, ইহাঁরা শাক্তদিগের ভয়ে অতি সংগোপনে গভীর রজনী কালে কখন শ্রীবাসগৃহে, কখন বা অদ্বৈতের সঙ্গে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। তাহা শুনিয়া অভক্ত শাক্তগণ বৈষ্ণবদিগকে নিন্দা করিত, ভয় দেখাইত, অভিসাপ দিত, এবং তাহাদের সাধন ভজনকে দেশের অমঙ্গলের কারণ মনে করিত। যবন হরিদাস এই সময়ের লোক। তাঁহাদিগের উপর শাক্তেরা ভয়ানক উৎপাত করিত। শক্তিউপাসকদিগের দল বল বেশী ছিল, তাহাদের ভয়ে হরিভক্তি লোকের মনে স্থান পাইত না। লোকের দুর্ম্মতি ধর্ম্মভ্রষ্টতা কপটাচার দেখিয়া অদ্বৈতাদি ভক্তগণ এইরূপ প্রার্থনা করিতেন যে "হায়! ভগবান্ ভক্তি দিয়া জীবগণকে কবে উদ্ধার করিবেন? কবে তিনি অবতীর্ণ হইবেন?" অদ্বৈত এক দিন মনের দুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়া

উপবাস করিয়াছিলেন। এমন সময় সেই লুপ্তপ্রায় ভক্তিকে উদ্ধার করিবার জন্য চৈতন্য দেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন।

ঘোর অনাবৃষ্টির পর জলপ্লাবনের ন্যায় চৈতন্যের জীবনরূপ ভক্তিরসের উৎস উৎসারিত হইয়া বঙ্গসমাজকে প্লাবিত করিল। ভূতভাবন ভগবান্ যেমন পৃথিবীকে ফল শস্য জীবন জ্যোতিতে সজ্জিত করিবার জন্য সূর্য্য-রশ্মি দ্বারা ধরাতলস্থ মলিন জঞ্জালরাশি হইতে বাষ্পনিষ্কর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে মেঘরূপে পরিণত করত সুশীতল বারিধারা বর্ষণ করেন, তেমনি তিনি পাপীর গতি হইয়া আবার যথাসময়ে মনুষ্যকৃত রাশি রাশি পাপ দুর্গন্ধের মধ্য হইতে স্বীয় পুণ্যবলে ভক্ত মহাপুরুষদিগকে উৎপাদন করত ধর্ম্মবিপ্লব ঘটাইয়া দেন। তাঁহার ভক্ত তাঁহার কৃপাবলে নির্ম্মল ভক্তিবারি বর্ষণপূর্ব্বক জীবদিগের হৃদয়োদ্যান হইতে নানাবিধ ভাবকুসুম এবং পুণ্যফল বিকাশ করিয়া তাঁহারই মঙ্গল চরণে পুনরায় তাহা উপহাররূপে প্রদান করিয়া থাকেন। চৈতন্যদেব এই প্রেমের উদ্যান হইতে যে এক অপূর্ব্ব পুষ্প-স্তবক রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধুর আঘ্রাণ এখনও ভক্তসমাজকে আমোদিত করিতেছে। তাঁহার অভ্যুদয়ে ভক্তিসমুদ্র প্রভূত বেগে উদ্বেলিত হইল, এবং তাহার এক প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া কঠোর কুতার্কিক পাষণ্ড বিষয়ী বামাচারী মদ্যপায়ী সকলকে সবলে আঘাত করিল। একা গৌরাঙ্গের ভক্তিপ্রস্রবণ হইতে শত শত ভক্তিনদী সংরচিত হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্ম যে কেবল শুষ্ক হৃদয় বৈদান্তিক এবং জ্ঞানী কর্ম্মীদিগের বিষম শত্রু হইয়াছিল তাহা নহে, মদ্যমাংসসেবী তান্ত্রিকদিগের পক্ষেও ইহা কাল-স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি যদি লক্ষ লক্ষ নর নারীকে বৈষ্ণব করিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে এত দিন অজাবংশের চিহ্ন পর্য্যন্ত এ দেশে থাকিত না, লোকের মন নরম হইত না, এবং সুরাস্রোতে বঙ্গদেশ ডুবিয়া যাইত। শাক্ত ধর্ম্মের আসুরিক আচার ব্যবহারে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের জ্ঞান গর্ব্বে, কঠোর কুতর্কে অপর সাধারণ নর নারীর হৃদয়ও শুষ্ক নীরস হইয়া গিয়াছিল; বিনয় ভক্তি প্রেমোন্মত্ততা সদাচার বৈরাগ্য ধর্ম্মনিষ্ঠা, মুক্তির জন্য সরল ব্যাকুলতা পিপাসার কোন চিহ্ন দেখা যাইত না; সেই কালে বহুল প্রতিকূলতার মধ্যে ভক্তচূড়ামণি গৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া অজ্ঞান দীন দুঃখী সাধারণ নরনারীর তৃষিত প্রাণ ভক্তিরসে শীতল করিলেন।

# বাল্যকাল ও পাঠ্যাবস্থা।

১৪০৭ শকে [ইংরাজি ১৪৮৫ অব্দে] বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে, শচীদেবীর গর্ভে চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। দেশীয় প্রথা এবং তৎকালপ্রচলিত বিশ্বাসানুসারে সে দিন অতি শুভ দিন ছিল। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সিংহরাশি সিংহলগ্নে সন্ধ্যাকালে তাঁহার জন্ম হয়। জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্বনিবাস শ্রীহট্ট দেশে, গঙ্গাস্নান উপলক্ষে নবদ্বীপে আসিয়া তিনি বাস করেন। তখন পূর্ব্বদেশের অনেক লোক টোলে অধ্যয়ন এবং গঙ্গাস্নান করিবার জন্য এখানকার উপনিবাসী হইয়া থাকিতেন। শচীর ক্রমাগত আটটী কন্যা হইয়া মরিয়া যায়, পরে বিশ্বরূপ নামে এক পুত্র সন্তান জন্মে। চৈতন্য দশম গর্ভের শেষ সন্তান। জগন্নাথ মিশ্র এক জন সামান্য অথচ সম্ভ্রান্ত ভদ্র ধার্ম্মিক গৃহস্থ ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করেন। বোধ করি সেই উপলক্ষে এখানে তাঁহার বাস। দশম গর্ভ ধারণ করিয়া শচীদেবীর অপূর্ব্ব লাবণ্য হইল। কথিত আছে, তের মাস গর্ভে থাকিয়া চৈতন্য ভূমিষ্ঠ হয়েন। চৈতন্যের জন্ম দিনে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। প্রেমিক কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন, "যখন অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের উদয় হইল, তখন সকলঙ্ক আকাশের চাঁদে কি প্রয়োজন? তাই রাহু সে চাঁদকে গ্রাস করিল।" গ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গায় স্নান করিবার জন্য রাঢ় বঙ্গ হইতে বিস্তর লোক নবদ্বীপে আসে, এবং তাহারা মহা হরিধ্বনিতে গ্রামকে পরিপূর্ণ করে। এই গ্রহণের উপলক্ষে যবনেরা পর্য্যন্ত উপহাসচ্ছলে হরিনাম করিয়াছিল। সেই পবিত্র হরিনামের ধ্বনির মধ্যে হরিগতপ্রাণ চৈতন্য জন্মিলেন। সন্তানের অসাধারণ রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া শচী মাতা এবং মিশ্র ঠাকুর আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। জন্ম দিবস হইতেই তাঁহাতে অসাধারণ দেবলক্ষণ সকল দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ দিন নানা স্থান হইতে লোকেরা উপহার যৌতুক লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। সন্তানের মনোহর শ্রী সন্দর্শনে তাঁহাকে অলোকসামান্য পুরুষ বলিয়া সকলে স্থির করিয়াছিলেন। স্বর্গ হইতে কোন দেবতা আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এই বিশ্বাসেই সকলে তাঁহাকে বিবিধ উপহার প্রদান করেন। এ কথা নিতান্ত অযোগ্যও নহে।

তাঁহার জন্ম যে দেবাংশে তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না। মিশ্র ঠাকুর ছেলের কল্যাণে অনেক সামগ্রীপত্র পাইয়াছিলেন। এবং তাহা লোকদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই জন্মোৎসবের বিবরণ ভাবুক কবি শ্রীবৃন্দাবন দাস পদ্যে অতি সুন্দর রূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ যখন গৌররূপে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাহা সামান্য মানব জন্মের ন্যায় সাধারণ ঘটনা কেনই বা হইবে। বিশ্বাসের উপযোগী ঘটনা উপযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান সময়ের গদ্যপ্রিয় ব্যক্তিদিগের নিকট কবিকল্পনা অতিরঞ্জিত বর্ণনা ভাবুকতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং তদ্বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা কেবল গ্রন্থ বাহুল্য। সমস্ত কথা সত্য হউক না হউক, ভক্তির চক্ষে গৌরের জন্মোৎসব অতীব আনন্দজনক সন্দেহ নাই। পুত্রের অদ্ভুত লক্ষণ দেখিয়া নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর রাখিলেন। অন্নপ্রাশনের দিন যে সকল পদার্থ ছেলেকে স্পর্শ করিতে দেওয়া হয়, লোকে বলে যে তাহার মধ্যে ভাগবত গ্রন্থ লইয়া তিনি খেলা করিয়াছিলেন। ক্রমে শিশু দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিশ্বম্ভর যখন কাঁদিতেন তখন স্ত্রীলোকেরা হাততালি দিয়া হরি হরি বলিত, আর অমনি তিনি হাসিয়া তাহাদের কোলে গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন। তাঁহাকে কোলে পাইলে কেহ ছাড়িতে চাহিত না। একে শিশু, তাহাতে সুন্দর সুঠাম, তার সঙ্গে আবার মধুর মধুর হাসি; গৌরকে কোলে লইবার জন্য হস্ত আপনাপনি প্রসারিত হইয়া পড়িত। হরি বলিলে ছেলের কান্না থামে এবং সে হাসে নাচে, ক্রমে ইহা একটি তামাসার বিষয় হইয়া উঠিল। অনেকে ইহা দেখিবার জন্য মিশ্রভবনে উপনীত হইত। হরি বলিলে হাসিতেন এবং বর্ণ খুব ফুট ফুটে কাঁচা সোণার মত ছিল, এই জন্য পাড়ার মেয়েরা তাঁহাকে গৌরহরি বলিয়া ডাকিতে লাগিল। এবং ডাকিনী যোগিনীর ভয়ে নিমাই নাম রাখা হইয়াছিল। এই তিন নামেই তিনি সম্বোধিত হইতেন।

গৌরাঙ্গ যেমন সুন্দর ছেলে ছিলেন, তেমনি আবার চঞ্চল অস্থির এবং দুষ্টও বিলক্ষণ ছিলেন, এক দণ্ডও প্রায় ঘরে থাকিতেন না। প্রতিবাসীদিগের বাড়ীতে গিয়া বড় উৎপাত করিতেন। কাহারো ছেলে কাঁদাইতেন, ঘুমন্ত শিশুকে জাগাইতেন, কাহারো ঘরে প্রবেশ করিয়া খাদ্য সামগ্রী লইয়া পলাইতেন; ধরা পড়িলে আবার লোকের নিকট ক্ষমা চাহিতেন। একবার

এক জন অতিথি তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল। সে ব্রাহ্মণ তিন বার ক্রমাগত ভাত রাঁধিয়া পাতে ঢালিল; যাই সে চক্ষু বুঁজিয়া ইষ্ট দেবতাকে নিবেদন করিতে বসে, আর চৈতন্য তাহা খাইয়া ফেলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গৌর কি না স্বয়ং ভগবান্, সুতরাং ব্রাহ্মণ যাই তাঁহাকে অন্ন নিবেদন করিতে যায়, অমনি তিনি আহার করিতে বাধ্য হন। ব্রাহ্মণ তিন বারের পর বুঝিল, তাহার ইষ্টদেবতাই এই বালগোপালের বেশ ধরিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। তখন সে স্তব স্তুতি বন্দনা করিল।

এক দিন দুই জন চোর তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল, শেষ ঘুরিতে ঘুরিতে মিশ্রভবনে আসিয়া উপস্থিত হয়। গায়ের অলঙ্কার লইবার ইচ্ছায় তাহারা সন্দেশ দিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল; কিন্তু কোথায় কিরূপে তাঁহাকে মারিবে এই ভাবনায় এবং বালকের মনোহর সুন্দর কান্তি দর্শনে তাহারা পথ ভুলিয়া যায়।

চৈতন্য গঙ্গাস্নানে গিয়া লোকের উপর বড়ই উপদ্রব করিতেন। ডুব দিয়া কাহারো পা ধরিয়া টানিতেন, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের শুষ্ক বস্ত্র এক জায়গায় গোলমাল করিয়া রাখিতেন, লোকের গায়ে বালি ও কুলকুচার জল দিতেন, কাহারো ঘাড়ে চড়িতেন, জল ছিটাইয়া দিয়া কাহারো বা ধ্যান ভঙ্গ করিতেন। ছোট ছোট বালিকা এবং মেয়ে ছেলে সকলকেই যেন উত্তং ক্ষুস্তং করিয়া তুলিতেন। সহসা কাহারো কর্ণকুহরে এমনি চীৎকার শব্দ করিতেন যে সে ভয়ে চমকিয়া উঠিত। সঙ্গে এক দল দুষ্ট বালক থাকিত: কার সাধ্য নিমাইকে ধরে। ডুব সাঁতার দিয়া পলাইয়া যাইতেন, আবার ভুস করিয়া দূরে গিয়া ভাসিয়া উঠিতেন। চঞ্চলমতি বালকের দৌরাত্ম্যে সহজ মানুষ পাগল হইয়া যায়, অতএব সে বিষয়ে আমরা অধিক আর কি বলিব। এ জন্য বালিকাগণ শচীর নিকট অভিযোগ করিতে আসিত, তিনি মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাদিগকে কোলে লইয়া বহু আদর যত্নে ভুলাইতেন। শচী এবং জগন্নাথ মিশ্র সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র, গৌরও প্রিয়দর্শন স্নেহভাজন, সুতরাং ক্রোধ অভিমান কাহারো তীব্র হইতে পারিত না।

এক দিন মিশ্র মহাশয় পাড়ার লোকদের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া দুঃখিত হন এবং ক্রোধে অস্থির হইয়া ছেলেকে শাসন করিবার জন্য ছড়ি হাতে করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করেন। কিন্তু দুরন্ত শিশুকে বৃদ্ধ পিতা

আর কি করিবে। বিশ্বম্ভর লুকাইয়া অন্য পথে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। মিশ্র মহাশয় তাঁহাকে গঙ্গার ঘাটে খুঁজিয়া পাইলেন না।

গৌরাঙ্গ ছোট ছোট বালিকাদিগকে উপহাসপূর্ব্বক বলিতেন, তোমরা আমাকে পূজা কর, আমি তোমাদিগকে বর দিব। এই বলিয়া পূজার ফুল চন্দন দ্বারা নিজের অঙ্গ সাজাইতেন, নৈবেদ্য খাইয়া ফেলিতেন, আর মেয়েরা রাগিয়া মরিত। কেহ বা নাকে কাঁদিত এবং বকিত। তাহারা বলিত "নিমাই, তুমি গ্রামসম্পর্কে আমাদের ভাই হও, এমন কি করিতে আছে?" বালিকাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিমাই বলিতেন, "তোমাদের পরম সুন্দর পণ্ডিত স্বামী হইবে, চিরায়ু মতিমান্ সাত পুত্র হইবে।" এ সকল কথায় মনে মনে আহ্লাদিত হইয়া তাহারা আরো কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিত। যে যে কন্যা নৈবেদ্য লইয়া দূরে পলাইয়া যাইত, গৌর তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইতেন এবং বলিতেন, "তোমার বৃদ্ধ পতি ও চারিটী সতিনী হইবে।" ইহা শুনিয়া ভয়ে কেহ কেহ বা আপনা হইতেই নৈবেদ্য আনিয়া তাঁহাকে দিত। এই বালকের কেমন এক আকর্ষণী শক্তি ছিল, নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিলেও কেহ তাঁহাকে মন্দ বলিত না। এই সকল দৌরাত্ম্য অস্থিরতার মধ্যে হরিনামে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছিল। যে সকল মেয়েরা হরিগুণ গান করিতে জানিত, নিমাই তাহাদের নিকট যাইতেন এবং তাহাদিগকে ভাল বাসিয়া খৈ কলা সন্দেশ অন্য স্থান হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া দিতেন। সমবয়স্ক বালকগণের মধ্যে তিনি প্রধান হইয়া সকলকে চালাইতেন, অপর বালকগণ তাঁহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিত। নিমাইয়ের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া শচীদেবী এক আধ বার ছেলেকে ধমক ধামক দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়; শেষে আর কিছুতেই তাঁহাকে তিনি আঁটিতে পারিতেন না। কিছু বলিলে নিমাই বাড়ীর দ্রব্য সামগ্রী ভাঙ্গিয়া মহা গণ্ডগোল বাধাইতেন। এক দিন রাগ করিয়া আঁস্তাকুড়ে অস্পৃশ্য হাঁড়ি কলসীর মধ্যে গিয়া বসিলেন। শচী দেখিয়া মহা দুঃখিত হইয়া তাড়না করিয়া বলিতে লাগিলেন, গঙ্গাস্নান করিয়া আইস, তাহা না হইলে ভাত খাইতে পাবে না। নিমাই আর এক দিন ঘরের ঠাকুরগুলিকে ফেলিয়া দিয়া সিংহাসনের উপর নিজে বসিয়াছিলেন। এক দিন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁহার বাল্যপ্রণয়ের সঞ্চার হয় এবং

উভয় উভয়কে সুনয়নে দেখিয়া পরস্পর প্রণয়পাশে বদ্ধ হন। নিমাই কাহাকেও ভয় করিতেন না, কেবল অগ্রজ বিশ্বরূপকে দেখিলে চুপ করিয়া থাকিতেন। তিনিও ছোট ভাইয়ের মহৎ লক্ষণ সকল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে উপযুক্ত বয়সে তৎকালপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণশিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। নিমাই পাঠ আরম্ভ করিয়া যাহা একবার শুনিতেন তাহা আর ভুলিতেন না। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি এবং প্রতিভা দেখিয়া পণ্ডিত বলিতেন এ ছেলে ক্ষণজন্মা। অতঃপর তিনি দৈববলে ভিতরে ভিতরে এক জন মহাপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। পুত্রের অসাধারণ জ্ঞানোন্নতির কথা শ্রবণে মিশ্র মহাশয় কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, বিশ্বরূপ অল্প বয়সে জ্ঞানী হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিল, নিমাইকে তবে আর পড়িতে দিব না; ছেলে যদি মূর্খ হইয়া ঘরে থাকে সেও ভাল। নিমাই আমার যদি কৃষ্ণভক্তি উপার্জ্জন করিতে পারে তাহা হইলেই সে চিরসুখী হইবে, বিদ্যাতে ধনেতে কেহ সুখী হইতে পারে না। স্ত্রী পুরুষে এক মত হইয়া কিছু দিন পড়া বন্ধ করিলেন। শেষ ছেলের দৌরাত্ম্যে এবং প্রতিবাসীদিগের ভর্ৎসনায় তাঁহাকে টোলে পাঠাইতে বাধ্য হন।

এই সময় বিশ্বম্ভরের যজ্ঞোপবীত হয়। উপবীত ধারণ করিয়া ইহাঁর আর এক প্রকার সৌন্দর্য্য হইল। উপবীতের পর নিমাই ব্রাহ্মণের প্রথানুসারে প্রতি দিন বিষ্ণুপূজা করিতেন। জগন্নাথ মিশ্রও এক জন বিষ্ণূপাসক সাত্ত্বিক লোক ছিলেন, বিশেষতঃ চৈতন্যের জন্ম হইতে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই ধর্ম্মে মতি কিছু অধিক হইয়াছিল। যে বংশে ভক্তপুত্র জন্মে সে বংশ উদ্ধার হইয়া যায়। ভাল ছেলে বাস্তবিক গুরু। সৎপুত্র পিতা মাতার স্বর্গগমনের সোপান।

১৪২২ শকে অর্থাৎ ইংরাজি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামক এক জন তর্কশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নবদ্বীপের নিকট বিদ্যানগর গ্রামে এক চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে অদ্যাপি গৌরাঙ্গের বিগ্রহমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তাঁহার প্রধান ছাত্র চৈতন্য, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, হরিদাস সার্ব্বভৌম এবং শ্রীপাদ

গোস্বামী এই কয়েক জন। ইহাঁদের মধ্যে আবার চৈতন্য, রঘুনাথ এবং রঘুনন্দন প্রসিদ্ধ ছিলেন। ক্রমে নিমাই সাহিত্য কাব্য শ্রুতি স্মৃতি জ্যোতিষ দর্শন প্রভৃতি বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইলেন। কিন্তু তিনি ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। অতি শৈবষকালে পঠদ্দশাতেই তাঁহার জীবনে প্রতিভাশক্তিব পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। নানা বিধ তর্ক যুক্তি বুদ্ধি কৌশলে সহাধ্যায়ীদিগকে তিনি বিস্মিত করিয়াছিলেন। জ্ঞান বুদ্ধি পাণ্ডিত্যেও তাঁহার অসাধারণ দৈব শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। সন্তানকে বিদ্যা উপার্জ্জনে প্রগাঢ় মনোযোগী দেখিয়া শচী ঠাকুরাণীর মনে আশা হইল যে, তবে আর আমার নিমাই উদাসীন হইবে না।

---

## যৌবন ও অধ্যাপনের কাল।

---

গৌরাঙ্গ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিলেন। স্বাভাবিক দৈহিক সৌন্দর্য্যের উপর বিদ্যার জ্যোতি প্রতিফলিত হওয়াতে তাঁহার রূপ ও গুণ উভয়ই অতি মনোহর হইল। সেরূপ দেখিবা মাত্র লোকের মন আকৃষ্ট হইত। যে পথ দিয়া তিনি যাইতেন, সেখানকার লোকেরা তাঁহার পানে একবার না চাহিয়া থাকিতে পারিত না। এ সময় তিনি সদা সর্ব্বদা ছাত্রদিগের সঙ্গে বিদ্যাচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিতেন।

এক দিন নিমাই শচীকে হঠাৎ বলিলেন "মা, আপনি একাদশীর দিনে আর অন্ন আহার করিবেন না।" শচীদেবী সেই দিন হইতে একাদশীর ব্রত আরম্ভ করেন। ইহা দ্বারা যে তাঁহার অন্তরস্থ হরিভক্তির আভাস প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এখন বেশ বুঝা যাইতেছে। গৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ এক জন অতি শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, কোন গোলমালের মধ্যে বড় একটা মিশিতেন না, পড়া শুনা, গৃহকর্ম্ম কিছুতেই তাঁহার অনুরাগ ছিল না, কেবল পূজা অর্চ্চনা হরিভক্তি আলোচনা সাধুসঙ্গ ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ ইহাতেই মগ্ন থাকিতেন। তিনি অদ্বৈতভবনে ভক্তগণের সহবাসে সর্ব্বদা তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনা

করিতেন এবং এক জন ধর্ম্মানুরাগী ভক্ত ছিলেন। গৌর সময়ে সময়ে ঐ স্থানে গিয়া জ্যেষ্ঠকে ডাকিয়া আনিতেন। পথে দুই ভ্রাতায় যখন হাত ধরাধরি করিয়া যাইতেন তাহা দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইত। কারণ, দুই জনেরই রূপ লাবণ্য ভাব ভঙ্গী অতিশয় রমণীয় ছিল। মিশ্র মহাশয় বিশ্বরূপের যৌবনকাল উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করেন। ইহা শুনিয়া সেই যুবা আর ঘরে রহিল না, একবারে সন্ন্যাসী হইয়া গোপনে তীর্থ পর্য্যটনার্থ চলিয়া গেল। পরে ইনি শঙ্করারণ্য সন্ন্যাসী নামে পরিচিত ছিলেন। এই ঘটনায় জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীদেবী অত্যন্ত কাতর হন এবং পুত্রবিরহে বহু বিলাপ করেন। নিমাইও ভ্রাতৃশোকে অধীর ও নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পিতা মাতার শোকদগ্ধ হৃদয়ে শান্তি দিবার জন্য বলিলেন, "বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়াছেন, ভালই হইয়াছে, তাঁহা দ্বারা পিতৃকুল উদ্ধার হইল; আমি একাই আপনাদের চরণ সেবা করিব।" পুত্রের এই মিষ্ট বাক্য শুনিয়া তাঁহারা কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসী হওয়া শুনিয়া গ্রামস্থ সকলেই দুঃখিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন, এই জন্য তাঁহাদের হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হয়।

কিয়দ্দিবসান্তে জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক হইল, ইহাতে শচীদেবী আরও কাতর হইয়া পড়িলেন; একটি মাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র, তাদৃশ বিষয় বিভবও ছিল না, নানা দুশ্চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ ভাঙ্গিয়া গেল। গৌর বিধিপূর্ব্বক পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া পরে সংসারধর্ম্মপালনে নিযুক্ত হইলেন। শচী যখন পতিশোকে কাতর হইয়া নিজের নিরাশ্রয় অবস্থা স্মরণপূর্ব্বক খেদ করিতেন, তখন নিমাই আশ্বাস দিয়া বলিতেন, "মা, ভয় কি? সেই দীনবন্ধুই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। তাঁহার চরণ পাইলে সকল দুঃখ ঘুচিবে। আমি তোমাকে সেই দেবদুর্লভ চরণ আনিয়া দিব।" বিধাতার বিধাতৃত্ব শক্তিতে তাঁহার প্রগাঢ় নির্ভর ছিল। শোকাতুরা মাতাকে এইরূপে তিনি অনেক সময় সান্ত্বনা প্রদান করিতেন। এ সময় তিনি কিছু শান্ত গম্ভীর হন; মাতার কাছে সর্ব্বদা থাকিতেন এবং পড়া শুনা করিতেন।

গৃহিণী ব্যতীত গৃহধর্ম্ম পালন হয় না, এই ভাবিয়া গৌরের বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইল। এক দিন অধ্যয়ন করিয়া বাড়ী আসিতেছিলেন, হঠাৎ পথিমধ্যে সেই লক্ষ্মী নাম্নী সুন্দরী কন্যাটীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল;

উক্তর উত্তরকে দর্শন করিয়া প্রীতিরসে অভিষিক্ত হইলেন। তদনন্তর বনমালী ঘটক শচীর আদেশানুসারে বিবাহের কথা বার্ত্তা সকল স্থির করেন। শুভ দিনে বিশ্বম্ভর ধর্ম্মপরায়ণ বল্লভাচার্য্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। যখন পুত্রের বিবাহ হইল তখন শচীদেবী এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন। নিমাই আর যে গৃহত্যাগী হইবেন না তদ্বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল।

বিবাহের পর গৌরচন্দ্র চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। শত শত শিষ্য বিদ্যার্থী হইয়া তাঁহার নিকট পড়িতে আসিত। নিমাই পণ্ডিতের ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া যাইত। অল্প দিনের মধ্যে দেশে বিদেশে সকলে জানিল যে নিমাই এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হইয়াছেন। অনেকানেক অধ্যাপক ইহার নিকট শাস্ত্রবিচারে পরাজিত হইতে লাগিলেন। একে যৌবনের উষ্ণতা তাহাতে বিদ্যার প্রতিভা গর্ব্ব, গৌরের মুখের কাছে কেহ আর দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু তিনি চিরকাল প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী ছিলেন, এইজন্য তাঁহার নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়াও কেহ তাদৃশ দুঃখিত হইত না। তর্কে বড় বড় অধ্যাপকদিগকে পরাস্ত করিয়াও তাঁহাদের মান্য রাখিতেন, কাহাকেও ঘৃণা অবমাননা করিতেন না; এইজন্য তাঁহার খ্যাতি অচিরে সর্ব্বত্র বিস্তার হইয়া পড়িয়াছিল। নিমাই কখন কখন শিষ্যগণসঙ্গে গঙ্গাস্নানে গিয়া সাঁতার খেলিতেন এবং যৌবনসুলভ বহুল চপলতা প্রকাশ করিতেন। নবদ্বীপে তখন টোল এবং ছাত্রসংখ্যা বিস্তর ছিল। সে সময় কলেজ স্কুল আরম্ভ হয় নাই, কাজেই ভদ্রসন্তানেরা অধিকাংশ এই খানে আসিয়া সংস্কৃত পড়িত। ইহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া গঙ্গাস্নানে গিয়া পরস্পরে বিবাদ বিসংবাদ এবং শেষে মারামারি পর্য্যন্ত করিত। গৌরাঙ্গ এক জন এ বিষয়ে প্রধান ছিলেন। শত শত ছাত্র মিলিত হইয়া স্নানার্থী স্ত্রী পুরুষদিগকে অস্থির করিয়া তুলিত।

অধ্যাপনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পর যখন ক্রমে নিমাই পণ্ডিতের নাম চারিদিকে প্রচারিত হইল তখন তিনি নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রণ পত্র পাইতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিবার জন্য অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিত। ফলে নিমাই পণ্ডিত এক জন অদ্বিতীয় প্রভাবশালী অধ্যাপক হইয়া উঠিলেন। তর্কশাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রেও তিনি বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। বড় বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিতদিগকে এমনি পরাস্ত করিতেন যে লোকে দেখিয়া বিস্মিত হইত। তাঁহার তর্কজালে এবং বিঘূর্ণিত বুদ্ধিচক্রে পড়িয়া

অনেক পণ্ডিত অন্ধকার দেখিতেন। বিচারে জয়লাভ করিয়া নিমাই পণ্ডিত কিছু গর্ব্বিত এবং তর্কপ্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি আপনার বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির উপর এত নির্ভর করিতেন যে, কাহাকেও ভয় করিয়া চলিতেন না। মহা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেন হউন না, নিমাই পণ্ডিতের বিচারে সকলকেই পরাভব স্বীকার করিতে হইত। তাঁহার নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া সকলে মনে মনে বিরক্ত হইত, কিন্তু কি করিবে, কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিত না। নিমাই যাহার উপর একবার লাগিতেন তাহাকে নাকের জলে চখের জলে করিতেন; তাহার বিদ্যা বুদ্ধির অভিমান একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু ইহার ভিতরেও তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্য এবং মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। ভক্তিপথাবলম্বী যে কয়জন বৈষ্ণব ছিলেন তাঁহারা নিমাইকে ভয় করিতেন, বুদ্ধি বিদ্যায় তাঁহাকে না পারিয়া বিরক্ত হইতেন, এবং দেখা হইলে পাছে কুতর্ক উপস্থিত হয় এই জন্য তাঁহারা সে দিক্ দিয়া চলিতেন না। শ্রীবাস, মুকুন্দ প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবগণও পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু ইহারা বৃথা তর্ক করা অন্যায়, এই মনে করিয়া চৈতন্যের প্রতি বিরক্ত হইতেন। এ সময় বৈষ্ণবগণের ভক্তিনিষ্ঠা দেখিয়া নিমাই কিছু আত্মগ্লানি অনুভব করেন। ভিতরে মধুর ভক্তির ভাব সঞ্চিত ছিল, কিছু দিনের জন্য শাস্ত্রচর্চ্চায় কেবল তাহা প্রকাশ হইতে পারে নাই। এক একবার মনে বড় লাগিত; কিন্তু তখন জ্ঞানোন্মত্ততা অধিক, সুতরাং সে ভাব মনে স্থান পাইত না। শ্রীবাস কিংবা গদাধরের সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হইলে প্রণাম করিয়া গৌরাঙ্গ তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক উপস্থিত করিতেন, ব্যাকরণের ফাঁকি ধরিয়া তাঁহাদিগকে কৌশলে ঠকাইতেন। কিন্তু বিশ্বম্ভরের বড় অমায়িক এবং উদার ভাব ছিল। এত বড় পণ্ডিত তর্কবাগীশ, তত্রাপি তিনি শ্রীবাসাদির মন হরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তর্কে পরাস্ত হইয়াও গৌরের রূপ গুণে বিমুগ্ধ হওত মনে মনে কামনা করিতেন, আহা, এই যুবা যদি কৃষ্ণভক্ত হয়, তবে আরও শোভা হয়। শ্রীবাস এক দিন মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "দেখ নিমাই, কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা বুদ্ধি সকলই বৃথা। তুমি কেন মিথ্যা তর্ক বিতর্ক করিয়া বেড়াও, কৃষ্ণকে ভজনা কর।" তিনি বলিতেন, "আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার কৃষ্ণভক্তি হয়।" তখন ভক্তির বীজ গৌরের হৃদয়মধ্যে অঙ্কুরিত হইতেছিল, কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের বিস্তৃত ছায়া তাহাকে কিছু দিন পর্য্যন্ত মস্তক তুলিতে দেয় নাই। শচীনন্দন বিদ্যা

বিজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া দেশবিখ্যাত হইয়া পড়িলেন, তখন নবদ্বীপের আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহাকে চিনিল। তাঁহাকে দেখিলে লোকে পাল্কী ও দোলা হইতে নামিয়া আলাপ সম্ভাষণ করিত। নিমন্ত্রণ প্রায় তাঁহার বাদ পড়িত না। বস্ত্র তৈজস বিবিধ উপহার তাঁহার বাড়ী সকলে পাঠাইয়া দিত। এমন কি তিনি মুসলমানদিগের নিকটেও সমাদৃত হইয়াছিলেন। যদিও এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত, তথাপি যুবা প্রকৃতি বশতঃ সকল সময় গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেন না। মন বড় সাদা ছিল, এজন্য বয়স্ত-দিগকে লইয়া সময়ে সময়ে আমোদ আহ্লাদ করিতেন। ছোট বড় ইতর ভদ্র সকলের বাড়ীতেই তাঁহার পদধূলি পড়িত। শ্রীধর নামে এক জন গরিব ব্রাহ্মণ কলা, থোড়, মোচা, খোলা, বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিত। নিমাই তাহার বাড়ীতে গিয়া তাহার সঙ্গে নানাবিধ কষ্টি নষ্টি করিতেন। সে গরিব ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে বিনা পয়সায় ঐ সকল তরকারি এবং কলাপাত খোলা ইত্যাদি দিত। দুঃখী গরিব সামান্য লোকদিগের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের ভালবাসা অধিক ছিল। বিনা আহ্বানে সকলের বাড়ী বাড়ী যাইতেন, ইহাতে তাহারাও অত্যন্ত অপ্যায়িত এবং সন্তুষ্ট হইত। শ্রীহট্ট-বাসীদিগের সঙ্গে তিনি সেই দেশীয় ভাষায় অনেক চ্যাংড়ামি করিতেন। তাহারা ক্রোধে অগ্নি অবতার হইয়া বলিত, "হয়! হয়! তুমি কোন্ দেশের লোক? তুমিওত শ্রীহট্টের বাঙ্গালের ছেলে।" তাহারা গৌরাঙ্গের জ্বালায় অস্থির হইয়া কখন বা তাঁহাকে ধরিয়া শিকদারের নিকট লইয়া যাইত, কখন উত্তেজিত হইয়া পশ্চাদ্ধাবিত হইত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এত চপলতার মধ্যে গৌরের কোন প্রকার দুরাচার দৃষ্ট হয় নাই। পরস্ত্রীর পানে ফিরিয়াও চাহিতেন না, তদ্বিষয়ে অতিশয় সতর্ক ছিলেন। মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাড়ীতে সদা সর্ব্বদা থাকিতেন এবং তথায় বন্ধুবর্গের সহিত জ্ঞানানুশীলন করিতেন। অতিথির প্রতি তাঁহার বড় ভক্তি ছিল। ফকির সন্ন্যাসী পাইলে বাড়ীতে আনিয়া তাহাদিগের সেবা করিতেন। লক্ষ্মীদেবী এই অতিথিসেবাকার্য্যে বিশেষ সহকারিণী ছিলেন। তিনি স্বহস্তে রন্ধন পূর্ব্বক ভক্তির সহিত অভ্যাগতদিগকে ভোজন করাইতেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা অতিথিসৎকার, পতিভক্তি শ্বশ্রূসেবা দেখিয়া গৌরচন্দ্র তৎপ্রতি বিশেষ অনুরক্ত হন। শচী-মাতার সংসারটী বড় পবিত্র এবং সুখের সংসার ছিল। গৌরের মান সম্ভ্রম আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দান সৎকর্ম্ম অতিথিসেবাও বৃদ্ধি হইল।

এক দিন নিমাই গঙ্গা পার হইতেছিলেন, সেই নৌকায় আর এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিল, কথায় কথায় দুই জনে পরস্পর আলাপ হইল। নিমাইয়ের হস্তে এক খানি পুস্তক দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, এ খানি কি পুস্তক? নিমাই বলিলেন, ইহা আমার রচিত ন্যায়শাস্ত্রের টীকা। সে কথা শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণের মুখ খানি দুঃখেতে একবারে মলিন হইয়া গেল। নিমাই তাহা বুঝিতে পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ব্রাহ্মণ বলিল, আমিও এক খানি টীকা রচনা করিয়াছি; কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের টীকার নাম শুনিলে আর আমার টীকা কেহ গ্রাহ্য করিবে না। গৌরাঙ্গ তখন আপনার পুস্তক খানি নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের আর আনন্দের সীমা রহিল না, মহা আহ্লাদিত হইয়া নিমাই পণ্ডিতের অনেক প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল। এ কথা যাহারা যাহারা শুনিল সকলেই গৌরের উদার ব্যবহারে বিমোহিত হইয়া গেল। বস্তুতঃ ইহা বড় সামান্য কথা নহে।

এই সময় নিমাই পণ্ডিত একবার সশিষ্য পূর্ব্বাঞ্চলে শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে কিছু দিনের নিমিত্ত গমন করেন। প্রেমাবতার গৌরের সকল সময়ের জীবনই সফল এবং প্রতিভাসম্পন্ন। শৈশবে জননীর কোলে, বাল্যচাপল্যে যেমন সুন্দর মনোহর, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার সময়েও তেমনি তেজ বীর্য্য-শালী সুলক্ষণাক্রান্ত বুদ্ধিমান। রূপে গুণে মূর্ত্তিমন্ত। পূর্ব্ববঙ্গে যাইবার পথে পদ্মানদীতটে কিছু দিন বাস করেন। বিস্তৃতবক্ষ বেগবতী মহাতরঙ্গিণী পদ্মার বিপুল গৌরব দর্শনে গৌরের হৃদয়-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। পরে তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে তদ্দেশীয় বহু শত বিদ্যার্থী তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিবার জন্য সমাগত হয়। নিমাই পণ্ডিতের টীকা ব্যাখ্যার প্রশংসা ইতিঃপূর্ব্বেই জনসমাজে প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। দুই মাস কাল সে দেশে তিনি ছিলেন। অনেকানেক লোক তাঁহার নিকট শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া, উপাধি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যায়। বিদায় কালে স্বর্ণ রৌপ্য তৈজস বস্ত্র যথাবিধি উপহার দিয়া তাঁহার প্রতি সকলে শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

যেখানে যেখানে তিনি গিয়াছিলেন, সেখানকার লোকেরা তাঁহাকে শাস্ত্র-কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তপন মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে এই দেশে সাক্ষাৎ হয়। মিশ্র নিমাইকে ধর্ম্মসাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, নামসংকীর্ত্তন কর, ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধন। ভক্তির স্রোত তখন

তাঁহার ভিতরে উন্মুক্ত হয় নাই, কিন্তু তিনি প্রত্যহ রীতিমত বিষ্ণু অর্চ্চনা করিতেন।

কিছু দিন পরে নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বদেশ হইতে নানাবিধ সামগ্রী এবং বস্ত্রতৈজসাদি লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। বাড়ী আসিয়া বয়স্তগণের সঙ্গে সদালাপ করিলেন। পূর্ব্বদেশের কথা শিখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা লইয়া হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। পরে জননীর মুখে শুনিলেন যে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন স্বামীর বিরহশোকে কাতর হইয়া লক্ষ্মী প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু এ কথাও চলিত আছে, সর্পাঘাতে লক্ষ্মীর মৃত্যু হয়। শচীদেবী সহসা এই নিদারুণ সংবাদ পুত্রকে দিতে পারিলেন না, এবং তাঁহার নিকট আসিতেও সাহস করিলেন না। পরে নিমাই সমস্ত অবগত হইয়া শোক সংবরণপূর্ব্বক মাতাকে প্রবোধ দিলেন। স্ত্রীবিয়োগে যদিও তিনি নিজে শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বাহিরে বড় প্রকাশ পাইল না। প্রিয়তমা পরমগুণবতী পুত্রবধূর বিয়োগ শোকে জননী যখন অবিশ্রান্ত আকুল হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিলেন, তখন নিমাই বলিলেন, "মা, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনি সংযোগ করেন আবার তিনিই বিয়োগ ঘটাইয়া দেন। যাহা ভবিতব্য আছে তাহা অবশ্যই হইবে। যে নারী স্বামীকে রাখিয়া অগ্রে পরলোক গমন করে, সে বড় ভাগ্যবতী।" পুত্রের প্রবোধ বচনে জননী শান্তি লাভ করিলেন।

তদনন্তর নিমাই পূর্ব্ববৎ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিছু দিনান্তে মাতার অনুরোধে পুনর্ব্বার তাঁহাকে সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিতে হইল। শচী নববধূর মুখাবলোকন করিয়া পূর্ব্বশোক বিস্মৃত হইলেন। এইরূপে নিমাই পণ্ডিত কিছু দিন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, পণ্ডিতদিগের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক বিচার করেন, ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেন। এক দিন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে শিষ্যবর্গ সঙ্গে জাহ্নবীতটে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন, এমন সময় এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া দাম্ভিক স্বরে বলিলেন, "ওহে নিমাই পণ্ডিত! শুনিয়াছি তুমি না কি কলাপ ব্যাকরণ পড়াইয়া থাক? তোমার শিষ্যদিগের ফাঁকির আলাপ কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।" গৌর তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক বসাইয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমি কি জানি, আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত এবং কবি, অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি গঙ্গার মাহাত্ম্য কিছু বর্ণন করেন আমরা শুনিয়া সুখী

হই।" দিগ্বিজয়ী দ্রুতবেগে কতকগুলি শ্লোক রচনাপূর্ব্বক পাঠ করিলেন। কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের তর্কতরঙ্গে পড়িয়া তাঁহাকে শেষে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। তিনি তাহার ভিতর এমন সকল অনুপ্রাশ অলঙ্কার দোষ, বিরুক্তি ভগ্ন ক্রম এবং অসংলগ্ন অর্থ দেখাইয়া দিলেন যাহাতে দিগ্বিজয়ীর আর বলিবার কিছু রহিল না। শেষ হতবুদ্ধি হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তুমি অলঙ্কার শাস্ত্র না পড়িয়া এ সব কথা কোথায় পাইলে? ইহাতে আমি বিস্মিত হইলাম।" গৌর রঙ্গ করিয়া বলিলেন, "আমি শাস্ত্রবিচার ভাল মন্দ কিছু বুঝি না, সরস্বতী যাহা বলান তাই বলি।" ইহা শুনিয়া জ্ঞানাভিমানী বিপ্র ক্ষুব্ধচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, "তবে কি দেবী আমাকে অপমান করিবার জন্যই এই শিশুর কণ্ঠে অবতীর্ণ হইয়াছেন? আমি ধ্যানযোগে এ কথা তাঁকে আজ জিজ্ঞাসা করিব।" পণ্ডিতের দুর্দ্দশা দর্শনে চপল স্বভাব যুবক শিষ্যগণ হাসিতে লাগিল। তজ্জন্য গৌর কুণ্ঠিত হইয়া বিনম্রভাবে পণ্ডিতকে বহু প্রশংসাবাদ করিলেন এবং বলিলেন, "ভবভূতি জয়দেব কালিদাস প্রভৃতিরও কবিত্বে দোষ প্রকাশ পায়, অতএব আপনি কোন অপরাধ লইবেন না।" যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপের সমস্ত অধ্যাপকবর্গকে জয় করিয়াছিল, নিমাই পণ্ডিতের নিকট সে পরাস্ত হইল, ইহা শুনিয়া নিমাইকে সকলে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া বুঝিতে পারিল। এই হইতে তাঁহার নাম পণ্ডিতসমাজে বিখ্যাত হইয়া পড়ে। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতও হতগর্ব্ব হইয়া বিনীত হন। এবং সেই যুবকের বিদ্যা বিনয়ের নিকট পরাস্ত হইয়া দেবীর আদেশে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া তাঁহাকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। প্রথম যৌবনে নিমাই পণ্ডিত এইরূপে সর্ব্বদা জ্ঞানতরঙ্গে ভাসিতেন। বিদ্যা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং গভীরতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল।

এই ভাবে কিছু দিন চলিতে লাগিল। অসার তর্ক বিতর্ক এবং শুষ্ক জ্ঞানালোচনায় ক্রমে নিমাই পণ্ডিতের মন কিছু কঠোর ও উদ্ধত হইয়া উঠিল। ইদানীন্তন প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের প্রতি কখন কখন তিনি উপেক্ষা বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। যদিও স্পষ্টরূপে তাঁহাদের বিদ্বেষী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি বিলক্ষণ ঔদাসীন্য ভাব দেখাইতেন। ইহাতে ঐ সকল নিপীড়িত দীন হীন বৈষ্ণবগণের হৃদয় দুঃখেতে আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল। তজ্জন্য তাঁহারা গৌরাঙ্গের প্রতি কখন কখন দোষারোপ করিতেন। এই সময় যবন হরিদাস বহু অত্যাচার সহ্য করিয়া অদ্বৈত শ্রীবাসাদির নিকট

নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাঁর কথা শুনিলে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। যবনকুলে জন্মিয়া মুসলমান রাজার শাসনাধীনে এরূপ পরম ভাগবত ইনি কেমন করিয়া হইলেন, তাহা ভাবিয়া উঠা যায়-না। চৈতন্যের ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, সংক্ষেপে হরিদাস ঠাকুরের পরিচয় কিছু প্রদান করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

যৎকালে প্রাচীন বৈষ্ণব কয়েক জন একত্র মিলিত হইয়া সাধুসঙ্গ সৎ প্রসঙ্গ এবং হরিসঙ্কীর্ত্তন করেন, ভক্তিহীন লোকদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া এবং ব্রাহ্মণগণের জ্ঞানাভিমান তর্ক বিতর্কে অস্থির হইয়া রোদন করেন, শাক্ত ও যবনদিগের অত্যাচারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইষ্ট দেবতাকে ডাকেন, তখন হঠাৎ একটি শান্তমূর্ত্তি বৃদ্ধ, হাতে হরিনামের মালা, অতি দীনবেশ, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হরিনামের সাগরে যেন দিন রাত্রি ডুবিয়া থাকিতেন।

---

# যবন হরিদাস।

হরিদাসকে দেখিলে আর বোধ হইত না যে এ ব্যক্তি কোন কালে মুসলমান ছিল। হরিনামরসে ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র এবং শুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যদিও বয়সে প্রাচীন, কিন্তু নামসঙ্কীর্ত্তনে যখন তিনি মাতিতেন, তখন তাঁহার মহাভক্তির ভাবাবেশ হইত। হাস্য ক্রন্দন স্বেদ কম্প পুলকাদি প্রগল্‌ভা ভক্তির লক্ষণ সকল দেহে প্রকাশ পাইত। এমনি নৃত্য করিতেন যে মাটি কাঁপিয়া যাইত। শান্তিপুর অঞ্চলে বুড়ন গ্রাম হরিদাসের জন্মস্থান। ভগবানের কৃপায় ইহাঁর হৃদয়ে হরিভক্তি সঞ্চারিত হয়। শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়া গ্রাম, তৎসন্নিহিত বেনাপোলের বনমধ্যে এক কুটীরে হরিদাস তপস্যা করিতেন। কখন বা হরিনামরসে মত্ত হইয়া ঐ স্থানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। অদ্বৈতের সঙ্গে প্রথমে তাঁহার মিলন হয়, তাহাতে উভয়েই পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ ভদ্র সকলেই হরিদাসের ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য ও শ্রদ্ধা করিত।

যবন হইয়া হিন্দুর ধর্ম্ম আচরণ করে ইহা শুনিয়া স্থানীয় কাজি মহা বিরক্ত হইল, এবং হরিদাসকে নবাবের নিকট বন্দী করিয়া পাঠাইয়া দিল।

তাঁহার প্রতি এরূপ অত্যাচারবার্ত্তাশ্রবণে তদ্দেশস্থ ধার্ম্মিক লোক মাত্রেরই মনে বড় দুঃখ হইয়াছিল। নবাবের দরবারে হরিদাস উপস্থিত হইলেন; কারাগারে প্রবেশ মাত্র বন্দিগণ তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "এই ভাবে অবস্থিতি কর।" কয়েদীরা ইহাতে দুঃখিত হওয়াতে হরিদাস বুঝাইয়া দিলেন যে, "এখন যেমন তোমাদের মনে ভক্তির উদয় হইয়াছে এই ভাবই যেন চিরদিন থাকে। মুক্ত হইয়া পুনরায় দুষ্ট লোকদিগের সঙ্গে মিশিয়া কাহারো অনিষ্ট করিও না। তাই বলিতেছি, এই ভাবে অবস্থিতি কর। এ স্থান হইতে ফিরিয়া সংসারে প্রবেশ করিলে পুনরায় বিষয় মায়ায় মুগ্ধ হইবে, এ সকল সাত্ত্বিক ভাব তখন আর মনে থাকিবে না। চিরদিন বন্দী থাক এমন আশীর্ব্বাদ করি না, বিষয়াসক্তি ছাড়িয়া অহর্নিশি হরিভজন কর এই ইচ্ছা করি। শীঘ্রই তোমরা মুক্ত হইবে।"

নবাব বলিলেন, "হরিদাস, বহু ভাগ্যে যবন কুলে জন্মিয়াছ। কেন তুমি স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া পরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে? পরলোকে কিরূপে তুমি নিস্তার পাইবে? অতএব কল্‌মা পড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত কর।" মায়ামোহিত নবাবের কথায় হাস্য করিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন, অহো! বিষ্ণুমায়া! তদনন্তর মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "শুন বাপ, ঈশ্বর একই বস্তু, তিনি সকল ঘটে বিরাজ করেন। এক বস্তু নামভেদে হিন্দু যবন সকলেই মান্য করে। কোরাণে এবং পুরাণে এক পরমার্থতত্ত্বই বলে। তিনি যাহাকে যেমন করেন সে তেমনি হয়। সকল স্থানে সেই নিত্য অখণ্ড শুদ্ধ ঈশ্বর ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। কোন প্রাণির হিংসা করিলে তাঁহার প্রতি হিংসা করা হয়। তিনি আমাকে যেরূপ লওয়ান আমি সেই রূপ করি। তাঁহার ইচ্ছায় ব্রাহ্মণেও যবন হয়। ইহাতে যদি আমার দোষ থাকে, বিচার করিয়া আমাকে দণ্ড দাও।"

নবাব হরিদাসের সত্য বচনে সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কাজি বলিল, "খোদাবন্দ! ইহাকে শাস্তি না দিলে এ ব্যক্তি আরও অনেক মুসলমানকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবে। হয় শাস্তি দিউন, না হয় ঐ কাফের কল্‌মা পড়িয়া শুদ্ধ হউক।" পুনরায় নবাব বলিলেন, "ওহে ভাই, আপনার শাস্ত্র বল, নতুবা দণ্ড পাইবে।" হরিদাস বলিলেন, "ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ শাস্তি দিতে পারে না। কর্ম্মানুসারে লোক দণ্ড ভোগ করে। যদি আমার শরীর খণ্ড বিখণ্ড হইয়া প্রাণ বহির্গত হয়, তথাপি আমি হরিনাম পরিত্যাগ করিব না।" তখন নবাব

কাজির দিকে চাহিয়া বলিলেন, এখন কি করা কর্ত্তব্য? কাজি বলিল, "ইহাকে বাইশ বাজারে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেল। বিচারের আর প্রয়োজন নাই। তাহাতেও যদি না মরে, তবে জানিবে যে, ও যাহা বলে সব সত্য।"

পরে পাইকগণ হরিদাসকে বাজারে বাজারে সকলের সম্মুখে নিষ্ঠুর রূপে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। অবিচারে নির্দ্দোষীর প্রাণ দণ্ড হইতেছে দেখিয়া অন্য লোকেরা কেহ নবাব ও উজিরকে গালি দেয়, কেহ বলে, এই শাপে দেশ উৎসন্ন যাইবে, কেহ পাইকদিগকে মিনতি করে, যবনদিগের পায়ে ধরে, কেহ বা তাহাদের সঙ্গে বিবাদ করে; কিন্তু হরিদাস শান্তভাবে হরিনামে মগ্ন হইয়া সকল আঘাত সহ্য করিলেন। কেবল পাইকেরা যে তাঁহাকে মারিয়া অপরাধী হইতেছে, তজ্জন্য দুঃখ করিতে লাগিলেন। তাহাদের জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিলেন যে "হে প্রভো! আশীর্ব্বাদ কর ইহাদের যেন অপরাধ না হয়।" বাইশ বাজারে প্রহার সহ্য করিয়াও হরিদাস বাঁচিয়া রহিলেন। লোকদিগের প্রতিবন্ধকতায় পাইকেরা পুনঃ পুনঃ বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই জন্য সবলে তাঁহাকে আঘাত করিতে পারে নাই। এত প্রহারে মৃত্যু হইল না দেখিয়া যবনেরা বলাবলি করিতে লাগিল, "ভাই এ পুরুষ কি পীর না কি? মরেও না, আবার মাঝে মাঝে হাসে!" তাহারা বলিল "হরিদাস, তুমি যদি না মর, কাজিসাহেব আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবে।" শেষে হরিদাস হাসিয়া বলিলেন, "আমি মরিলে যদি তোমাদের মঙ্গল হয় তবে আমি মরি।" ইহা বলিয়া এমনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন যে, সকলে বুঝিল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তদবস্থায় নবাব সমীপে তাঁহাকে লইয়া গেল। তিনি আদেশ করিলেন, ইহাকে গোর দাও। কাজি বলিল তাহা হইলে উহার সদগতি হইবে, অতএব উঁহাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া যাউক। তাহাই করা হইল। পরে ভাসিতে ভাসিতে হরিদাস তীরে উঠিলেন এবং নবাবকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তখন নবাব কাতর ভাবে মিনতি করিয়া বলিল, "আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার শত্রু মিত্র সব সমান। যেখানে ইচ্ছা আপনি সেইখানে থাকুন। এই গঙ্গাতীরে গোফার মধ্যে আপনি অবস্থিতি করুন। যোগী জ্ঞানী লোকে কেবল মুখে বলে, কিন্তু আপনি সিদ্ধ পুরুষ।"

অতঃপর হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে ফুলিয়া গ্রামে

চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইল। এবং হরিধ্বনি করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া হরিদাস প্রেমে মত্ত হইয়া নাচিতে লাগিলেন, ভক্তিরসে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত হইল। পরে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল। হরিদাস বলিলেন, "বিপ্রগণ! ঈশ্বরনিন্দা শ্রবণ করিয়া আমি এই শাস্তি পাইলাম, ইহা আমার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। ভালই হইল, লঘু দণ্ডে মহাপাপ হইতে মুক্তি পাইলাম।"

এই ফুলিয়া গ্রামে হরিদাসের আশ্রম ছিল। রামায়ণ অনুবাদক কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি এই স্থান। হরিদাসের উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া পাষণ্ডগণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিত। তাহারা বলিত, এখন মহাবিষ্ণু শয়ানে আছেন, ইহার চীৎকারে যদি নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে আর নিস্তার নাই, হয়ত ইহাদের দোষে দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে। হরিনদী গ্রামের এক দুষ্ট ব্রাহ্মণ হরিদাসকে বলিল, "তুমি যে উচ্চ রবে সঙ্কীর্ত্তন কর, ইহা কোন্ শাস্ত্রে আছে?" হরিদাস বলিলেন, "সে কথা আপনারাই ভাল জানেন, আপনাদের মুখেই শুনিয়া যাহা কিছু আমি শিখিয়াছি। যাঁহারা হরিনাম জপ করেন তাঁহাদের নিজেরই পুণ্য, কিন্তু উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন যাহারা শুনে তাহাদেরও পুণ্য হয়। নাম করিতে যাহারা অক্ষম তাহারা উচ্চ কীর্ত্তন শুনিয়া পুণ্যলাভ করে। আপনাকে পোষণ করা আর আপনার সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও পোষণ করা, এতদুভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি তাহা সহজেই বুঝা যায়।" ব্রাহ্মণ তাহা শুনিয়া রাগিয়া বলিল, "আজ কাল হরিদাস দর্শনকর্ত্তা; বেদপথ দেখিতেছি নষ্ট হইবে। শাস্ত্রে আছে কলিতে শূদ্রে বেদ পড়িবে, তাহা সত্য হইল, যবনেও শাস্ত্রকর্ত্তা হইয়া উঠিল। এইরূপে তুই ভণ্ডামি করিয়া ঘরে ঘরে খাইয়া বেড়াস! তুই যাহা ব্যাখ্যা করিলি যদি ঠিক না হয়, তবে তোর নাক কাটিয়া দিব।" হরিদাস ঈষৎ হাস্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনামকীর্ত্তন করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

হরিদাসের ব্রত বড় কঠোর ছিল। তিনি প্রতি দিন তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। অতি দ্রুত গতিতে জপ করিলে এক ঘণ্টায় ছয় সহস্র হরিনাম জপ করা যায়। তাহা হইলে সমস্ত দিন রাত্রে এক লক্ষ চৌয়াল্লিশ হাজার হইতে পারে। শৌচাচমন স্নান আহার নিদ্রা চারি ঘণ্টার কমে আর হয় না, এক লক্ষ কিংবা দুই লক্ষ হরি নামের অধিক কিরূপে তিনি জপ করিতেন বুঝা যায় না। যাহউক, তিনি সর্ব্বদা

চিত্তকে নির্ম্মল রাখিবার জন্য অতি চমৎকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। হরিদাসের প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিয়া রামচন্দ্র খাঁ নামক নিকটস্থ কোন জমিদার তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবার মানসে এক বেশ্যাকে কুমন্ত্রণা দিয়া নিকটে পাঠাইয়া দেয়। তিনি হরিনামের বিস্তীর্ণ ঘন জালে দিবা রাত্রি ২৪ ঘণ্টা কাল একবারে এমন করিয়া ঘেরিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাহার মধ্যে একটু মাত্র ছিদ্র ছিল কি না সন্দেহ। বেশ্যা তাঁহার তপস্যাকুটীরের দ্বারে গিয়া মনোভিলাষ জ্ঞাপন করাতে হরিদাস বলিলেন, "আমার জপ সাঙ্গ হউক, তাহার পর তোমার কথা শুনিব।" ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, তথাপি জপ আর সাঙ্গ হয় না; অগত্যা সে কুলটা মায়াবিনী গৃহে ফিরিয়া গেল। পর দিন সন্ধ্যাকালে আবার আসিয়া সে জপসাঙ্গ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; এবং কপটভাবে নিজেও দুই এক বার জপ করিতে আরম্ভ করিল। সে দিন হরিদাস তাহাকে বলিলেন, "কল্য তুমি বড় কষ্ট পাইয়াছ। ভাল, অদ্য অপেক্ষা করিয়া থাক; তোমার আশা পূর্ণ হইতে পারে।" ক্রমাগত সমস্ত রাত্রি হরিদাসের পবিত্র হরিমন্দিরের দ্বারদেশে অবস্থিতি করিয়া এবং কৃত্রিম ভক্তির সহিত আপনি দুই একবার সেই নাম রসনায় গ্রহণ করিয়া তাহার বিকৃত কঠিন হৃদয় অল্পে অল্পে নরম হইয়া আসিল। অগ্নির নিকট থাকিলে কি আর মন উত্তপ্ত না হইয়া যায়? সে দিনেও জপ সাঙ্গ হইল না। বেশ্যা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, এমন সময় হরিদাস তাহাকে বলিলেন, "দেখ, আমি এক মাসে এক কোটি নাম জপের ব্রত লইয়াছি, কল্য অবশ্যই শেষ হইবে, অতএব তুমি আগামী কল্য আসিও।" তৃতীয় দিনেও সে নারী কুটীরদ্বারে বসিয়া পূর্ব্ববৎ কপটভাবে নাম জপ করত সময় প্রতীক্ষা করিয়াছিল। পরিশেষে চতুর্থ দিবসের প্রাতঃকালে দেখে যে সঙ্গগুণে তাহার মন গলিয়া গিয়াছে, হরিনামের জালে সে বাঁধা পড়িয়াছে; প্রভাত হইল তথাপি আর গৃহে গমন করিতে পারে না। তখন আপনার পাপ স্মরণ করিয়া, বৈরাগীর চরণে পড়িয়া সে নারী কাঁদিতে লাগিল। হরিদাস বলিলেন "দেখ, তোমার দুরভিসন্ধি বুঝিয়া তখনি আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম, কেবল তোমাকে হরিনাম লওয়াইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। এক্ষণে তুমি যদি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাও, তবে সমস্ত ধন ব্রাহ্মণ দরিদ্রকে দিয়া এই কুটীরে

আসিয়া পতিতপাবন হরিনাম সাধন কর।" এই কথা বলিয়া হরিদাস তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বেশ্যা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডন করিয়া একবস্ত্রা হইয়া সেইখানে হরিনাম সাধনে নিযুক্ত রহিল। পরে নিতাই যখন বঙ্গদেশে হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়ান, ঐ সাধুবিদ্বেষী দুরাত্মা রামচন্দ্রের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া তিনি উপনীত হন। বহু লোক জন তাঁহার সঙ্গে দেখিয়া সে বলিয়া পাঠাইল যে গোসাঞীকে কোন গৃহস্থের প্রশস্ত গোশালায় যাইতে বল, এখানে স্থান সঙ্কীর্ণ, এত লোক ধরিবে না। নিতাই রুষ্ট হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তিনি যেখানে বসিয়াছিলেন পাষণ্ড রামচন্দ্র তথাকার কতক মাটী উঠাইয়া সেখানে গোময় লেপন করিতে আদেশ করিল। এ ব্যক্তি নবাবকেও কর দিত না, নিজে সব ফাঁকি দিয়া ভোগ করিত। কিছু দিন পরে রাজসরকারের লোক আসিয়া ইহার গ্রাম ও বাড়ী লুট করে, জাতি ধর্ম্ম যায়, এবং সপরিবারে সকলকে বাঁধিয়া লইয়া যায়।

এখান হইতে হরিদাস সপ্তগ্রামের মধ্যবর্ত্তী চান্দপুরে ( বোধ হয় বর্ত্তমান চন্দনপুর ) গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তৎপ্রদেশীয় মজুমদার হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাসের গৃহে পণ্ডিতদিগের এক সভা হয়, তথায় হরিদাস হরিনামের মহিমা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলিলেন, "যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সমস্ত অন্ধকার, দস্যু চোর নিশাচরগণ পলায়ন করে এবং যাবতীয় বস্তু প্রকাশিত হয়, তেমনি হরিনাম সাধন দ্বারা অজ্ঞানতা পাপান্ধকার দূরে প্রস্থান করে এবং হরিপদে প্রেমোদয় হয়।" সভাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ হরিদাসের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক অভদ্র ব্রাহ্মণ গৌড়েশ্বরের অধীনে আরিন্দাগিরি কার্য্য করিত, সে নামমাহাত্ম্য শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল, "যদি নামে মুক্তি না হয়, তবে এই পণ রাখ, তোমার নাক কাটিয়া লইব।" হরিদাস বলিলেন, "অবশ্য আমি তাহাতে সম্মত আছি।" শেষ মহা গণ্ডগোল উঠিল, গোপালকে আর সকলে ভৎ'সনা করিয়া হরিদাসকে মিনতি করিতে লাগিলেন। তিনি হাস্যমুখে মধুর ভাবে বলিলেন, "তোমাদের কোন দোষ নাই, ও ব্রাহ্মণেরও কোন দোষ নাই; উহার তর্কনিষ্ঠ মন, নামমাহাত্ম্য কদাপি তর্কের গোচর নহে।" এখান হইতে হরিদাস শান্তিপুরে আসেন। অদ্বৈত আচার্য্য ইহাঁর সঙ্গে সর্ব্বদা গীতা ভাগবত পড়িয়া ধর্ম্মালাপ করি-

তেন এবং ইহাঁকে গঙ্গাতীরে গোফার মধ্যে স্থাপিলেন, “আমি আপনাকে প্রতি দিন আহার করাইতেন। হরিদাস তাঁহাকে এক দি যেন সর্ব্বদা কৃষ্ণ-প্রত্যহ অন্ন দাও কেন? তুমি কুলীন-সমাজে থাক, প্রধান ব্রহ্ম ধারণপূর্ব্বক আদর কর ইহাতে তোমার কি লজ্জা ভয় নাই? অলৌকিক তেজ। হায়, বলিতে ভয় পাই, কিন্তু যাহাতে আত্মরক্ষা হয় তাহা বলিলেন আচার্য্য কহিলেন, “তোমাকে ভোজন করাইলে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হয়।” এই যবন ভক্তকে অদ্বৈত গোসাঞী শুদ্ধসত্ত্ব ব্রাহ্মণের প্রাপ্য শ্রাদ্ধপাত্র আহারার্থ অর্পণ করিতেন।

যবনকুলপাবন হরিদাস ঠাকুরের শুভাগমনে নবদ্বীপবাসী ভক্তদলের উৎসাহ বৃদ্ধি হইল, তাঁহারা বৃদ্ধ বৈরাগীকে লইয়া নাম সঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইলেন এবং তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত শুনিয়া সাধু, সাধু, বলিতে লাগিলেন। যবনের হৃদয়ে এত প্রেম ভক্তি উচ্চ বৈরাগ্য, ইহা দেখিয়া কাহারই বা হৃদয় বিগলিত না হয়?

## চৈতন্যের ধর্ম্মভাব পরিবর্ত্তন।

ছাত্র অধ্যয়ন, জ্ঞানবিচার, কঠোর শুষ্ক তর্ক বিতর্ক, বিদ্যাভিমান, এবং সাংসারিক অসার বিষয়ের মধ্যে পড়িয়া বিশ্বম্ভরের জীবন নীরস হইয়া উঠিল। শ্রীবাস, মুকুন্দ প্রভৃতি তাঁহার পাণ্ডিত্যের চপলতা এবং ঔদ্ধত্য ভাব অবলোকনে ব্যথিত হইয়া যে সকল কথা বলিতেন তাহা লোকপরম্পরায় গৌরের কর্ণগোচর হইত। নানা কারণে তাঁহার মনে অবশেষে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল, আপনাকে আপনি অসুখী বোধ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন জীবন ভিন্ন গতি অবলম্বনের জন্য উপায়ান্তর অন্বেষণ করিতেছে। এই অবস্থায় গৌরচন্দ্র শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পিতৃলোকের সদগতির জন্য গয়াতীর্থে গমন করেন। পথে যাইবার কালে শিষ্যদিগের সঙ্গে কেবল ধর্ম্মালাপ করিতেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমজন্য পথিমধ্যে এক স্থানে গিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। অনেক কষ্টের পর আরোগ্য লাভ করিয়া গয়াধামে উপনীত হইলেন। তথায় যেখানে যেরূপ কার্য্য করিতে হয় ক্রমে তাহা সমাপন করিয়া বিষ্ণুপাদমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরমধ্যে বিষ্ণুপাদ পরিবেষ্টন করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা পূজা বন্দনা স্তব স্তুতি করিতেছে দেখিয়া

আসিয়া পতিতপাবন হরিদ্বার হইল, এবং নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল। হইতে প্রস্থান করিলেন। প্লাবিত হইয়াছিল তাহার দ্বার প্রথমে এইরূপে একবস্ত্রা হইয়া এই যে প্রেমধারা বহিতে লাগিল ইহা আর বন্ধ হইল না, নানা যখন বঙ্গদেশস্তরে প্রবাহিত হইয়া, ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুতর স্রোতস্বতীর সঙ্গে মিশিয়া চন্দ্রের চর অনন্ত প্রেমসিন্ধুতে গিয়া শেষ তাহা প্রবেশ করিয়াছিল। চুম্বক সান্দ্রক যেমন লৌহ আকৃষ্ট হয়, ভগবানের পদারবিন্দ তেমনি ভক্তের হৃদয় হইতে ভক্তিস্রোতকে টানিয়া বাহির করে। চরণের সঙ্গে ভক্তির বড় নিগূঢ় যোগ। তাই এই ভক্তবৎসল হরির চরণচিহ্ন দেখিয়া গৌরচন্দ্রের এত ক্রন্দন! এত ব্যাকুলতা! সেই বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে ভক্তিগঙ্গা প্রবাহিত হইল। চৈতন্যদেব ভক্তির মধুর আস্বাদন লাভ করিয়া একবারে বিমুগ্ধ হইলেন।

কুমারহট্ট (হালিসহর) নিবাসী ভক্তিপরায়ণ ব্রহ্মচারী ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে বিষ্ণুপাদমন্দিরে গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ হয়। ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রপুরী নামক এক জন পরমভক্ত প্রাচীন বৈষ্ণব সাধুর শিষ্য। মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈতেরও পূর্ব্বে ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়া যান। তিনি নিঃসঙ্গ বৈরাগী হইয়া বৃন্দাবনেই প্রায় বাস করিতেন, এবং এক জন অতি প্রমত্ত ভাবুক বৈষ্ণব ছিলেন। গয়ার দেবমন্দির, পর্ব্বতরাজি, তীর্থযাত্রীদিগের ধর্ম্মোৎসাহ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে গৌরের হৃদয় বিগলিত হয়, পরে ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া এবং তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহার চিত্ত একবারে ভাবে প্রেমে আকুল হইয়া উঠে। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনি পরমতীর্থ, আমাকে সংসারসমুদ্র হইতে রক্ষা করুন, এই আমি আপনাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলাম, আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান করান।" ঈশ্বরপুরী এ সকল কথা শুনিয়া এবং ব্যাকুলতা দেখিয়া মোহিত হইলেন। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপাদপদ্ম পূজা করিয়া বাসায় আসেন। পরে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহারে বসিবেন এমন সময় ব্রহ্মচারী তথায় উপস্থিত হইলেন। গৌর সেই অন্ন তাঁহাকে ভোজন করাইয়া নানাবিধ গন্ধমাল্য দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষা করত পুনর্ব্বার রন্ধন করিলেন।

আর এক দিন শচীকুমার পুরীকে বলিলেন, "আমাকে আপনি মন্ত্র দিয়া দীক্ষিত করুন।" তিনি বলিলেন, "তোমাকে প্রাণ দিতে পারি, মন্ত্র দেওয়া অধিক কি! নবদ্বীপধামে যে দিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে সেই অবধি আমার চিত্ত তোমাতে নিবদ্ধ হইয়াছে। তখন গৌর দীক্ষিত

দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, "আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিলাম, আমার প্রতি শুভ দৃষ্টি করুন, আমি যেন সর্ব্বদা কৃষ্ণ-প্রেমসাগরে ভাসিতে থাকি।" তদনন্তর ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ের প্রেমজলে উভয়ের অঙ্গ অভিষিক্ত হইল।

মন্ত্রগ্রহণের পর চৈতন্য গয়ায় কিছু-দিন অবস্থিতি করেন। কেহ কেহ বলেন এই খানে নিত্যানন্দ অবধূতের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এক দিন গৌরাঙ্গ ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে ভাবে বিহ্বল হইয়া, "কৃষ্ণ রে, বাপ রে, প্রাণ, জীবন, শ্রীহরি; আমার প্রাণ চুরি করিয়া তুমি কোথায় চলিয়া গেলে! আমার ঈশ্বরকে আমি পাইলাম, আমাকে ছাড়িয়া তিনি কোথায় গমন করিলেন!" এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। ভক্তিরসে মত্ত হইয়া ধূলিধূসরিত অঙ্গে মহা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। পরে সঙ্গিগণকে বলিলেন, "তোমরা গৃহে চলিয়া যাও, আমি আর সংসারে প্রবেশ করিব না; যেখানে আমার প্রাণনাথকে পাইব সেইখানে আমি যাইব।" শিষ্যগণ অনেক প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু সে ব্যাকুলতা ঔদাস্য কি সামান্য উপদেশে নিবৃত্ত হয়? নিরন্তর ভক্তি ভাবরসে তাঁহার হৃদয় অস্থির হইয়া রহিল। এক দিন শেষ রাত্রে উঠিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত "কৃষ্ণ রে, বাপ রে, তুমি কোথায় আছ!" এইরূপ বলিতে বলিতে মথুরার দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। কিছু দূর গমনের পর দৈববাণী হইল, "তোমার গমনের এ সময় নয়, যখন যাইবার সময় উপস্থিত হইবে তখন গমন করিও। এখন নিজগৃহে প্রত্যাগমন কর, তুমি লোকনিস্তারের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ব্রহ্মাণ্ডময় কীর্ত্তন করিবে, জগতে প্রেমভক্তি বিতরণ করিবে।" এই দৈববাণী শুনিয়া আর তিনি যাইতে পারিলেন না, শিষ্যদিগকে লইয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এ প্রকার মহাপুরুষদিগকে ভগবান্ স্বয়ং উপদেশ দিয়া পরিচালিত করেন, ভক্তের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া তিনি অলৌকিক ভাবায় ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দেন এ কথা চিরকাল সকল দেশে প্রসিদ্ধ আছে। বাড়ী ফিরিয়া আসিবার কালে কানাইয়ের নাট্যশালা নামক গ্রামে তাঁহার ঈশ্বরদর্শন লাভ হয়, এবং তাহাতে প্রাণ মন একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

তীর্থভ্রমণ, মন্ত্রগ্রহণ এবং সাধুসহবাস দ্বারা গৌরাঙ্গের যে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল তাহা যিনি দেখিলেন তিনিই বুঝিতে পারিলেন।

বস্তুতঃ ঈশ্বরপুরীর পবিত্র সহবাসে তাঁহার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়দ্বার একবারে চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হইয়া যায়। যখন তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন বোধ হইল যেন সে মানুষই নয়; মুখশ্রী, কথাবার্ত্তা, ব্যবহার, চক্ষের দৃষ্টি আর এক প্রকার হইয়া গিয়াছে। পথভ্রমণে দেহলাবণ্য জ্যোতিহীন, বস্ত্র মলিন, মস্তকের কেশ রুক্ষ, মন যেন আর এক রাজ্যে বিচরণ করিতেছে, বিরহ ব্যাকুলতার চিহ্ন মুখমণ্ডলে জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছে; মানসিক ভাবে এবং বাহ্য আকৃতিতে স্পষ্ট অনুভূত হইল অন্তরে বৈরাগ্যের অগ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রবৎসলা শচীদেবী সন্তানকে পাইয়া আহ্লাদিত হইলেন। প্রতিবাসী বন্ধু বান্ধব সকলে তাঁহাকে দেখিতে আসিল; গৌরাঙ্গ যথাযোগ্য প্রতি জনকে প্রণাম সম্ভাষণ করিলেন। সুহৃদ্বর্গ সকলকে লইয়া গৌরচন্দ্র তীর্থের গল্প করিতে লাগিলেন। এ সময় তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান বাইশ বৎসর হইবে।

# ভক্তির নবানুরাগ।

সমাগত প্রতিবাসী বন্ধু বান্ধবেরা বিদায় হইলে গৌরচন্দ্র বিষ্ণুভক্ত কতিপয় সাধুর সঙ্গে গোপনে তত্ত্বালাপ করিতে বসিলেন। গয়াধামে কোথায় কি দেখিয়াছিলেন এবং তথায় গিয়া মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। এই সব কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নযুগলে অজস্র বারিধারা বহিতে লাগিল। যেমন আগ্নেয় গিরির গর্ভস্থ দ্রব ধাতুরাশি অন্তস্তল বিদীর্ণ করিয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তেমনি ক্রমশঃ সেই নবোদিত ভক্তির উচ্ছ্বাস তাঁহার শরীরকে রোমাঞ্চিত ও কম্পিত অস্থির করিয়া বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে তিনি ভাবে একেবারে বিহ্বল হইলেন, নয়নজলে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল, শেষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ পণ্ডিতাদি ভক্তগণ চৈতন্যের ব্যাকুলতা অনুরাগ দর্শনে বিস্মিত হইয়া পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন, "এত অসাধারণ ভক্তির লক্ষণ দেখিতেছি! এমন অপূর্ব্ব ভাব কখনত দেখি নাই! বোধ হয় ইহাঁর প্রতি ভগবানের কৃপা হইয়াছে।"

ক্ষণকাল পরে গৌরমণি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং কাতর ভাবে সকলকে বলিলেন, "বন্ধুগণ! অদ্য তোমরা গৃহে প্রত্যাগমন কর; আমার দুঃখের কথা সমস্ত আমি তোমাদিগকে বলিব, কল্য শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে তোমরা আসিবে।" এই বলিয়া সকলকে বিদায় দিয়া তিনি একাকী প্রেমাবেশে বিভোর হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ঔদাস্য ভাব দর্শনে শচীমাতার মনে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। তথাপি বহু দিন পরে সন্তানকে পাইয়া তাঁহার হৃদয় শান্তি লাভ করিয়াছিল। ক্ষণকাল পরে আবার গৌরচন্দ্র "কোথায় কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ!" বলিয়া চীৎকার রবে গান ধরিলেন। তাহা শুনিয়া অন্যান্য ভক্তগণ দৌড়িয়া নিকটে আসিল। শচীমাতার মনে শঙ্কা হইল, সন্তানের বুঝি কোন উৎকট রোগ উপস্থিত হইয়াছে; এই মনে করিয়া তিনি ঠাকুর দেবতাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিতের পুষ্পোদ্যানে এক ঝাড় কুন্দ ফুলের গাছ ছিল, প্রতি দিন প্রাতে প্রাচীন বৈষ্ণবগণ তথায় ফুল তুলিবার উপলক্ষে একত্রিত হইয়া নানা বিষয়ে কথাবার্তা কহিতেন। গদাধর, গোপীনাথ, রামাই, শ্রীবাস ভক্তিরসে মগ্ন হইয়া পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীমান্ পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে বলিলেন, "কি হে! আজ যে বড় হাসির ঘটা দেখিতেছি?" শ্রীমান বলিলেন, "বড় অদ্ভুত কথা, অসম্ভব ব্যাপার! নিমাই পণ্ডিত গত কল্য গয়া হইতে বাড়ী আসিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, দেখিলাম তাঁহার আর সে পূর্ব্বের ভাব নাই, বৈরাগ্য এবং ভক্তির লক্ষণ সকল তাঁহাতে দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। আমাদিগকে নিভৃতে ডাকিয়া তীর্থের কথা বলিতে বলিতে যাই পাদপদ্ম তীর্থের কথা পড়িল, অমনি তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন, একবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অদ্য সদাশিব, মুরারি, গদাধর এবং আমাকে শুক্লাম্বরের ঘরে যাইতে বলিয়াছেন, তথায় তিনি আপনার মনের দুঃখ সকল প্রকাশ করিবেন।" এই কথা শুনিয়া সকলে হরিবোল দিয়া উঠিলেন। শ্রীবাস বলিলেন, "কৃষ্ণ আমাদের গোত্র বৃদ্ধি করুন!" সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে এই আনন্দের সংবাদ প্রচার হইয়া পড়িল। আহ্লাদের সীমা নাই। প্রখর তার্কিক মহাবুদ্ধিমান্ নিমাই পণ্ডিত ভক্তিরসে মত্ত হইয়াছেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পক্ষে

তখন ইহার তুল্য সুখের সংবাদ আর কি হইতে পারে? ভক্ত পরিবার বৃদ্ধি হইল দেখিয়া তাঁহারা সকলে হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে শুক্লাম্বরের গৃহে ভক্তবৃন্দের সমাগম হইল। গৌরচন্দ্র তথায় আসিয়া মিলিলেন। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় তখন বিশ্বম্ভরের অবস্থা। কথাবার্ত্তা বিশেষ কিছু আর হইল না, সকলকে দেখিবামাত্র তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল। "যে ঈশ্বরকে আমি পাইলাম, তিনি কোথায় গেলেন!" এই বলিয়া ঘরের একটা খুঁটি এমনি ভাবে জড়াইয়া ধরিলেন, যে সেটা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গ মুক্তকেশে ভূতলশায়ী হই-লেন। চারি দিকে ক্রন্দনের মহা রোল উঠিল, ভক্তগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অধোমুখে গদাধর কাঁদিতেছেন, অপর সকলে চিত্রপুত্ত-লিকার ন্যায় অবাক্ হইয়া গৌররূপ দেখিতেছে, আহা সে কি এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! ধরাতলে ইহার অনুরূপ আর কিছুই দেখা যায় না। কিয়ৎকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন, "গদাধর! তুমি ভাগ্যবান্ সুকৃতি পুরুষ, বালক কাল হইতে প্রভুর চরণে তোমার ভক্তি। হায় আমার জন্ম বৃথা গেল! অমূল্য নিধি পাইয়াও আমি নিজদোষে তাহা হারাইলাম!" এই কথা বলিয়া তিনি ভূমিতলে লুটাইতে লাগিলেন। একবার জ্ঞান হয় আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন; আঘাত প্রতিঘাতে অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত এবং আপাদ মস্তক ধূলিধূসরিত হইল; চক্ষু আর উন্মীলন করিতে পারেন না, কেবল মুখে হরি হরি বলেন আর বন্ধুগণের গলা ধরিয়া কাঁদেন। এইরূপ প্রেমাবেশে সমস্ত দিন চলিয়া গেল। অনন্তর এই কথা ভক্তেরা আর আর সকলের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন। কেহ বলেন ভালই হইল, এখন পাষণ্ডীদিগকে আর ভয় নাই। কেহ বলেন স্বয়ং কৃষ্ণ আসিয়া গৌরের শরীরকে আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহারা নিমাইকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত নবদ্বীপের লোক এ সংবাদ জানিতে পারিল। বৈষ্ণবসমাজ মহানন্দে পুলকিত হইয়া নাচিতে লাগিল। ইহা লইয়া নগরমধ্যে একটি ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হয়। ঈশ্বরবিরহে মনুষ্য এমন করিয়া কাঁদে, মাটীতে গড়াগড়ি দেয়, মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, শোক করে, ইহাত পূর্ব্বে কেহ কখন চক্ষে দেখে নাই; সুতরাং ইহা একটী নূতন ব্যাপার হইয়াছিল। বিশেষতঃ মহাবুদ্ধিমান্, জ্ঞানগর্ব্বিত, গম্ভীর প্রকৃতি গৌরাঙ্গ এ প্রকার উন্মাদবৎ ব্যবহার করি-

বেন, হরিবিরহে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিবেন, ইহা আশার অতীত; এই জন্ত প্রতি ঘরে ঘরে এই কথা হইতে লাগিল।

চৈতন্ত গৃহে গিয়া ক্ষণকাল উন্মনা হইয়া রহিলেন। তদনন্তর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। পণ্ডিত বলিলেন, "বৎস! তুমি পিতৃকুল উদ্ধার করিলে, তোমার জীবন ধন্ত! কিন্তু যে হইতে তুমি গয়ায় গিয়াছ, তোমার ছাত্রগণ কেহ আর পুঁথি খোলে নাই; অতএব কল্য হইতে তুমি পুনরায় অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হও।" তিনি যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গৃহে আসিলেন, এবং পর দিন শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে ছাত্র পড়াইতে বসিলেন। সে দিন পড়া শুনা আর কিছুই হইল না, পুরুষোত্তম সঞ্জয়কে কোলে লইয়া কেবল নয়নজলে তাহার অঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। ভাবে প্রেমে বিভোর, পড়াইবার শক্তি তখন কোথায়? গৃহে অবস্থান কালে গৌরাঙ্গ কেবল ভাগবতের শ্লোক পড়েন, আর প্রেমজলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া যায়। নিরন্তর এইরূপ রোদন, বিরহবিলাপ, উন্মাদের ন্তায় ব্যবহার দেখিয়া শচীর মনে আশঙ্কা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পুত্রের কল্যাণের জন্ত তিনি কখন ঠাকুর দেবতার পূজা দেন, দৈবক্রিয়া করেন, কখন পুত্রবধূকে নিকটে আনিয়া বসান, এবং বিশ্বম্ভরের সুস্থতার জন্ত কাতর অন্তরে প্রার্থনা করেন। কিন্তু পুত্রের আর অন্ত দিকে দৃষ্টি নাই, যুবতী ভার্য্যার মুখপানে একবার ফিরিয়াও চাহেন না। "কোথা কৃষ্ণ! কোথা দীনবন্ধু!" বলিয়া এক একবার এমনি হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া উঠেন যে তাহা শুনিয়া মাতার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, বিষ্ণুপ্রিয়া দূরে পলায়ন করেন। রজনীতে গৌরের চক্ষে নিদ্রা নাই, সর্ব্বদা অস্থির, যেন কোন এক অদ্ভুত শক্তি দ্বারা দিবা নিশি তিনি চালিত হইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার নিজের উপর তখন আর বড় কর্তৃত্ব ছিল না। তোমার আমার ধর্ম্মভাব আয়ত্তাধীন, চাই উপাসনা ধ্যান যোগ সঙ্কীর্ত্তন দশ দিন করিলাম, চাই দশ বৎসর নাও করিতে পারি; কিন্তু ইহার অন্ত প্রকার ভাব, ধর্ম্ম ইহাকে ধরিয়াছিল। একে ভক্তি তাহাতে নবোদ্যম, মত্ততার আর বিরাম রহিল না।

# অধ্যাপনা সমাপ্তি।

পর দিন প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া নিমাই পণ্ডিত ছাত্রদিগকে পড়াইতে বসিলেন। সে দিকেত আর মন নাই, অন্যের উপরোধ অনুরোধে এক বার কেবল গিয়া বসিলেন মাত্র। ছাত্রেরা যাই হরি বলিয়া পুঁথি খুলিতে লাগিল অমনি সেই নাম শ্রবণমাত্র গৌরচন্দ্র ভক্তিরসে প্রমত্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। কিছু ক্ষণ পরে ভাবে মগ্ন হইয়া পড়াইতে লাগিলেন। যাহা পড়ান তাহাতেই হরিনাম ব্যাখা করেন। সূত্র বৃত্তি টীকা সব হরিনাম। নিমাই বলিতে লাগিলেন, "সর্ব্ব শাস্ত্রের মর্ম্ম একমাত্র হরি। অজ ভব আদি সকলে তাঁহার কিঙ্কর। হরিই সর্ব্বময়কর্ত্তা, তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহারা অন্যরূপে শাস্ত্রব্যাখ্যা করে তাহাদের জন্মই বৃথা। হরিচরণে যাহাদের মতি গতি নাই, তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা কেবল দুর্গতি মাত্র। হরিভক্তিহীন শাস্ত্রকারেরা গর্দ্দভের ন্যায় কেবল পুস্তকরাশি বহন করে। পড়িয়া শুনিয়া অহঙ্কারী হইয়া লোক কেবল উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইল। হরিপদে রতি না থাকিলে পণ্ডিত কথন শাস্ত্রমর্ম্ম বুঝিতে পারে না। কিন্তু ভক্তিমান্ দরিদ্র অধম ব্যক্তি অনায়াসে সেই প্রভুর চরণ লাভ করে। অতএব ভাই সকল, আমার কথা শুন, যে চরণ শঙ্করাদি দেবগণ ভজনা করিয়াছেন, তোমরাও সেই অমূল্য চরণ ভজনা কর। এই নবদ্বীপে কাহার এমন ক্ষমতা আছে যে আমার এই ব্যাখ্যান সে খণ্ডন করিতে পারে?"

ছাত্রগণ নূতনবিধ ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং অধ্যাপকের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা পাইয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে চৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "অদ্য যেরূপ পাঠ দিলাম, তাহা কি তোমরা বুঝিতে পারিলে?" ছাত্রগণ বলিল "মহাশয়! আপনি সকল বিষয়েই কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা করিলেন, ইহা কি আমরা বুঝিতে পারি!" তখন হাসিয়া গৌরাঙ্গ বলিলেন, "চল আজ বেলা হইয়াছে, পুঁথি বাঁধিয়া চল গঙ্গাস্নানে যাই।" পরে স্নান করিয়া পূজান্তে আহারে বসিলে শচী জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপ নিমাই, আজ তুমি কি পুথি পাঠ করিলে, এবং কাহার সঙ্গে কন্দল করিলে?" কন্দল অর্থে এখানে বিচার। গৌর বলিলেন, "মা, আজ কেবল কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য পড়িলাম। তাঁহার নাম শ্রবণ কীর্ত্তন এবং তাঁহার চরণকমলই সার; এবং তাহাই সার শাস্ত্র যাহাতে কৃষ্ণভক্তি আছে।

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে। ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥" অতএব জননি! আপনি সর্ব্বদা হরিনাম করুন, হরিপদে ভক্তি হইলে মায়ার বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে।" এইরূপে তিনি শয়নে ভোজনে উপবেশনে সর্ব্বদা কেবল হরিভক্তি আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে যেমন বিদ্যাচর্চ্চা শাস্ত্রালাপে দিন রাত্রি মগ্ন থাকিতেন, এখন তেমনি ভগবৎপ্রসঙ্গে একবারে ডুবিয়া রহিলেন, হরিকথা ভিন্ন আর কোন কথা নাই। বিশ্বম্ভর যখন যাহাতে মন দিতেন তখন তাহাই লইয়া থাকিতেন, ইহা তাঁহার একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল।

পর দিন প্রাতে ছাত্রগণ পুনরায় অধ্যয়ন করিতে আসিল। চৈতন্য পড়াইতে বসিলেন, কিন্তু মুখে কৃষ্ণ কথা ভিন্ন আর কিছু আসে না। ছাত্রেরা বলিল, সিদ্ধ বর্ণ কাহাকে বলে? তিনি উত্তর দিলেন, সর্ব্ব বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ। বর্ণসিদ্ধ কিরূপে হইল? কেন, কৃষ্ণের কৃপায়! ছাত্রগণ বলিল, হে পণ্ডিত! উচিতমত ব্যাখ্যা কর। চৈতন্য বলিলেন সর্ব্বদা কৃষ্ণ নাম স্মরণ কর, আদি মধ্য অন্তে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা কর। ব্যাখ্যান শুনিয়া শিষ্যেরা হাসিতে লাগিল। কেহ বলে পণ্ডিতের বায়ুরোগ জন্মিয়াছে, কেহ অন্য প্রকার। ছাত্রেরা পুনরায় বলিল, আপনি এ কিরূপ ব্যাখ্যা করিলেন? চৈতন্য বলিলেন, শাস্ত্রে যেরূপ আছে তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছি। এখন যদি তোমরা বুঝিতে না পার, তবে বৈকালে আসিও, আমি ভাল করিয়া পড়াইব; আমিও নির্জ্জনে বসিয়া একবার গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখি। শিষ্যগণ ঘরে চলিয়া গেল।

নিমাই পণ্ডিতের এই সকল কথা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট জানাইয়া ছাত্রেরা অভিযোগ করিল। তাহারা বলিল, "মহাশয়! নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে আসিয়া অবধি এইরূপ আরম্ভ করিয়াছেন, এখন আমরা কি করি উপায় বলিয়া দিন।" গঙ্গাদাস তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে, "তোমরা এখন যাও, আমি এ বিষয়ে নিমাইকে সৎ পরামর্শ দিব।" অনন্তর বৈকালে চৈতন্য-দেব সশিষ্য গঙ্গাদাসের ভবনে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাদাস বলিলেন "বৎস নিমাই, ব্রাহ্মণের অধ্যাপনা কার্য্য অল্প ভাগ্যে হয় না, তবে কেন তুমি ইহাতে অবহেলা করিতেছ? দেখ, তোমার পিতা এবং মাতামহ পণ্ডিত ছিলেন, তুমি নিজেও এক জন প্রসিদ্ধ টীকাকার; অধ্যাপনা ত্যাগ করিলে যদি ভক্তি হয়, তবে কি তাঁহারা ভক্ত ছিলেন না? যে ব্রাহ্মণ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করে

সেই বৈষ্ণব ; মূর্খ ব্রাহ্মণ যে, সে ভাল মন্দ কিরূপে বুঝিবে ? অতএব মনোযোগ পূর্ব্বক ছাত্রদিগকে শিক্ষা দাও। আমার মাথা খাও, ব্যতিরিক্ত অর্থ করিও না।" চৈতন্য বলিলেন,"আপনার চরণপ্রসাদে যাহা শিখিয়াছি তাহাতে এমন কে আছে যে আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করিবে? আমি ছাত্র পড়াইব, যদি কাহারো ক্ষমতা থাকে তাহা খণ্ডন করুক!" তদনন্তর তিনি গর্ব্বের সহিত ছাত্রদিগকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

রত্নগর্ভ আচার্য্য নামক এক জন প্রতিবেশী ভক্তিযোগে অতি সুস্বরে ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিতেন। এক দিন অধ্যয়নকালে হঠাৎ সেই শব্দ চৈতন্যের কর্ণে যাইয়া প্রবেশ করিল, অমনি তিনি ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া ভূমিতে লুটাইতে লাগিলেন। অঙ্গে অশ্রু কম্প পুলকাদি নানা ভাবের আবির্ভাব হইল। কত ক্ষণ পরে উঠিয়া তিনি সেই ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন, এবং ছাত্রদিগকে বলিলেন, আমি কি আজ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলাম? তাহারা বলিল, আমরা দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আপনার মহিমা আমরা কি বুঝিব?

তৎপর দিন প্রাতে ছাত্রেরা নিবেদন করিল, "আমাদিগকে অদ্য ধাতুর সঙ্জ্ঞা বুঝাইয়া দিন।" চৈতন্য বলিলেন, "হরির শক্তি ভিন্ন ধাতু আর কিছুই নয়। ধাতুসূত্রের ব্যাখ্যা করিতেছি সকলে শ্রবণ কর। দেখি কাহার ক্ষমতা কত দূর, কে আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে পারে! রাজাই বল, আর প্রজাই বল ; পুষ্প চন্দন বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত আমোদপ্রিয় সুন্দর পুরুষই হউক, কিম্বা প্রবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষই হউন ; ধাতু গেলে সকলেরই দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। তখন কোথায় বা বল বিক্রম, আর কোথায় বা শোভা সৌন্দর্য্য ; ধাতু না থাকিলে কিছুই থাকে না। শরীর হইতে ধাতু চলিয়া গেলে কেহ তাহাকে দগ্ধ করে, কেহ বা পুঁতিয়া ফেলে। হরির শক্তিকেই ধাতু বলি ; যত ক্ষণ তাঁহার শক্তি শরীরে থাকে তত ক্ষণ জীবন। লোকে সেই শক্তিকেই স্নেহ মমতা, ভক্তি শ্রদ্ধা করে, বিদ্যার অহঙ্কারে পণ্ডিতেরা ইহা বুঝিতে পারে না। হয় না হয় সকলে ভাবিয়া দেখ। এখন যাহাকে মান্য গণ্য করিতেছি, ধাতু গেলে তাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিব। পিতা পুত্রকে কোলে লইয়া আদর করেন, ধাতু না থাকিলে আবার তিনিই তাহার মুখে অগ্নি দিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলেন। অতএব হরির শক্তিই ধাতু। এ কথা যদি কেহ খণ্ডন করিতে পারে তবে

করুক। যে কৃষ্ণের শক্তি এমন পবিত্র এবং পূজ্য, ভাই সকল, তাঁহাকে তোমরা ভক্তি কর; তাঁহার নাম শ্রবণ কীর্ত্তন কর, এবং তাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান কর। তাঁহার মহিমার অন্ত নাই, দন্তে তৃণ লইয়া সেই প্রভুর পদসেবা কর। হরি মাতা, হরি পিতা, হরি প্রাণ ধন; তোমাদের পায়ে ধরিয়া বলি, তাঁহাকে তোমরা আত্ম সমর্পণ কর।"

ছাত্রেরা ব্যাখ্যা শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, কেহ আর কিছু দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। মত্ততার কিঞ্চিৎ অবসান হইলে চৈতন্য সলজ্জ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধাতুসূত্রের আজ কিরূপ ব্যাখ্যা করিলাম?" ছাত্রেরা বলিল, "প্রকৃত অর্থই আপনি বলিয়াছেন, কার বাপের সাধ্য যে এ কথা খণ্ডন করে?" পরে চৈতন্য সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা তোমরা সত্য করিয়া বল দেখি, আমার কি কোন বায়ুর পীড়া হইয়াছে? আমি কি ব্যাখ্যা করিতে কি বলিযা ফেলি কিছুরই স্থিরতা নাই।" শিষ্যেরা কহিল "সূত্র, বৃত্তি, টীকা এ সমস্তের মধ্যে আপনি এক হরিনাম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ সব কথা বুঝিতে পারে এমন কে আছে? হরিনামে আপনার যেরূপ ভক্তির উদয় হয় তাহাতে আর আপনাকে মানুষ বলিয়াত বোধ হয় না! আপনার শরীরে অশ্রু কম্প পুলক যেরূপ দেখিলাম এমন আর কোথাও আমরা দেখি নাই। কল্য ভাগবতশ্রবণে আপনি যখন মূর্চ্ছিত হইলেন, তখন আপনার শরীরে ধাতু ছিল না; বোধ হইতে লাগিল যেন আপনার চক্ষে গঙ্গা নদী আবির্ভূত হইয়াছেন। শেষে যেরূপ কম্প উপস্থিত হইল তাহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। গত দশ দিবস হইতে যাহা কিছু আপনি ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহাতে এক হরিভক্তিই প্রচারিত হইতেছে। আপনার ব্যাখ্যাই সত্য, সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই এই, আমরা কর্ম্মদোষে বুঝিতে পারি না।" ছাত্রদিগের কথায় গৌরচন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন; এবং সকলকে মন খুলিয়া বলিলেন "দেখ ভাই, আর আমার কোন কথা বলা উচিত নয়। আমি সর্ব্বদাই এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিতে পাই, এই জন্য সর্ব্বক্ষণ তাঁহারই বিষয় কেবল বলিতে ইচ্ছা করে। কাণের কাছে হরিনামের শব্দ যেন দিন রাত্রি ভোঁ ভোঁ করিতেছে, সমস্ত জগৎ তাঁহারই মন্দির বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। তোমাদের নিকট এই নিবেদন, অদ্য হইতে আমাকে তোমরা বিদায় দাও, আর আমি পড়াইতে পারিব না। হরি ভিন্ন অন্য কথা আর আমার মুখে আসে না, মনের কথা সব তোমাদিগকে প্রকাশ করিয়া

বলিলাম।" এই বলিয়া সজল নেত্রে পুঁথিতে ডোর দিলেন। নিমাই পণ্ডিতের কথাবার্ত্তা শুনিয়া ছাত্রবৃন্দ কাঁদিয়া আকুল হইল, এবং বলিতে লাগিল, "আপনার যে সঙ্কল্প আমাদেরও সেই সঙ্কল্প। এমন ব্যাখ্যান আর আমরা কোথায় শুনিতে পাইব? আশীর্ব্বাদ করুন, যাহা শুনিলাম তাহা যেন হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারি।" এই বলিয়া সকলে পুথি বাঁধিয়া গুরুবিচ্ছেদে কাঁদিতে লাগিল, এবং হরিধ্বনি করিল। চৈতন্য তাহাদিগকে কোলে করিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইলেন, এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আমি যদি এক দিনের জন্যও হরির দাস হইয়া থাকি, সেই পুণ্যবলে বলিতেছি, তোমাদের আশা পূর্ণ হউক! তোমরা সর্ব্বদা হরিনাম কর, আর তোমাদের পড়িবার প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণের কৃপায় তোমাদের মুখে সর্ব্বশাস্ত্র স্ফূর্ত্তি পাইবে।" এই রূপে চৈতন্যের বিদ্যাবিলাস সাঙ্গ হয়। তদনন্তর তিনি হরিসঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। ছাত্রদিগকে বলিলেন, "এত দিনত পড়া শুনা করা গেল, আইস এক্ষণে আমরা সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করি।"

## মত্ততা ও হরিসঙ্কীর্ত্তনারম্ভ।

ছাত্রেরা কেহ কেহ ভবিষ্যতের ভাবনায় অন্য স্থানে বিদ্যা অভ্যাস করিতে গেল, কেহ বা গুরুর সঙ্গে ধর্ম্মপথেও শিষ্য হইয়া রহিল। তাহারা বলিল আর্য্য, আমরাত কীর্ত্তন করিতে জানি না, কিরূপে করিতে হয় তাহা শিক্ষা দিন। তখন শচীনন্দন শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া একত্রে হরিকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কেবল হরিনামমাহাত্ম্য বর্ণন আর করতালি, ইহাতেই সকলে প্রমত্ত হইয়া উঠিতেন। "হরি হরয়ে নম, কৃষ্ণ যাদবায় নম, গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।" এই গানটী প্রথমে সকলে গাইতেন। কোন কোন ছাত্র তাঁহার সঙ্গে উদাসীনের পথও অবলম্বন করেন। পরে সঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়া গৌরচন্দ্র বালকের ন্যায় পুনঃ পুনঃ ভূমিতে লুটাইতে লাগিলেন। কখন বল! বল! বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠেন, কখন সবেগে ধরাতলে পতিত হন; তাঁহার পদভরে এবং দেহের আঘাতে মাটি কাঁপিয়া যাইত। হরিনাম শুনিয়া আর সকল বৈষ্ণবগণ তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, "এমন প্রেম

ভক্তি জগতে ছিল ইহাত আমরা জানিতাম না। যা হউক, বড় সুখী হওয়া গেল, হরিভক্তিবিহীন নবদ্বীপ পবিত্র হইল, আমরা দেখিযা কৃতার্থ হইলাম। এমন দুর্ল্ভ ভক্তি নারদাদি ভক্তগণেরও দুষ্প্রাপ্য।”

পর দিন প্রাতে ভক্তগণ অদ্বৈতাচার্য্যকে এই শুভ সংবাদ দিবার জন্য তাঁহার ভবনে উপস্থিত হন। গৌরের অলৌকিক ভাবাবেশের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ অদ্বৈতের আর আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। তিনি গদ্গদ হইয়া সকলকে বলিলেন, “কল্য আমি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমি এক স্থানে গীতার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া দুঃখিত মনে অনাহারে নিদ্রিত ছিলাম, কে যেন আসিয়া বলিল, শীঘ্র উঠিয়া ভোজন কর। যে জন্য তুমি এত উপবাস আরাধনা করিয়াছিলে তাহা পূর্ণ হইয়াছে। দেশে দেশে নগরে নগরে ঘরে ঘরে হরিসঙ্কীর্ত্তন হইবে। যাঁহার অবতরণ প্রার্থনা করিয়াছিলে এক্ষণে তিনি বিদিত হইয়াছেন। ব্রহ্মার দুর্ল্ভ যে ভক্তি তাহা সকলে পাইবে। শ্রীবাসের ঘরে ভক্তগণ নৃত্য গীতে মজিবে। ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিলাম বিশ্বম্ভর সম্মুখে। বিশ্বরূপ যখন আমার নিকট গীতা পাঠ করিত, তখন মাঝে মাঝে পরম সুন্দর রূপবান্ এই শিশু অগ্রজকে ডাকিতে আসিত। বালকের রূপে মুগ্ধ হইয়া “ভক্তি হউক!” বলিয়া আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতাম। সম্ভ্রান্ত ভদ্র বংশে তাঁহার জন্মও বটে, আর তিনি নিজেও সর্ব্বগুণে বিভূষিত, আজ তোমাদের কথা শুনিয়া আমি বড় সুখী হইলাম।” এই বলিয়া তিনি আনন্দে হুঙ্কার ধ্বনি করিলেন, বৈষ্ণবগণ মহা আহ্লাদের সহিত কীর্ত্তন আরম্ভ করিল, এবং দলবদ্ধ হইয়া এই কথা ঘোষণা করিতে করিতে সকলে গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেল।

নিমাই পণ্ডিত ভক্তিতে পাগলের মত হইয়াছেন, বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য অধ্যাপনা সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়াছেন, অহঙ্কার অভিমান পরিহার করিয়া দিবা নিশি হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, এ কথা শুনিয়া ভক্ত বৈষ্ণবগণের মনে যেমন আনন্দ বৃদ্ধি হইল, তেমনি খ্যাতিলুব্ধ অন্ধকারে লুকায়িত অধ্যাপকগণের হৃদয়ও প্রফুল্ল হইল। এত বড় এক জন পণ্ডিত ধন মান সম্ভ্রমের আশা পরিত্যাগ করিলেন, ইহাতে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার হইয়া গেল, এই তাঁহাদের আহ্লাদের কারণ। আবার সামান্য জন কতক বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে নিমাই পণ্ডিত মিশিলেন, ইহা ভাবিয়া বিদ্যাভিমানী নৈয়ায়িক দুই এক জন পণ্ডিত তাঁহার উপর বিরক্তও হইল। কেন না

বিদ্বান্ পণ্ডিত হইয়া ভাবুক ভক্তদলে প্রবেশ করা তাঁহাদের পক্ষে কিছু অপমানের বিষয়। শাক্ত বামাচারী এবং পাষণ্ডিগণ এ কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

## চৈতন্যের সাধুসেবা।

এক্ষণে গৌরাঙ্গ দেব সম্পূর্ণরূপে আর একটি নূতন পথ ধরিলেন। গঙ্গাস্নানের পথে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া বিনম্রভাবে প্রণাম করেন, তাঁহারাও আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন, "বাপ, কৃষ্ণপদে তোমার ভক্তি হউক! ভক্তি বিনা বিদ্যা কিছুই নয়। কৃষ্ণ জগৎপিতা, জগজ্জীবন, তাঁহাকে দৃঢ় করিয়া তুমি ভজনা কর।" চৈতন্য আশীর্ব্বাদ পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিতেন, "আপনারা বিষ্ণুভক্ত, আপনাদের কৃপা হইলে আমি কৃষ্ণধন লাভ করিব।" এই বলিয়া কাহারো পায়ে ধরিতেন, কাহারো আর্দ্র বসন নিংড়াইয়া শুষ্ক বস্ত্র হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, পূজার সামগ্রী গঙ্গামৃত্তিকা কুশ কাহারো হস্তে দিতেন, কোন দিন কাহারো ফুলের সাজি ইত্যাদি লইয়া যাইতেন; এইরূপে ভক্তসেবা আরম্ভ করিলেন। নিমাইকে বিনীত দেখিয়া তাঁহারা কুণ্ঠিত হইয়া বলিতেন, হায়! হায়! এ কি কর! এ কি কর! তথাপি বিশ্বম্ভর ছাড়িবার পাত্র নহেন। বাল্যকালে জলে ডুব দিয়া এক ভাবে লোকের পা ধরিয়া টানিতেন, এখন আবার আর এক ভাবে আরম্ভ করিলেন। ভক্তির কি আশ্চর্য্য লীলা! সেই দেশবিখ্যাত নিমাই পণ্ডিত কি না পথে পথে ভক্তদিগের ধুতি এবং পূজার সামগ্রী স্বহস্তে বহিয়া লইয়া যাইতেছেন! বৈষ্ণবেরা কি বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন তাহা আর খুঁজিয়া পান না। সকলে প্রসন্ন চিত্তে বলিতে লাগিলেন, "বাপ, তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সকল দুঃখ দূর করুন। যাহারা এখন আমাদিগকে পরিহাস করে তাহারা নামরসে ডুবিয়া যাউক। তোমার প্রসাদে আমরা হরিগুণ গান করিয়া কৃতার্থ হই। শাস্ত্রজ্ঞানে যেমন সকলকে তুমি পরাজিত করিলে, তেমনি হরিভক্তিতে পাষণ্ডদিগকে সংহার কর। এই নবদ্বীপে যত বড় পণ্ডিত আছেন, ভক্তিবিষয়ে সকলে বকের ন্যায়। তপস্বী সন্ন্যাসী গৃহী সকলেই হরিরসবিমুখ। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে পাপিষ্ঠ মানবগণ

আমাদিগকে উপহাস করে, তাহাদের দৌরাত্ম্যে আমরা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। তোমা দ্বারা আমাদের সকল আশা পূর্ণ হইবে, এই জন্য দীনবন্ধু হরি তোমাকে এ পথে আনিয়াছেন। বাপ, তুমি চিরজীবী হইয়া থাক।” এই বলিয়া প্রাচীন ভক্তগণ তাঁহার গায়ে হাত দিয়া ঐকান্তিক ভাবে আশীর্ব্বাদ করিতেন। তাঁহাদের প্রসন্নতা লাভ করিয়া চৈতন্য বলিতেন, “আপনারা আমাকে যদি ভাল বলিলেন, ইহাতেই আমি ধন্য হইলাম। সকলে সুখে হরিসঙ্কীর্ত্তন কর, ভক্তের দুঃখ ভগবান্ চির দিন রাখেন না। আমাকে তোমরা সেবক বলিয়া জানিবে, কখন বিস্মৃত হইবে না।” এইরূপে কিছু দিন ভক্তগণের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ লইয়া বিশ্বম্ভর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন।

## বিরহজ্বালা এবং নিত্যসঙ্কীর্ত্তন।

ভক্তির যে বিচিত্র ভাবরসে এক্ষণে গৌরাঙ্গ ভাসিতে লাগিলেন, তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা অসাধ্য। কখন ক্রন্দন, কখন হাস্য, কখন ভূমিতে লুণ্ঠিত। বনিতা বিষ্ণুপ্রিয়া নিকটে আসিলে তাঁহাকে তাড়াইয়া মারিতে যান, আপন মনে কি কথা বলেন, দন্ত ঘর্ষণ করেন, কখন গাছে চড়েন, মুখে কথা নাই, চক্ষু মুদ্রিত, পাষণ্ডী দেখিলে তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত হন। হুঙ্কার গর্জ্জন নানা ভাব দেখিয়া কেহ পাগল বলিয়া হাস্য করে, কেহ বলে ভূতে পাইয়াছে। শচীমাতা দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হইলেন। প্রতিবাসীরা তাঁহাকে বলিতে লাগিল, “ঠাকুরাণী, তুমি কি দেখিতেছ? তোমার ছেলের বায়ুরোগ জন্মিয়াছে, হাতে পায়ে দড়ি দিয়া বাঁধ, নারিকেলের জল খাইতে দাও, গায়ে শিবাঘৃত এবং মাথায় পাকতৈল মাখাইয়া স্নান করাও, উদ্ধ বায়ু হইয়াছে আপনি এখনি নামিয়া যাইবে।” সরলমতি শচীদেবী যে যাহা বলে তাহাই করেন, ভাবনায় তাঁহার চিত্ত মহা ব্যাকুল হইল। একমাত্র সন্তান, তাহার আবার এই দশা, দিশাহারা হইয়া তিনি পাঁচ জনের কাছে দুঃখ করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসের নিকট লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গৌরাঙ্গের ভক্তি আরও উথলিয়া উঠিল। থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন; ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু কম্প পুলক, একবারে তাঁহাকে যেন অস্থির করিয়া তুলিল। লোকে ধর্ম্ম করে খায় দায়, ঘরকন্না করে, বেশ কোন

উৎপাত নাই; তাহাদের সংসারের প্রতি কেমন উজ্জ্বল দৃষ্টি; চৈতন্যের এ এক সৃষ্টিছাড়া ভাব। বিকারী রোগীর অপেক্ষা তাঁহার বিরহজ্বালা অধিক। কোথা হইতে চক্ষে এত জল ঝরিত ভাবিয়া কেহ কিছু ঠিক করিতে পারিত না। একটু চেতনা লাভ করিয়া তিনি শ্রীবাসকে বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি কি বল? বায়ুগ্রস্ত বলিয়া যে আমাকে লোকে বাঁধিয়া রাখিতে চায়?" শ্রীবাস হাসিয়া বলিলেন, "ভাই, তোমার যে এ রোগ, এ শিব ব্রহ্মাদি দেবতাদিগেরও বাঞ্ছনীয়। কৃষ্ণের অনুগ্রহ হইয়াছে, তাই তোমাতে মহাভক্তির লক্ষণ সকল আমি দেখিতেছি।" সে কথা শুনিয়া পণ্ডিতকে তিনি আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তোমার কথায় আজ আশা হইল। তুমি যদি ইহাকে বায়ুরোগ বলিতে, তাহা হইলে আজ আমি গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিতাম।" শ্রীবাস শচীকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন। বলিলেন, "ইহা রোগ নয়, কৃষ্ণভক্তি, অন্য লোকে ইহা বুঝিতে পারে না। তুমি কাহাকে কোন কথা বলিও না, কৃষ্ণের লীলারহস্য অনেক দেখিতে পাইবে।" শ্রীবাসে কথায় শচী তখন কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন। কিন্তু অন্তরের দুঃখ গেল না। পাছে নিমাই সন্ন্যাসী হইয়া যায় এই কেবল তাঁর ভয়।

এইরূপে কিছু দিন যায়, এক দিন বিশ্বম্ভর গদাধরকে সঙ্গে লইয়া অদ্বৈতের সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। উভয়ের সম্মিলনে মহা আনন্দ উপস্থিত হইল। শচীকুমারকে দেখিবামাত্র মত্ত সিংহের ন্যায় দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আচার্য্য তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন, এবং হুঙ্কার রবে হরি হরি বলিয়া উঠিলেন। দেখিয়া শুনিয়া চৈতন্যের মূর্চ্ছা হইল। অদ্বৈত যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, চোর, আর কত দিন তুমি লুকাইয়া থাকিবে! চোরের কাছে আবার চুরি! গৌরকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় পাইয়া বৃদ্ধ মনের সাধে ষোড়শোপচারে তাঁহার চরণ পূজা করিলেন। তদ্দর্শনে গদাধর জিহ্বা কামড়াইলেন। অদ্বৈত বলিলেন, "তুমি ছেলে মানুষ, কি বুঝিবে!" পরে উভয়ে অনেক মিষ্টালাপ হয়। ভক্তিভাবের আর অন্ত নাই, ভক্ত যাহা দেখেন তাহাতেই ভাবের উদয় হয়, ভক্তসঙ্গ পাইলে হৃদয়মধ্যে প্রবল বন্যা আসে। অদ্বৈত প্রাচীন হইয়াও এই যুবকের পদসেবা করিলেন। গৌরও সে বিষয়ে ঠকিবার লোক নহেন। বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়া বৃদ্ধ আচার্য্যের অভিনন্দন করিলেন, বিনীত ভাবে তাঁহার পদধূলি লইলেন। তদনন্তর আচার্য্য কুটিল হাস্যের সহিত গৌরকে বাড়াইয়া

বলিলেন "যাহাতে সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হয় তাহা করিতে হইবে। তোমাকে লইয়া বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করেন এই তাঁহাদের ইচ্ছা।" তাহাতে সম্মত হইয়া বিশ্বম্ভর গৃহে চলিয়া আসিলেন, এবং প্রেম পরীক্ষার জন্য অদ্বৈত শান্তিপুর গমন করিলেন।

অতঃপর ভক্তসঙ্গে গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। এক এক করিয়া সকলের সহিত ক্রমে বন্ধুতা জন্মিয়া গেল। পরিশেষে এমনি হইল, যে কেহ আর কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহেন না। তাঁহাকে পাইয়া বৈষ্ণবগণ পরমাহ্লাদিত হইলেন। পরস্পরকে তাঁহারা এত ভাল বাসিতে লাগিলেন যে সকলের হৃদয় যেন এক হইয়া গেল। আহা! সে যেন পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি। এমন প্রেম, প্রগাঢ় বন্ধুতা, অপূর্ব্ব সৌহৃদ্য আর কোথাও দেখা যায় না। যত প্রেম ভক্তি অনুরাগ স্নেহ মমতা ছিল সমুদায় ইহাঁরা পরস্পরকে দিয়া সুখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ সকলেরই পরমপ্রিয় হৃদয়ানন্দকর হইয়া বন্ধুমণ্ডলীতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ভক্তির নানা ভাব গৌরের জীবনে লক্ষিত হইত। কখন আনারসের ন্যায় তাঁহার শরীর কণ্টকিত, কখন অসাড় স্তম্ভের ন্যায়; কখন নবনীতের ন্যায় কোমল ভাব ধারণ করিত। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার হরিবিরহানল প্রবল হইয়া উঠিল। কোথা নাথ! কোথা প্রাণধন! ইহা ভিন্ন আর মুখে অন্য কথা নাই। অপর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন না। যাহাকে দেখেন তাহাকেই ব্যাকুল হইয়া বলেন, "ও গো! কৃষ্ণ কোথা বলিতে পার!" মাতৃহারা শিশুর ন্যায় নিতান্ত ব্যাকুল হইতেন। এক দিন কীর্ত্তনের পর ভক্তগণের নিকট কানাইনাটশালে যে তাঁহার ঈশ্বরদর্শন হয় সেই কথা বলিতে বলিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। বলিলেন "সেই মনোহর রূপ, সহাস্য মুখ যে দিন হইতে আমি দেখিয়াছি সেই অবধি আমার প্রাণ তাঁহার জন্য অস্থির হইয়াছে। তিনি হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন দান করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন আর দেখা পাইলাম না। হায়! আমার কি দুর্ভাগ্য, আমি জীবনবল্লভকে পাইয়াও হারাইলাম!" গয়াধামে গিয়া চিত্তের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল বন্ধুগণকে গৌর তাহা আদ্যোপান্ত বলিলেন এবং সেই দর্শনের কথা স্মরণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। দুই চক্ষে শতধারা বহিতে লাগিল। এত ব্যাকুলতা, ক্রন্দন আর কোথাও দেখা যায় না। পুত্রশোকে কাতরা জননীও এত কাঁদিতে পারেন না।

এক দিন গদাধরকে দেখিয়া বলিলেন, "আমার কৃষ্ণ কোথায়, তুমি তাঁহাকে আনিয়া দিতে পার?" তিনি বলিলেন, "কৃষ্ণ হৃদয়ে আছেন।" সে কথা শুনিয়া গৌর নখদ্বারা বক্ষ বিদারণ করিতে উদ্যত হইলেন। মহা বিপদ দেখিয়া গদাধর শেষ বলিলেন, ক্ষান্ত হও, স্থির হও, তিনি এখনি তোমাকে দেখা দিবেন। শচী গদাধরকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, বাপ, তুমি বড় বুদ্ধিমান্, তুমি আমার গৌরের সঙ্গ কখন ছাড়া হইও না।

ইদানীং শচী আর পুত্র বলিয়া গৌরকে প্রাকৃত ভাবে বড় দেখিতেন না। বুঝিতে পারিলেন, যে এ সামান্য ছেলে নয়। এই জন্য ভক্তির চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। নিকটে যাইতে সঙ্কুচিত এবং ভীত হইতেন। সন্ধ্যা হইলেই হরিভক্ত সঙ্গিগণ শচীগৃহে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সকলে মিলিয়া কোন কোন দিন সমস্ত রাত্রি সঙ্কীর্ত্তন করেন। গৌরচন্দ্রের অলৌকিক কীর্ত্তনাবেশ দর্শনে বৈষ্ণ ভক্ত নরনারী সকলে অবাক হইয়া গেল। কেহ বলে, ইনি অংশাবতার, কেহ বলে কৃষ্ণ স্বয়ং ইহার দেহে আবির্ভূত হইয়াছেন। মানুষ বলিয়া মানবীয় চক্ষে কেহ আর তাঁহাকে দেখিত না। স্বচক্ষে ঈশ্বর দর্শন করিলাম, এই বিশ্বাসে ভক্তগণ মহা হরষিত হইতে লাগিলেন। দেবতা-জ্ঞানে সকলেই পূজা করিতেন। মুকুন্দের বেশ মিষ্ট স্বর ছিল, তিনি সুর করিয়া ভাগবত পড়িতেন এবং গানও করিতেন, তাহা শুনিবামাত্র চৈতন্যের ভাবের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিত। গৌরের মত্ততা বিদ্যুতের ন্যায় সকলের চিত্তে সংক্রামিত হইত। এইরূপে হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

কিছু দিনান্তে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনে প্রতিসন্ধ্যাকালে ভক্তগণ গৌরাঙ্গের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাকালে পল্লিগ্রামবাসী বিষয়ী জীব সকল নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়, কিন্তু ইহাঁদের চক্ষে আর নিদ্রা নাই; সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করেন। সাধুবিদ্বেষী ভক্তিবিরোধী সুখাসক্ত প্রতিবাসিগণ মহা বিরক্ত হইতে লাগিল। কীর্ত্তনের অন্তর্ভেদী শব্দে, মত্ত সিংহ গৌরের বিশাল হুঙ্কার রবে উদ্দণ্ড নৃত্যে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, আর রাগিয়া মরে। বলে ভাই, ইহারা পাগল হইল না কি! নিদ্রা যাইতে দেয় না, রাত্রি দুই প্রহরের সময় চীৎকার শব্দ, এ যে বড় বিপদ হইল দেখিতেছি! ইহারা জ্ঞানযোগ বিচারপথ ছাড়িয়া এরূপ গোলযোগ করে কেন? মনে মনে হরি বলিলে কি আর পুণ্য হয় না? শ্রীবাস ব্রাহ্মণটা করে কি! কেহ বলে ভাই বড় প্রমাদ হইল, এই ব্রাহ্মণের জন্য আমাদের শুদ্ধ সর্ব্বনাশ

হইবে। শুনিলাম নবাব দুই খান নৌকা পাঠাইয়াছে, শ্রীবাসকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। শেষ ও বামুন পলাইবে, আমাদিগকে লইয়াই টানাটানি পড়িবে। কেহ বলে, ভাই রাজার লোক আসিলে আমরা উহাকে ধরিয়া দিব, তাহারা বাঁধিয়া লইয়া যাইবে।

নিরামিষভোজী হরিভক্ত বৈষ্ণবগণ নিতান্ত সরলচিত্ত, যে যাহা বলে তাহাতেই বিশ্বাস করেন, নবাবের লোক ধরিতে আসিয়াছে নগরময় এই কথা রাষ্ট্র হইল। চৈতন্য দেব ইহাঁদিগকে সাহস দিবার জন্য অঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া, গলায় ফুলের মালা পরিয়া, সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া ভক্ত-সঙ্গে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার বিশাল বক্ষস্থলে, আজানু-লম্বিত বাহু, আয়ত্ত লোচন, চিকুর কুন্তল, নবীন যৌবনের সুন্দর দেহশোভা, প্রেমোজ্জ্বল মুখদ্যুতি দর্শনমাত্র ভবভয় দূর হইত। নির্ভয়ে তাঁহাকে বিচরণ করিতে দেখিয়া বিদ্বেষীরা রাগে গর গর করিতে লাগিল। কেহ বলে, ইহার মনে কি একটু মাত্র ভয় নাই! কেহ বলে তা নয় হে, নিমাই পণ্ডিত পলাইবার পথ দেখিয়া বেড়াইতেছে। ভাগীরথীর নির্ম্মল জলস্রোতঃ এবং সিকতাময় সুন্দর পুলিন দেখিতে দেখিতে গৌরের ভাবোদয় হইল, তৎক্ষণাৎ অতি বেগে একবারে তিনি "মুই সেই মুই সেই" বলিতে বলিতে শ্রীবাসের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানই ভক্তগণের বিলাসমন্দির ছিল। শ্রীবাস তখন ঘরের মধ্যে নৃসিংহ পূজা করিতেছিলেন। গৌর সিংহ তাঁহার দ্বারে সবলে আঘাত করিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "তুই এখনও নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছিস! সে বুড়ো অদ্বৈত আমাকে ফেলিয়া কোথায় গেল? তোদের জন্য আমি গোষ্ঠীর সহিত অবতীর্ণ হইলাম, এখনও তাহা বুঝিতে পারিলি না?" কথিত আছে পারিষদবৃন্দের ভবভয় দূর করিবার জন্য এই স্থলে তিনি আপনাকে স্বয়ং ভগবানরূপে নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন। ভগবদ্ভাবাবিষ্ট হইয়া মানবীয় আত্মবুদ্ধি একবারে ভুলিয়া যান। কিন্তু তিনি অন্যত্র এ ভাবের প্রতিবাদ করিয়া আপনাকে দাসরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ বলিলে বিষ্ণু স্মরণপূর্ব্বক কানে হাত দিতেন। এখানে অভেদ ভাবের বিশ্বাসে একত্ব অনুভব করিয়া থাকিবেন এইরূপ সম্ভাবনা। যাহা হউক, গৌরের সেই মহা মত্ততা দেখিয়া শ্রীবাস কাঁপিতে লাগিলেন, বাড়ীর পরিবারেরা ভয়ে তটস্থ হইল, সকলে ঈশ্বর জ্ঞানে তাঁহার চরণ ধরিয়া স্তুতি নতি করিল। তদনন্তর গৌরাঙ্গ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,

" ও হে শ্রীবাস! তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে এ ভয় কি এখনও তোমার আছে? যদি ধরে, তবে আমি অগ্রগামী হইব, রাজদ্বারে আমি প্রথমে যাইব, নবাব কাজি সকলকে হরিভক্তিতে কাঁদাইয়া আসিব। নামসঙ্কীর্ত্তনে তাহাদিগকে মাতাইব। নবাবের পশু পক্ষী হাতী ঘোড়াকে পর্য্যন্ত ভক্তিরসে মত্ত করিব।" কি অদ্ভুত সাহসের কথা! দৈব বল যাহার অন্তরে অবতীর্ণ হয় সে আর কোন মানুষকে ভয় করিয়া চলে না। বিশ্বাধিপতি পরম দেবতার অনুচরগণ সামান্য কপট বিনয়, লৌকিক দীনতা দেখাইয়া স্বীয় প্রভুর অজেয় শক্তিকে কলঙ্কিত করেন না। মহাভাব এবং মহাযোগের অবস্থায় তাঁহারা স্বতন্ত্র দাস হইয়াও প্রভুর সহিত অভেদ হইয়া যান। "আমি এবং আমার পিতা এক" ইহা সেই অবস্থার কথা, অটল বিশ্বাসের লক্ষণ। এই জন্য স্থূলদর্শী মানবেরা তাঁহাদিগকে অনেক সময় অহঙ্কারী গর্ব্বিত বলে, কিন্তু তাঁহারা বিনয়ী এবং সত্যবাদী হইয়া বজ্রনির্ঘোষে প্রভুর আজ্ঞা প্রচার করেন। ভয় তাঁহাদের নিকট ভয় পাইয়া পলায়ন করে।

ভক্তরাজ বিশ্বম্ভরের অসাধারণ ভক্তি ছিল কেবল তাহা নহে, অপর হৃদয়ে সেই ভক্তি সংক্রামিত করিবারও তাঁহার শক্তি ছিল। তাহার বলে কত শত অভক্তকে তিনি ভক্ত করিয়া গিয়াছেন। রাজশাসনের বিভীষিকা দূর করিবার জন্য তিনি যেমন মহা বিক্রমের সহিত বলিলেন, আমি নবাব কাজি এবং তাহাদের হাতী ঘোড়াকে পর্য্যন্ত হরিনামে কাঁদাইব, তেমনি কথিত আছে, ইহার প্রমাণ স্বরূপ শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী চতুর্থ বর্ষীয়া নারায়ণী নাম্নী বালিকাকে আজ্ঞা করিলেন, "তুমি কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদ।" নারায়ণী তৎক্ষণাৎ হা কৃষ্ণ ডাক ছাড়িয়া ভূতলে পড়িল, মূর্চ্ছিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। "চৈতন্য ভাগবত" রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবন দাস এই নারায়ণীর পুত্র।

বৎসরাবধি এইরূপে কীর্ত্তন হইতে লাগিল। গৌরাঙ্গ প্রেমে মাতিয়া কখন ক্রমাগত হাসিতেন, কখন কাঁদিতেন, কখন বা মূর্চ্ছিত হইয়া শ্বাসবন্ধ করিয়া থাকিতেন। তাঁহার সহায়তা পাইয়া কৃষ্ণভক্তগণ সাহসী হইলেন, বিদ্বেষীদিগকে আর ভয় করিতেন না। ভক্তগণ পরিবার স্ত্রী পুত্রের মায়া মমতা কাটাইয়া গৌরের সঙ্গেই দিবানিশি থাকেন। ধরাতলে এমন পবিত্র সঙ্গ পাইয়া কেই বা তাহা ছাড়িয়া থাকিতে পারে? ভগবদ্ভক্তি ভ্রাতৃপ্রেমময় প্রস্রবণ, হরিভক্তি আছে অথচ ভ্রাতৃভাব নাই সে মিথ্যা কল্পনা। গৌরের ভক্তদলের মধ্যে এই দুইটী এক হইয়া গিয়াছিল।

# ভক্তসম্মিলন।

গৌরসুন্দর এক দিন বন্ধুবর্গকে বলিলেন, "দেখ ভাই, কল্য রাত্রিতে আমি বড় এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি। যেন এক অবধূতবেশধারী সৌম্য মূর্ত্তি বিচিত্র পুরুষ আসিয়া আমাকে অন্বেষণ করিতেছেন। তিনি আমাকে হাস্য মুখে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিলেন।" স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে বলিতে তাঁহার ভাবাবেশ হইল, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এবং মদ আন, মদ আন বলিয়া হুঙ্কার শব্দ করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস বলিলেন গোসাঞী! যে মদিরা তুমি চাহিতেছ তাহাত তোমারই নিকট আছে। তুমি যাহাকে তাহা বিলাও সেই কেবল তাহা পায়। ক্ষণকাল পরে প্রেমোন্মত্ত গৌরচন্দ্র আরক্ত নয়ন উন্মীলন করিয়া হাস্যমুখে পদদ্বয় দোলাইতে লাগিলেন। তাঁহার বিকশিত মুখারবিন্দ যেন একখানি আনন্দ এবং ভাবরসের ছবি! ইহার কয়েক দিন পরে নিত্যানন্দ ঠাকুর নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে তিনি নন্দন আচার্য্যের গৃহে আসিয়া সমাগত হন, পরে ভক্তদলে মিশিয়া শ্রীবাসভবনে অবস্থিতি করেন। ইনিও এক দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ বিশেষ, সংক্ষেপে ইঁহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

বীরভূম অঞ্চলে সাঁইথিয়ার নিকটবর্ত্তী একচাকা গ্রামে হাড় ওঝার ঔরসে পদ্মাবতীর গর্ভে চৈতন্যের জন্মদিনের কিছু পূর্ব্বে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামে মৌড়েশ্বর বলিয়া এক দেবতা ছিল। হাড় ওঝা এবং পদ্মাবতী উভয়েই নির্দ্দোষচরিত্র দয়ালুস্বভাব এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। একমাত্র পুত্র নিত্যানন্দ, তাহার প্রতি উভয়ের প্রগাঢ় স্নেহ বাৎসল্য, তাহাকে এক দণ্ড কোথাও ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। পিতা যখন যেখানে যাইতেন পুত্র তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিত। এক দিন হঠাৎ এক সন্ন্যাসী অতিথি হইয়া বলিল, "এই ছেলেটি ভিক্ষা দিতে হইবে, আমি ইহাকে সঙ্গে রাখিব। কিছু দিনের জন্য আমাকে দাও, আমি তোমার ছেলেকে সর্ব্বদা যত্নে রাখিব এবং তীর্থ ভ্রমণ করাইব।" অতিথির কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মুখ শুকাইয়া গেল, অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; তথাপি তাঁহার প্রার্থনা তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। স্ত্রীকে সে কথা বলিলেন, তিনিও আর আপত্তি করিতে সাহসী হইলেন না। প্রাণাধিক সন্তানকে

ধর্ম্মের অনুরোধে বিদায় দিতে হইল। বিদায় দিয়া বাতাহত কদলীতরুবৎ ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া দুই জনে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রোদনে কাষ্ঠ পাষাণ পর্য্যন্ত ভেদ হইয়া গেল। আশ্চর্য্য এই যে, এমন স্নেহের পাত্রকে ধর্ম্মের জন্য ছাড়িতে হইল। ব্রাহ্মণ তিন মাস পর্য্যন্ত অন্ন জল ত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বামী স্ত্রী পুত্রশোকে পাগলের মত হইয়া কোন রূপে বাঁচিয়া রহিলেন। বালক নিত্যানন্দ সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শেষ মথুরাধামে কিছু দিন অবস্থান করেন। মাধব পুরী নামক ভক্ত ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল। মথুরায় থাকাকালীন লোকমুখে নবদ্বীপে চৈতন্যের ভক্তিলীলার কথা তিনি শুনিতে পান, শুনিয়া একেবারে এখানে উপস্থিত হইলেন। ভক্তদিগের পরস্পরের মধ্যে আধ্যাত্মিক নিগূঢ় যোগ অবস্থিতি করে। দূরে থাকিয়াও তাঁহারা আপনার জনের সংবাদ পান।

অবধূত নিতাই নন্দন আচার্য্যের ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া সবান্ধবে চৈতন্যচন্দ্র তাঁহাকে আনিতে গেলেন। নিতাইয়ের তেজঃপুঞ্জ দেহে, এবং ভক্তিরসরঞ্জিত মুখমণ্ডলে তপস্যার পুণ্যাগ্নি দীপ্তি পাইতেছিল। তিনি ব্রাহ্মণের ঘর যেন আলো করিয়া বসিয়া আছেন, ইত্যবসরে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত গৌর তাঁহাকে গিয়া প্রণিপাত ও আলিঙ্গন দান করিলেন। গৌরকে দেখিয়া নিত্যানন্দ ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে ধ্যানমগ্ন চিত্তে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। বাহ্যেন্দ্রিয়যোগে যেন তাঁহার রূপ পান করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দকে নিস্তব্ধ দেখিয়া গৌর ইঙ্গিতে শ্রীবাসকে ভাগবতের একটী শ্লোক পড়িতে বলিলেন। শ্লোক শুনিবা মাত্র অবধূত প্রেমে মাতিয়া উঠিলেন, ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গৌর শ্রীবাসকে বলিলেন, "আরো পড়! আরো পড়!" ক্রমেই মত্ততা বাড়িতে লাগিল। সিংহনাদে হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া মত্তমাতঙ্গ নিতাই কখন ঊর্দ্ধে লম্ফ প্রদান করেন, কখন বা ভূতলে আছড়াইয়া পড়েন; আবার বিশ্বম্ভরের পানে চাহিয়া ঘন ঘন শ্বাস ছাড়েন এবং যোড় পায়ে লম্ফ দিয়া নাচিয়া নাচিয়া হাতে তালি দেন। পরে গলদশ্রু লোচনে তিনি ধূলায় লুটাইতে লাগিলেন। ভাব গতি দেখিয়া বৈষ্ণবগণের মনে ভয় হইল। তখন ভক্তদল শুদ্ধ গৌরচন্দ্র কাঁদিতে লাগিলেন। দুইটী বেগবতী স্রোতঃস্বতী কোন স্থানে মিলিত হইলে যেরূপ তরঙ্গ এবং লহরী উঠে, উভয়ের প্রতিঘাতে চারিদিক্ বিকম্পিত হয়, এবং

পরে দুই স্রোতঃ মিলিত হইয়া খরতর বেগে যেমন সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, গৌর নিত্যানন্দের সঙ্গম তদ্রূপ হইয়াছিল। চারিদিকে ভক্তবৃন্দ, মধ্যে গৌর নিতাই সোণার প্রতিমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এক নিমেষের মধ্যে সকলের সঙ্গে সকলের পরিচয় হইল, যেন জলে জল মিশিয়া গেল; যূথভ্রষ্ট হরিণ যেন স্বদলের মধ্যে প্রবেশ করিল। একা চৈতন্যের মত্ততায় নবদ্বীপ কাঁপিতেছিল, নিত্যানন্দের সমাগমে নগর টল মল করিতে লাগিল। নন্দন আচার্য্যের ঘরে যেরূপ ভয়ঙ্কর নৃত্য গীত হয় তাহা আর বলিবার নহে। দুটি প্রকাণ্ড মদস্রাবী প্রমত্ত মাতঙ্গ যেন মেদিনী দলন করিতে লাগিল। নবদ্বীপের লোকসকল নিত্য নূতন ব্যাপার দেখিয়া তখন কি বলিবে তাহা আর ঠিক করিতে পারে না। দেখিয়া শুনিয়া তাহাদের মনে ভয় বিস্ময়, তৎসঙ্গে অজ্ঞাতসারে ভক্তি সঞ্চারিত হইত; তথাপি অভ্যাস বশতঃ কেহ নিন্দা করিতেও ছাড়িত না। কিন্তু এই দুই মদমত্ত বীরকে দেখিয়া অনেক বড় বড় পণ্ডিতের হৃদয় কাঁপিয়াছিল। অনন্তর পরস্পরের মধ্যে আলাপ সম্ভাষণ আহ্লাদ আমোদ পরিসমাপ্ত হইলে সুগভীর নিনাদে হরিধ্বনি করিতে করিতে নিত্যানন্দকে লইয়া সকলে শ্রীবাসভবনে প্রবেশ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রেমভরে পথে টলিতে টলিতে চলিলেন, সে শোভা দেখিলে মন মাতিয়া উঠে। শ্রীবাসগৃহে অপর বাহিরের লোক কেহ যাইতে পারিল না। ভক্তগণ সঙ্গে নিতাইয়ের গলা ধরিয়া গৌরাঙ্গদেব মহাকীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সে দিন সঙ্কীর্ত্তনের ধূমে আকাশ মেদিনী প্রকম্পিত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গের অদ্ভুত কীর্ত্তন, অদ্ভুত নৃত্য। নিতাই গৌর উভয়ে পাছড়া পাছড়ি, পা ধরা ধরি আরম্ভ করিলেন। বলে কেহ হীন নহেন। এইরূপ ভক্তিতে পাষণ্ড দলন হয়। প্রেমোন্মত্ত ভক্তবৃন্দের ভক্তির বিলাস এক অদ্ভুত দৃশ্য, মদ্যপের ন্যায় অথবা পাগলের ন্যায় তাঁহাদের ব্যবহার। হুড়োমুড়ি, কোণাকোণি; কেহ কাহার পায়ে ধরে, কেহ গলা ধরিয়া কাঁদে, কেহ হাসে, প্রেমেতে যেন একেবারে সব পাগল! ভাবাবেশে নিতাই গৌর উভয়েই অজ্ঞান এবং উন্মত্ত হইলেন। মত্ততার বেগে অবধূতের কৌপীন বহির্ব্বাস, দণ্ড কমণ্ডলু কোথায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেল! কোথায় কাহার অঙ্গের বসন পড়িল তাহার আর ঠিক রহিল না। সে দাপাদাপি লম্ফ ঝম্প, মাতামাতি দেখিলে মনে ভয় উপস্থিত হয়। এক জন জীবন্ত মনুষ্য নবদ্বীপে আছেন এবং আর এক জন তাঁহার সঙ্গে আসিয়া জুটিলেন, ইহা সকলে বিলক্ষণ টের

পাইল। চৈতন্য মদ আন, মদ আন বলিয়া এক একবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভাবে মাতিয়া ঘটি ঘটি জলই খাইয়া ফেলিলেন। সে দিন তিনি অদ্বৈতের কথা বার বার বলিয়াছিলেন। বলিলেন, "এমন সময় নাড়া হরিদাসকে লইয়া কোথায় রহিল ? এখন ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচারিত হইবে, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে গিয়া বসিয়া রহিলেন ?" বাস্তবিক এ সময় অদ্বৈ-তের এখানে থাকাটা উচিত ছিল। এমন শুভ যোগের সময় কি বিচ্ছিন্ন থাকা শোভা পায় ? কতক্ষণে সুস্থির হইয়া বিশ্বম্ভর গৃহে গমন করিলেন, নিতাইকে শ্রীবাসের ঘরে রাখিয়া গেলেন।

পর দিনে পুনরায় ব্যাসপূজা উৎসব উপলক্ষে এই স্থানে সকলে সঙ্কীর্ত্ত-নাদি করেন। এই ব্যাসপূজার উৎসব তৎকালে একটী পর্ব্ব ছিল। বৈষ্ণব ভক্তেরা পূর্ব্বগত ভক্তদিগের প্রতি ইহা দ্বারা শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। এই উপলক্ষে শ্রীবাস ভবনে সমস্ত দিন নৃত্য কীর্ত্তন পূজা ভোগ নৈবিদ্য পান ভোজন হইয়াছিল। গৌর স্বহস্তে ভক্তগণকে প্রসাদ নৈবিদ্য বিতরণ করেন। এমন আনন্দের সময় অদ্বৈতকে না দেখিতে পাইয়া শচীনন্দন শেষ রামাই পণ্ডিতকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সপরিবারে বৃদ্ধকে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। নিত্যানন্দের আগমন বার্ত্তা কহিতে বলিলেন।

অদ্বৈত আচার্য্য মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট ভক্তি শিক্ষা করেন। দেশে ভক্তির অভাব দেখিয়া তিনি নিয়ত দুঃখিত থাকিতেন। তিনিই চৈতন্যের অগ্রে এ দেশে ভক্তির পথ সকলকে দেখান। গৌর তাঁহার আশা পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আচার্য্য গোসাঞী শান্তিপুরে বসিয়া কয়েক দিন অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইনিও এক জন পরম ভক্ত মহৎ মনুষ্য। রামাই পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "গোসাঞী আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন, সপরিবারে শীঘ্র তথায় চলুন, বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার হইতেছে, নিত্যানন্দ আসিয়াছেন, এমন সময় আপনার এখানে থাকা ভাল দেখায় না।" বৃদ্ধ ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন, "কে তোমার গোসাঞী ? শাস্ত্রে এমন কিছু নাই যে নবদ্বীপে অবতার হইবে।" এইরূপে ক্ষণকাল আমোদ করিয়া পরে যখন রামাই পণ্ডিতের মুখে বিস্তারিত বিবরণ শুনিলেন তখন আর না কাঁদিয়া তিনি থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার পত্নী সীতাদেবী এবং আর সকলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, ভাবাবেশে অদ্বৈতের মূর্চ্ছা হইল।

তদনন্তর সপরিবারে অদ্বৈত গোসাঞী নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্যচরণে প্রণত হইলেন, এবং বহু বিনয় সহকারে স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমনে শ্রীবাসের ভবনে আবার এক নূতন উৎসব হইল। ভক্তমণ্ডলীর মাঝে মহা ধূম পড়িয়া গেল; কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ নাচে, কেহ কাঁদে, কেহ গড়াগড়ি দেয়; ঠিক যেন বাল্যখেলা। যে কয়েক জন মহাত্মা একত্র সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকেই এক এক জন পরম ধার্ম্মিক, তাঁহাদিগকে দেখিলেও পুণ্য হয়। এক্ষণে তিনটি প্রবল ভক্তির স্রোত একত্রিত হইল, যেন যমুনা এবং সরস্বতী গঙ্গাস্রোতের সঙ্গে মিশিয়া গেল। নিত্যানন্দের সঙ্গে অদ্বৈতের আলাপ হইল। তাহার পর চৈতন্য অদ্বৈতকে বলিলেন, তোমাকে কীর্ত্তনে নাচিতে হইবে। বৃদ্ধ নৃত্যেতে বড় পটু ছিলেন। নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া খুব নাচিতে লাগিলেন। যেমন কীর্ত্তনানন্দ, তেমনি নৃত্য। সঙ্কীর্ত্তন ভঙ্গ হইলে চৈতন্য বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, আচণ্ডালে আমি ভক্তি বিলাইব, হরিনাম শুনাইব।" অদ্বৈত ইহা শুনিয়া মহা হরষিত হইলেন। ভক্তসমাজ ক্রমেই এক এক করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অদ্বৈত এবং নিতাইকে পাইয়া মহাপ্রভুর মত্ততার আর অবধি রহিল না। সঙ্কীর্ত্তনের উৎসাহ চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। এই আনন্দের মধ্যে "পুণ্ডরীক বাপ! তুমি কোথায় রহিলে"—এই বলিয়া তিনি বার বার কাঁদিতে লাগিলেন। অন্য ভক্তগণ তাঁহাকে ভাল চিনিতেন না। তাঁহারা সকলে এক দিন বলিলেন, ঠাকুর, তিনি কে? গৌর তাঁহার পরিচয় দিয়া পুনর্ব্বার প্রেমনিধি বাপ বলিয়া কাঁদিলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এক জন চট্টগ্রামবাসী পণ্ডিত, পূর্ব্বে নবদ্বীপেই থাকিতেন, মধ্যে কিছু দিনের জন্য দেশে গিয়া অবস্থিতি করেন। মুকুন্দের সঙ্গে তাঁহার বড় বন্ধুতা ছিল, এক দেশে দুই জনের বাস। বিদ্যানিধি এই সময় নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। গদাধর মুকুন্দের এক জন পরম বন্ধু। মুকুন্দ তাঁহাকে বলিলেন, একজন সাধু আসিয়াছেন দেখিবে চল। গদাধর মুকুন্দের সমভিব্যাহারে বিদ্যানিধিকে দেখিতে গেলেন। গিয়া দেখেন, একজন ঘোর বিষয়ী বিলাসপরায়ণ অতি সৌখীন লোক, হিঙ্গুলরঞ্জিত পিত্তলের পায়াযুক্ত দিব্য চন্দ্রাতপআচ্ছাদিত পর্য্যঙ্কে বসিয়া পান তামাক খাইতেছেন। তাঁহার পরিধান সূক্ষ্ম বসন, নাসিকায় তিলক, ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, কেশজাল আমলকি ইত্যাদি গন্ধ দ্রব্যে

সংস্কৃত, সম্মুখে রূপার পানের বাটা তাহাতে পাকা পান, পাকা গুয়া উভয় পার্শ্বে ছোট বড় ঝারি, বিবিধ বিলাসসামগ্রী, ময়ূরপুচ্ছের পাখাদ্বারা দুই জন লোক বাতাস করিতেছে, বালিশ বিছানা অতি পরিষ্কৃত, সর্ব্বতোভাবে একজন বাবু হইয়া তিনি বসিয়া আছেন। গদাধর বালক কাল হইতে বিরক্ত বৈরাগী, এ সকল দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত হইলেন; ভাবিলেন, ভাল সাধু দেখিতে আসিয়াছি বটে! এ ব্যক্তি ত বিষয়ীর শিরোমণি! মুকুন্দ গদাধরের মনোভাব আভাসে বুঝিতে পারিয়া মধুর স্বরে একটি ভক্তিরসাত্মক শ্লোক পাঠ করিলেন। যাই তিনি শ্লোক পড়িতে আরম্ভ করিলেন, অমনি পুণ্ডরীকের চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল। ক্রমে তিনি একেবারে অস্থির এবং উন্মত্ত হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পদাঘাতে বিলাস দ্রব্য সামগ্রী অঙ্গের বসন কোথায় গিয়া পড়িল, সুখসেবিত সেই মার্জ্জিত দেহ এবং সুন্দর কেশপাশ মলিন এবং হতশ্রী হইয়া গেল। তাহার উপর অনুতাপের ক্রন্দন! "কোথায় আমার কৃষ্ণ প্রাণধন! হায়! আমার জন্ম বৃথা গেল।" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। ধূলি ধূষরিত অঙ্গে মূর্চ্ছিতাবস্থায় মহানন্দে শেষ বিভোর হইয়া বসিয়া রহিলেন। তখন গদাধর বুঝিলেন যে এ ব্যক্তি বাহিরে বিষয়ী ভিতরে ভক্ত। না জানিয়া অশ্রদ্ধা এবং উপেক্ষা করিয়াছেন, সে জন্য তিনি মনে মনে বড় ব্যথিত হইতে লাগিলেন। গদাধর এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শেষ বিদ্যানিধির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সকল অপরাধ ভঞ্জন করিলেন। দুই প্রহরের পর বিদ্যানিধির চেতনা লাভ হইল। মুকুন্দ গদাধরের পরিচয় দিয়া বলিলেন, ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র, অতি সুশীল বিষ্ণুভক্ত বৈরাগী, ইনি আপনার নিকট দীক্ষিত হইবেন। এ কথা শুনিয়া পুণ্ডরীক তাঁহাকে কোলে করিয়া ভাবে গদগদ হইলেন। গদাধরও বিগলিত হৃদয়ে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।

অনন্তর মুকুন্দ ও গদাধরের সঙ্গে বিদ্যানিধি মহাপ্রভুর আবাসে চলিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গৌরের বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস হইল। তিনি বিদ্যানিধিকে কোলে লইয়া তাঁহার প্রশংসা গান করত এত আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন যে তাহা দেখিয়া পুণ্ডরীক যে একজন বড়লোক তাহা সকলকে বুঝিতে হইল। বিলাস সুখ সংসারমায়ার মধ্যে থাকিয়াও বিদ্যানিধি এমন প্রেমিক এবং ভক্ত ছিলেন! গদাধর ইহাঁকে গুরু বলিয়া স্বীকার

করিয়াছেন এ সংবাদে চৈতন্যের মহা সন্তোষ জন্মিল। ভক্তে ভক্তে মিলনের সময় তখন একটা মহা ব্যাপার হইত। সকলেই যেন এক একটি আহ্লাদের পুতুল। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি এরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা প্রকাশ করিতেন যে তাহা দেখিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হইত। ভাবে প্রেমে একেবারে যেন মাখামাখি ছিল। বিশ্বম্ভরের দুর্জ্জয় প্রেম যাহাকে একবার আক্রমণ করিত তাহার অস্থি পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়া যাইত। ভক্তদিগের মধ্যে আহ্লাদ আমোদের অল্পতা ছিল না। কীর্ত্তনে মাতিয়া কেহ কাহারো পা ধরিয়া টানিতেন, কেহ কাহারো স্কন্ধে আরোহণ করিতেন, কেহ বা কাহারো কোলে মাথা দিয়া শুইতেন, এক জনের মুখে আর এক জন খাদ্য তুলিয়া দিতেন, এবম্প্রকার অনেক বিধ ভক্তির আমোদ ছিল। সে বড় এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মানাপমান গৌরব অহঙ্কার কিছু নাই, যেন এক পাগলের মেলা। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভাই ভগিনীরাও পরস্পরকে এত ভাল বাসিতে পারে না। সভ্যতার কুটিল গাম্ভীর্য্য, হৃদয়হীন ভদ্রতার শীতল ব্যবহার তখন ছিল না। উদার সরলচিত্ত বৈরাগীদল দিবা নিশি কেবল প্রেম ভক্তিতে সাঁতার খেলিতেন।

গৌরচন্দ্র ভক্তবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া নিরবধি এইরূপে হরিনামরসে নিমগ্ন রহিলেন। নিতাই শ্রীবাসের ঘরে থাকিতেন। তাঁহার গৃহিণী মালিনী দেবী মাতার ন্যায় এই শিশুতুল্য অবধূতকে অন্ন খাওয়াইয়া দিতেন। এক দিন গৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে বলিলেন, "পণ্ডিত, এই সন্ন্যাসীকে কেন তুমি ঘরে রাখিয়াছ? ইহার জাতি কুল জান না, উদারচরিত্র তুমি, তাই ইহাকে রাখিয়াছ। যদি জাতি কুল বাঁচাইতে চাও, তবে শীঘ্র এই অবধূতকে বিদায় কর।" শ্রীবাস হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, কেন আর আমাকে পরীক্ষা করেন? যে তোমার লোক সে যদি আমার জাতি কুল নাশ করে, তাহাতে কি আমার ভাবের অন্যথা হইবে? নিত্যানন্দ যদি মদিরা পান এবং যবনীগমন দোষে দূষিত হন তথাপি তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি কমিবে না।" ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ আহ্লাদে হুঙ্কার শব্দ করত শ্রীবাসের বুকে চড়িয়া বসিলেন, এবং বলিলেন, "কি বলিলি! তোর এত বিশ্বাস? তোর বাড়ীর বিড়াল কুকুর পর্য্যন্ত ভক্ত হইয়া যাউক এই আমার আশীর্ব্বাদ!" গৌরের জাত্যভিমানও ছিল না, আবার ম্লেচ্ছের ন্যায় ভদ্রাভদ্র সকল জাতির সঙ্গে আহার ব্যবহার করা যে একটা অতি মহৎ কার্য্য ইহা

দেখাইয়া গৌরব করাও তাঁহার ছিল না, এ সম্বন্ধে তিনি বেশ স্বাভাবিক সাত্ত্বিকতা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাঁহার হিন্দুর ন্যায় আচার ব্যবহার শুদ্ধ ছিল। ভক্তিস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যাইতেন, জাতি কুলের অভিমান স্বভাবতঃই সে স্রোতের মুখে দাঁড়াইতে পারিত না।

নিত্যানন্দ নন্দদুলালের মত নবদ্বীপের ঘরে ঘরে বেড়ান, গঙ্গায় সাঁতার দেন, কুমীর ধরিতে যান, ছেলেদের সঙ্গে ছেলে হইয়া খেলা করেন, শচীর নিকট খাবাব চাহিয়া খান, শুকদেব গোস্বামীর ন্যায় বাল্যভাবে তিনি এই রূপে বিবিধ লীলা কবিতে লাগিলেন। চৈতন্য এক দিন তাঁহাকে নিজালয়ে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন, "দেখো ভাই! যেন চঞ্চলতা প্রকাশ করিও না।" নিতাই কানে হাত দিয়া বলিলেন, হাঁ এমন কথা! বিষ্ণু, বিষ্ণু, পাগল যারা তারাই চপলতা প্রকাশ করে। তুমি কি আপনার মত সকলকেই মনে কর না কি? হাসিতে হাসিতে পরে শচীর হস্তে দুই জনে একত্র ভোজন করিলেন।

শচী মাতা হরিভক্তগণের নিত্য নূতন কীর্ত্তি দেখিয়া নিজেও ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভাবুক বৈষ্ণবগণের মুখে অনেক অদ্ভুত কথা শ্রুতিগোচর হইত। কেহ বলিতেন, শ্রীবাসের অঙ্গনে আমের আঁটি পুঁতিয়া রাতারাতি সদ্য সদ্য তাহা হইতে ফল উৎপন্ন করা হইয়াছে। কেহ বলিতেন, আমি মহাপ্রভুকে ষড়্ভুজ হইতে দেখিয়াছি কেহ বা অন্য প্রকার অলৌকিক ভাব বর্ণন করিতেন। যখন যাহার মনে যে ভাব প্রবল হইয়া উঠিত, তিনি তখন বাহিরেও তাহা অবলোকন করিতেন। কিন্তু স্বভাবের বিপরীতে কোন ঘটনা না ঘটিলেও তৎকালে অনেক অলৌকিক দৈবক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। পাষাণ সমান হৃদয় ভক্তিরসে গলিয়া যায় ইহা অপেক্ষা অলৌকিক ঘটনা আর কি হইতে পারে? চৈতন্যের যে ভক্তির আবেশ, প্রেমের উচ্ছ্বাস তাহা তাহার ষড়্ভুজ মূর্ত্তি অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই।

---

# নিশীথকালে সঙ্কীর্ত্তন।

এক দিন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "রাত্রি কেন বৃথা গত হয়, আজি হইতে এস আমরা নিশাকালে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিব, সকলে শুনিয়া উদ্ধার হইবে; তোমাদের জীবনও এই জন্যই, অতএব আয়োজন কর।" বৈষ্ণবগণ প্রস্তাব শুনিয়া উল্লসিত হইলেন। এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু প্রকাশ্যরূপে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কোন দিন শ্রীবাসের গৃহে, কোন দিন বা চন্দ্রশেখরের ভবনে কীর্ত্তন হইতে লাগিল। গৌর নিতাই অদ্বৈত ব্যতীত বিদ্যানিধি, হরিদাস, মুরারি, গদাধর, হিরণ্য, গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন, জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খাঁ, নারায়ণ, কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গরুড়াই, গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান্, শ্রীধর, সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর, ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম, সঞ্জয়াদি অনেক গুলি ভক্ত সঙ্কীর্ত্তনে মাতিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় জীবন্ত মনুষ্য। কাহারো নৃত্য গীতে বা সমাগমে অন্যের উৎসাহ অগ্নি নির্ব্বাণ হইত না, বরং এক একটি অগ্নিশিখা একত্র করিলে যেরূপ প্রবল উজ্জ্বল অগ্নিশিখা সমুৎপন্ন হয় ইঁহাদের মিলনে তাহাই হইত। মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ করতালের সহিত এই সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। তিন চারি দলে বিভক্ত হইয়া ভক্তগণ গান করিতেন। কখন কখন গৌরাঙ্গের নিজভবনেও এইরূপ কীর্ত্তন হইতে লাগিল। "মহাপ্রভু আমের আঁটি পুঁতিয়া তৎক্ষণাৎ এক গাছ উৎপন্ন করিয়া তাহাতে ফল ধরাইয়াছেন। অত্যন্ত সুমিষ্ট সে আম, খোসা আঁটি কিছু নাই, খাইলে শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়" এইরূপ কথা গৌরভক্তগণ তখন বলিয়া বেড়াইতেন। ইহার অর্থ বোধ হয়, "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং। পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥" কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া চৈতন্য যে কত রঙ্গ করিতেন তাহা আর বলা যায় না। এক একটি বিভিন্ন ভাবেতে তাঁহার শরীরের অবস্থা ভিন্ন ভাব ধারণ করিত। তেজস্বী যুবা পুরুষ, দুম্ দাম্ করিয়া ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেন, বীরদর্পে মাটী কাঁপাইয়া দিতেন। কাহার সাধ্য সে অবস্থায় তাঁহাকে ধরিয়া রাখে? তাঁহার অঙ্গের এই আঘাত শচীমায়ের বুকে গিয়া যেন বজ্রসমান বাজিত। এইরূপে সমস্ত

রাত্রি প্রায় শ্রীবাসের গৃহে নৃত্য গীত হইতে লাগিল। প্রমত্ত ভক্তবৃন্দের মধ্যে মত্ত মাতঙ্গ গৌরমণি কখন নাচেন, কখন মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকেন; কাণের কাছে মহা শব্দে হরিবোল বলিলে তবে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইত। তাঁহার শরীর কখন শীতল, কখন উষ্ণ, কখন শীতে কম্পিত, কখন উত্তাপে ঘর্ম্মাক্ত। এক একবার গভীর রবে হুঙ্কার করিয়া লম্ফ দিতেন, পরক্ষণে আবার ধ্যানে মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিতেন; কখন মহা চীৎকার স্বরে গান ধরিতেন, কখন দন্তে তৃণ লইয়া দাস্যভাবে ভক্তগণের পদতলে পড়িতেন। যাহার পায়ে ধরিতেন, পরক্ষণে আবার তাহারই স্কন্ধে চড়িয়া বসিতেন। কখন চক্রাকারে নাচিতেন, অন্যের গলা ধরিয়া কাঁদিতেন, কখন খল্ খল্ করিয়া ক্রমাগত হাসিতেন। ভাবে বিভোর হইয়া কখন বালকের ন্যায় মুখে বাদ্য বাজান, কখন নিত্যানন্দের অঙ্গে হেলান দিয়া বসেন, কখন বা হামাগুড়ি দিয়া হাঁটেন। সেই প্রেমোন্মাদের অবস্থায় অরুণ নয়ন বিস্তার করিয়া যাঁহার পানে তিনি চাহিতেন তাহার মনে ত্রাস উপস্থিত হইত। ঘোর মদ্যপায়ীর ন্যায় উন্মত্ত ভাব। ভক্তগণ কখন কখন তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া নাচিতেন এবং গান করিতেন। ফলে ভাগবতোক্ত ভক্তির লক্ষণ যাহা কেবল লোকে কর্ণে শুনিয়াছিল, তৎসমুদায় লক্ষণ গৌরাঙ্গ নিজজীবনে দেখাইতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের সময় বাহিরের দরজা বন্ধ থাকিত। ভক্তদিগের আকাশভেদী হরিধ্বনি শ্রবণে চারিদিক্ হইতে নানা ভাবের লোক সকল দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া মহা গোলযোগ করিত। ভিতরে প্রমত্ত চিত্ত ভক্তগণ আপনাদের ভাবে মগ্ন হইয়া মনের সাধে সঙ্কীর্ত্তন করেন, বাহিরে পাষণ্ডগণ দ্বার খোলা না পাইয়া নিন্দা করিয়া বলে,—ইহারা লুকাইয়া মদ খায় এবং ব্যভিচার করে। তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিতে চায়, পায় না, মহা বিরক্ত হইয়া নানা কথা বলে। দ্বার বন্ধ থাকাতে দর্শকদিগের কৌতূহল এবং ক্রোধ বাড়িতে লাগিল। কেহ বলে, ভাই নিমাই পণ্ডিতটে এমন বুদ্ধিমান্ ছিল, কেবল সঙ্গদোষে মারা গেল। আহা! একে বাপ নাই, তাহাতে আবার বায়ুরোগ, পড়া শুনা ছাড়িয়া এখন ইহাদের দলে মিশিয়া গিয়াছে। কেহ বলে, "শ্রীবাস বামনই যত নষ্টের গোড়া। ইহাদের মুখ দেখিলে পাপ হয়। নিত্যকর্ম্ম ছাড়িয়া যার তার সঙ্গে ইহারা একত্র ভোজন করে, মদ এবং পঞ্চ কন্যা

আনিয়া গোপনে দুষ্কর্ম্ম করে, কল্য সকলকে ধরিয়া ধরিয়া বাঁধিব। এ দেশে কীর্ত্তন কখন ছিল না, ইহা আনিয়া হতভাগ্যেরা দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষের আগুন জ্বালাইয়া দিল। ধান্য জন্মে না, টাকাকড়ি উপার্জ্জন হয় না, আবার কোথা হইতে একটা অবধূত আসিয়া জুটিয়াছে। নিরঞ্জন দেহের মধ্যে আছেন, ইহারা বাহিরে ডাকিয়া বেড়ায় কেন?" দলের ভিতর কেহ কেহ আবার ভাল মানুষও আছে। তাহারা বলে, "কাজ কি ভাই পরের নিন্দায়? চল আমরা ঘরে যাই, নিজ কর্ম্মদোষে আমরা দেখিতে পাইলাম না, ওঁদের কি দোষ?" অপর পাঁচ জন নিন্দক এক হইয়া আবার ইহাদিগকে মারিতে যাইত, এবং গালাগালি দিয়া বলিত, "ভারিত কীর্ত্তন! যেন শত শত লোকে দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিয়াছে! জপ তপ তত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মকাণ্ড লোপ হইল, ইহারা চাল কলা মুগ দধি একত্র মাখিয়া সকলে মিলে খায়। এত সব ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত থাকিতে এ ডাকাইত গুলাকে কেহ কি জব্দ করিতে পারিল না?" এইরূপে তাহারা সকলে উপহাস নিন্দা করিয়া যায়, ভাবাবিষ্ট ভক্তেরা এ সব কথা শুনিষাও শুনেন না। এক দিন এক ক্রোধী ব্রাহ্মণ নিমাইকে গঙ্গাস্নানের পথে পাইয়া পৈতা ছিঁড়িয়া শাপ দিয়া বলিয়াছিল, "তুমি আমাকে কীর্ত্তন শুনিবার জন্য ভিতরে যাইতে দাও নাই, তোমায় যেন কখন সংসারে থাকিতে আর না হয়!" এই শাপ চৈতন্যের পক্ষে বর হইল, তিনি হাস্য করিলেন। দেখিতে দেখিতে কোথা দিয়া রাত্রি দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। এক দিন নিশাবসানে কীর্ত্তন ভঙ্গ করিয়া চৈতন্যদেব শ্রীবাসের শালগ্রাম শিলা ঠাকুর বিগ্রহ মূর্ত্তি যাহা কিছু ছিল সবগুলি কোঁচড়ে লইয়া খাটের উপর বসিয়া বলিলেন, কি আছে আমাকে খাইতে দাও। চালভাজা মুড়ি খৈ নারিকেল কলা চিনি ক্ষীর ছানা ননী কতকগুল একবারে খাইয়া ফেলিলেন, ভক্তগণ এক এক জন এক একটি সামগ্রী আদর করিয়া দিতে লাগিলেন, নিতাই তাঁহার মাথায় ছাতা ধরিলেন। আহারান্তে কতক্ষণ পরে ভাবরসে চৈতন্য এমনই অজ্ঞান হইলেন, বোধ হইল যেন ধাতু নাই। ভক্তগণ কাঁদিয়া আকুল হইল, পরে আবার চেতনা লাভ করিষা তিনি সকলকে সুখী করেন। সঙ্কীর্ত্তনই ইহাঁদের সাধন, ভজন, সঙ্কীর্ত্তনই যোগ তপস্যা ধ্যান আরাধনা ছিল। ইহা দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃসৌহৃদ্যও বৃদ্ধি হইত।

# গৌরাঙ্গের দরবার।

এক দিন প্রাতে গৌর নিতাই দুই জনে শ্রীবাসের ভবনে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের ভাব বুঝিয়া আর আর ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, মহানন্দে সকলের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে দিন সাত প্রহর কাল ক্রমাগত আনন্দোৎসব হয়। ভক্তগণ চৈতন্যকে স্নান করাইয়া, পুষ্পমালা এবং চন্দনে সজ্জিত করিলেন; নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী সকল ভোজন করাইয়া বহু আদরে তাঁহার সেবা করিলেন। নিতাই তাঁহার মাথায় ছাতা ধরিয়া রহিলেন। সমস্ত দিন পান ভোজন, নৃত্য গীত, আহ্লাদ আমোদে গত হইল, পরে সন্ধ্যাকালে পুনরায় হরিনামরসে সকলে আবার মাতিয়া উঠিলেন। আনন্দ উৎসবের সময় পরমাত্মীয় বন্ধুদিগকে স্বভাবতঃই মনে পড়ে। থোড়বিক্রেতা সুদরিদ্র শ্রীধরকে দেখিবার জন্য সে দিন চৈতন্যের বড় অভিলাষ হইল। শ্রীধর এক জন গরিব ব্রাহ্মণ। থোড় কলাপাত খোলা তরকারী বিক্রয় করিয়া তিনি দিনপাত করিতেন, আর হরিনাম ও ভক্তিরসে মগ্ন থাকিতেন। পূর্ব্বে চৈতন্য তরকারী ক্রয় করিতে গিয়া শ্রীধরের সঙ্গে অনেক কৌতুক ও বিবাদ করিতেন। দরিদ্র বিপ্রের তরকারী কলাপাত তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। শ্রীধর শুদ্ধসত্ব লোক, এক কথা ভিন্ন দুই কথা বলিতেন না। খোলাবেচা শ্রীধর ইঁহার নাম। ব্যবসায়ে যাহা কিছু পাইতেন তাহা দ্বারা পবিত্রভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ইঁহাকে রাত্রিকালে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে দেখিয়া বিরোধিগণ বলিত, "এ ব্যাটা খোলাবেচা বামুন আবার করে কি! বুঝি ভাতে পেট ভরে না, তাই ক্ষুধার জ্বালায় রাত্রে চীৎকার করিয়া মরে। পরণে বস্ত্র নাই, পেটে অন্ন নাই, ইহাঁর আবার রঙ্গ দেখ!" দুঃখীর বন্ধু গৌরচন্দ্র শ্রীধরকে ডাকিয়া আনিলেন, এবং তাঁহাকে লইয়া উৎসবে মত্ত হইলেন। অনাথ পাপী সরলহৃদয় ব্যক্তিদিগকে পাইলে গৌরের বড় আহ্লাদ হইত। তিনি নিতান্ত অমায়িক উদার স্বভাব ছিলেন, যাকে তাকে আলিঙ্গন দিতেন, প্রসন্ন হইয়া যার তার সঙ্গে কথা কহিতেন, অজ্ঞান গরিব অপরিচিত ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট সমাদর লাভ করিয়া কৃতার্থ হইত। তাঁহার প্রেমরসসিক্ত কোমল অঙ্গস্পর্শে

অপ্রেমিক কঠোর হৃদয় ব্যক্তিরও মুখ দিয়া ভক্তিভাবপূর্ণ গভীর তত্ত্বকথা আপনাপনি বাহির হইয়া পড়িত। গৌরাঙ্গ জড়প্রায় মৃত মোহাসক্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয়েও প্রেমভক্তি সংক্রামিত করিতে পারিতেন। যাহার সঙ্গে তিনি কথা কহিতেন সে নবজীবন পাইত, এবং উৎসাহী হইয়া ভক্তিরসে উন্মত্ত হইত। তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহার কথা শুনিলে কেহ আর অলসের ন্যায় থাকিতে পারিত না। অগ্নির সহবাসে যেমন দেহ উত্তপ্ত হয়, তাঁহার সহবাসে তেমনি মন সহজে উত্তপ্ত হইয়া উঠিত। শ্রীধর ব্রাহ্মণকে ভক্তদলের মধ্যে আর বড় একটা কেহ চিনিতেন না, তাঁহার ভক্তি অনুরাগ নিষ্ঠা এবং সংস্বভাব দেখিয়া তাঁহারা একণে সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন।

এই সপ্ত প্রহরিয়া মহোৎসব গৌরাঙ্গের একটি প্রকাণ্ড দরবার বিশেষ। সে দিন তিনি এক এক করিয়া সকলকেই আশীর্ব্বাদ করেন এবং প্রত্যেকের নাম ধরিয়া আলাপ করেন। যখন হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, হরিদাস, তুমি আমার দেহ হইতেও বড়। তোমাকে দুষ্ট যবনেরা বাজারে বাজারে প্রহার করিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে আমার বুক বিদীর্ণ হয়। এত নির্যাতনেও তুমি তাহাদিগকে ভালবাসা দেখাইয়াছ, ধন্য তোমার জীবন!” হরিদাস মহাপ্রভুর শ্রীমুখবিনিঃসৃত সুধাময় বাক্য সকল শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং নানামতে তাঁহাকে স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। বলিলেন, “ঠাকুর, আমি যেন আপনার দাসানুদাস হইয়া ভক্তের পত্রাবশিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণে প্রাণ ধারণ করিতে পারি। অতি হীন যবন আমি, আমার প্রতি আপনার এত দয়া!” উচ্চ শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলীমধ্যে আদৃত হইয়াছেন বলিয়া যে হরিদাস সকলের ঘাড়ে চড়িয়া লাথি মারিয়া ফিরিবেন, সেরূপ নীচ প্রকৃতির লোক তিনি ছিলেন না। অদ্বৈত গোস্বামী পিতৃশ্রাদ্ধের উপহার শ্রাদ্ধপাত্র হরিদাসকে খাইতে দিতেন। শুদ্ধাচারী ব্রতনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাকে ইহা দিলে পিতৃপুরুষ নরকস্থ হয়, কিন্তু হরিদাস সে উচ্চ অধিকার পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণভক্তেরা তাঁহাকে যত উপরে তুলিতে চেষ্টা করিতেন, তিনি স্বীয় বিনয় গুণে ততই নীচে নামিতে ভাল বাসিতেন, সুতরাং উচ্চাসন তাঁহারই প্রাপ্য হইল। যবনের প্রতি গৌরাঙ্গের এরূপ প্রসন্নতা এবং অনুরাগ দেখিয়া ভক্তমণ্ডলীতে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। ভক্তি জাতিনির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্যের হৃদয়ে বিরাজ করে, তাহা স্বীকার করাতে সভাস্থ সকলের জাত্যভিমান দূর হইল। কিন্তু অপর ব্রাহ্ম-

গেরা এ কথা শুনিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রতি এবং চৈতন্যের উপর অত্যন্ত চটিয়া যায়।

মহাপ্রভু সে দিন সকলের সঙ্গে কথা কহিলেন, কেবল গায়ক মুকুন্দকে ডাকিলেন না। তন্নিমিত্ত শ্রীবাসাদি দুঃখিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি বলিলেন, মুকুন্দের ভক্তির উপর একান্ত আস্থা নাই, সে যেখানে যেমন সেখানে তেমন কথা বলে, ভক্তি অপেক্ষা অন্য কিছু বড় আছে যাহারা মনে করে তাহাদের অপরাধ হয়। এ কথা শুনিয়া মুকুন্দ বিষাদিত অন্তঃকরণে কাঁদিতে লাগিলেন। দেহত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গৌর এই দরবারে বসিয়া প্রত্যেক ভক্তের সহিত যে ভাবে কথা বার্ত্তা কহিয়াছিলেন, সে সমস্ত অদ্বৈতভাবপূর্ণ। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞান করিতেন, সুতরাং আদ্যোপান্ত সেই ভাবে ইহাঁর লীলা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। এ দিন অদ্বৈত প্রভৃতি ঐ ভাবে তাঁহাকে স্তব স্তুতি করেন, এবং গৌরাঙ্গ সেই ভাবে সকলকে বর দান করেন। অতঃপর শ্রীবাস মুকুন্দের দুঃখ দূর করিবার জন্য বিশ্বম্ভরের আদেশানুসারে তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কোটি জন্মের পর প্রভুর দর্শন পাইবে।" ইহা শুনিয়া মুকুন্দের আনন্দের আর সীমা রহিল না। দর্শন পাইবত! ইহাতেই কত আশা আনন্দ বৃদ্ধি হইল। আহ্লাদে তিনি নাচিতে লাগিলেন। তখন চৈতন্য সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমার কথায় তোমার এত বিশ্বাস? তোমার আশা পূর্ণ হউক! চিরদিনের জন্য তুমি আমার হইলে, আমার গায়ক হইয়া তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে চিরকাল বাস কর।" এইরূপে সকলের সহিত আলাপ সম্ভাষণ আহ্লাদ আমোদ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণ সে দিনকার উৎসব শেষ করেন।

পরস্পরের মধ্যে প্রাণের টান ক্রমশঃ এমনি বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, এক দিন কেহ কাহারো মুখ না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। সকলেরই উদার উন্মুক্ত হৃদয়, কোন প্রকার লুকোচুরি স্বার্থপরতা কপটভাব কাহারো ছিল না। আজ্ঞা, আপনি, এ প্রকার শ্রুতিমধুর রসহীন মিষ্ট লৌকিক ব্যবহার তাঁহারা জানিতেন না। হরিরসমদিরা পানে অন্তর বাহির একাকার হইয়া যাইত, সুতরাং ভয়মূলক সম্ভ্রম শ্রদ্ধা স্থান পাইত না, অথচ পরস্পরের প্রতি ভক্তি ভালবাসা যথেষ্ট ছিল। এক জন অন্যের কিঞ্চিৎ সেবা করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। গৌরত প্রেমের সমুদ্র। তাঁহার নয়নের দৃষ্টি, হস্তের স্পর্শ কিম্বা প্রহার, মুখের সুমধুর বচন এবং চর্ব্বিত তাম্বুল

প্রসাদ, তদ্ব্যতীত ভক্তি বৈরাগ্যত আছেই; ইহাতে সকলকে একবারে মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল। ভগবানের বিশেষ আবির্ভাবে চারিদিকে এক সময়ে যেন গোলাপের বাগান ফুটিয়া উঠিল। গৌরচন্দ্রোদয়ে যেখানে যে সব ভক্ত ছিল, চকোরের ন্যায় তাহারা আসিয়া জুটিল।

ভক্ত বৈষ্ণবদিগের এই বিশ্বাস ছিল, যে ভগবান্ বৈকুণ্ঠে নিত্যসিদ্ধ পুরুষদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া নানা রূপ পরিগ্রহ করত সদলে যুগে যুগে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। শাস্ত্রে কথিত আছে, কলিযুগে নামমাহাত্ম্য প্রচারিত হইবে, তাহারই জন্য সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া গৌরাঙ্গ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। চৈতন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, নিতাই বলরাম, অদ্বৈত মহাদেব, শ্রীবাস নারদ ঋষি, হরিদাস ব্রহ্মা, মুরারি গুপ্ত হনুমান ইত্যাদি। ইহারা এক এক জন এক একটী দেবতার অবতার হইয়া লীলার সাহায্য করিতে আসিয়াছেন। ইহাদের জন্ম মৃত্যু নাই, ভূভারহরণের জন্য ভগবান্ যখন যখন রাম কৃষ্ণ চৈতন্য ইত্যাদিরূপে অবতার হন, তখন ইহাঁরাও যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। বাস্তবিক মনুষ্যজীবনে ভগবানের লীলা অতীব মনোহর দৃশ্য। তাঁহার বিশেষ কৃপাবলে এক নবীন ভক্তবংশ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহারা হরিভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়া যুগধর্ম্মের জয়নিশান উড়ায়, বিধানের জয়ভেরী বাজায়, তদ্দ্বারা মুক্তির পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। ভক্তির ধর্ম্ম পালন ও প্রচারের জন্য যে ইহাদের জন্ম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভগবানের মঙ্গলময়ী পালনী ব্যবস্থাই ইহার মূল। তাঁহার ইচ্ছাতে যুগে যুগে এইরূপে কত শত সাধু জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ অবতারবাদের মূলে হিন্দুস্থানের চিরপ্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদ বর্ত্তমান আছে। এক ব্রহ্ম বহু হইয়া প্রকাশ পান। তাঁহাব গুণ, শক্তি, মহিমা সমস্তই অজর অমর নিত্যস্থায়ী, বস্তুতঃ তাহাতে ভেদ ব্যবধান নাই। একই ধর্ম্ম, একই সাধুতা যুগ যুগান্তরে লোক লোকান্তরে বিভিন্ন দেহে প্রকট রূপ ধারণ করে, আবার লীলা সাঙ্গ হইলে সেই শক্তি নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় নির্গুণ অপ্রকট ব্রহ্মেতে বিলীন হয়। পরমহংস রামকৃষ্ণ এই নিত্য এবং লীলা অর্থাৎ নির্গুণ এবং সগুণ অবস্থার সঙ্গে জল আর বরফের তুলনা দিতেন। জল অনন্ত নিত্য ব্রহ্ম, অবতার তাঁহার ঘনীভূত এক এক খণ্ড বরফ সদৃশ। মূল পদার্থ অখণ্ড জল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

কে কোথা হইতে আসিয়া নবদ্বীপধামে এই ভক্তসমাজ গঠন করিলেন

তাহা ভাবিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। একটী বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা যে ঈশ্বরেব অভিপ্রায় তাহা এ সকল যোগাযোগ শুভ সংঘটন এবং সম্মিলন দেখিলে বাস্তবিকই বিশ্বাস হয়। এক এক করিয়া নানা স্থান হইতে ভক্তগণ একত্রিত হইয়া অতি সুন্দর একটি দল গঠন করিলেন।

সপ্তপ্রহরিয়া উৎসবের পর হইতে নিত্যানন্দের প্রমত্ততা কিছু বৃদ্ধি হইল। তিনি কথন কথন উলঙ্গ হইয়া বিমনা হইতেন। এক দিন বিষ্ণু-প্রিয়ার সঙ্গে চৈতন্য গৃহে বসিয়া আছেন এমন সময় নিতাই বিবস্ত্র হইয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌর জননীর সন্তোষের জন্য মধ্যে মধ্যে স্ত্রীর কাছে গিয়া বসিয়া পানটান খাইতেন। বিবস্ত্র নিতাইকে অনেক সময় তিনি নিজে কাপড় পরাইয়া দিতেন, এবং শান্ত শিষ্ট সভ্য ভব্য হইয়া থাকিতে বলিতেন। কিন্তু অবধূতকে তিনি যথেষ্ট সম্মান করিতেন। এক দিন সকলকে বলিলেন, "তোমরা নিত্যানন্দের পাদোদক পান কর। ইহাঁকে ভক্তি না কবিলে আমাকে অপমান করা হয়, এবং ইহাঁকে যাহারা ভালবাসে ভক্তি করে, তাহারাই আমাকে প্রকৃতরূপে ভক্তি করে ভালবাসে।" নিত্যানন্দের এক খণ্ড কৌপীন লইয়া তাহা ছিন্ন করিয়া এক এক খণ্ড সকল ভক্তকে তিনি দিলেন, এবং বলিলেন ইহা মস্তকে বাঁধিয়া রাখ। আর সকলে গৃহী, কেবল নিতাই তখন একমাত্র উদাসীন যোগী ছিলেন; বৈরাগ্য উদ্দীপনের জন্য বোধ হয় তাঁহাব কৌপীন বিভাগ করিয়া মস্তকে ধারণ করা হইল। নিতাই শ্রীবাসের গৃহে থাকিতেন, তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন এবং তদীয় পত্নী মালিনী দেবীর স্তন্য পান করিতেন। অবধূতেব পাগলামি দেখিয়া গৌর এক দিন বলিলেন, "ভাই সাবধান! খাইতে বসিয়া ঘরময় ভাত ছড়াইও না; লোকে নিন্দা করিলে মনে কষ্ট পাই। নিতাই বলিলেন, তুমি আমাকে চঞ্চল দেখিলে শিক্ষা দিও। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে আনন্দে কটির বসন মাথায় বাঁধিয়া যোড় পায়ে নাচিতে লাগিলেন। হিতে বিপরীত হইল।

ভক্তদলের মধ্যে যাহার যে বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ এবং উচ্চ ভাব ছিল, গৌর তাহার প্রশংসা করিতেন, তজ্জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি মান্য করিতেন। সম্মুখে প্রশংসা করিলে কাহারো ক্ষতি হইবে কি না তাহা ভাবিবারও তখন সময় হয় নাই। মাতামাতি চলাচলির ধর্ম্ম, এ সব রাজনৈতিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা কাহাকেও নির্ব্বাক্ গম্ভীর করিয়া রাখিতে পারিত না। মন খুলিয়া

গেলে মাতালেরা যেরূপ পরস্পরের গুণগান করে, সেইরূপ ইঁহাদের অবস্থা ছিল। ফলে ভাবুক লোকদিগের সম্বন্ধে এরূপ ব্যবহার স্বাভাবিক, আপনা-পনি ভিতরকার কথা বাহির হইয়া পড়ে। তাহারা সভ্যতার শাসন, ভদ্রতার নিয়ম মানে না। বিশেষতঃ তখন সামাজিক প্রথা ব্যবহারপ্রণালী কবিত্ব এবং ভাবুকতার অনুকূলেই ছিল। একে কবিত্বপ্রধান সময়, তাহার উপর প্রগল্‌ভা ভক্তির প্লাবন, এইজন্য তৎকালে অনেক কঠোরহৃদয় বিষয়ী ব্যক্তিও কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের লৌকিক ব্যবহার, ভাষা, সমুদায় রীতি নীতি কবিত্বরসে পূর্ণ ছিল। বৈষ্ণবদিগের রচিত রাশি রাশি গ্রন্থ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রূপ, সনাতন, কবিকর্ণপুর ইহাঁরা উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। চৈতন্য-লীলার আদ্যোপান্তে ভাবুকতা এবং কবিত্বেরই আধিক্য দৃষ্টিগোচর হয়।

যে পরিমাণে ভক্তি ও ভক্তদলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, বিদ্বেষী শাক্ত হিন্দু ও ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মৎসরতা জিগীষাও সেই পরিমাণে প্রকাশ হইয়া পড়িল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ভক্তির এত মাতা মাতি ঢলা ঢলি; নিতাই গৌর অদ্বৈত প্রভৃতি মত্তমাতঙ্গগণের এমন জ্বলন্ত প্রভাব, তজ্জন্য সাধারণ জনগণের মধ্যে এত আন্দোলন উৎসাহ প্রমত্ততা, তথাপি অধ্যাপক পণ্ডিতগণের কিছুই হইলনা। একটু ভক্তিরসও তাঁহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিল না। তাঁহাদের জীবন যেন জ্ঞানের মরুভূমি। চৈতন্যের ভক্তির প্লাবনে বঙ্গদেশে ভাসিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহাঁরা পূর্ব্বেও যে অবস্থায় ছিলেন অদ্যাবধি সেই অবস্থাতেই আছেন।

চাপাল গোপাল নামক এক জন ভ্রষ্টাচারী ব্রাহ্মণ ছিল। যেখানে সঙ্কীর্ত্তন হইত সেই শ্রীবাসের গৃহদ্বারে একদা রজনীযোগে সে জবাফুল, মদ্যভাণ্ড, সিন্দূর রক্ত চন্দন প্রভৃতি বামাচারীদিগের পূজার সামগ্রী রাখিয়া গিয়াছিল। পর দিন সে সকল দ্রব্য দেখিয়া বৈষ্ণবেরা আমোদ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, সেই অপরাধে এই ব্রাহ্মণ শেষ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয় এবং বহুদিন পরে চৈতন্যের প্রসন্নতা লাভ করে।

এক দিন গৌরসিংহ অনুরাগে মগ্ন হইয়া ভক্তসঙ্গে বিরাজ করিতে করিতে হঠাৎ হরিদাস এবং নিতাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা অদ্য হইতে নবদ্বীপের প্রতি ঘরে ঘরে হরিনাম ঘোষণা কর। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বল যে, আমাদের এই ভিক্ষা, তোমরা সকলে হরি বল। ইহা

ভিন্ন আর কোন কথা বলিবে না এবং শুনিবে না। দিবাবসানে আমাকে আসিয়া সংবাদ দিবে।" এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ আহ্লাদের সহিত হরিবোল দিয়া উঠিলেন। হরিদাস ও নিতাই যে আজ্ঞা বলিয়া তদ্দণ্ডে হরিনাম প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন এবং দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া নদীয়াবাসীদিগকে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা হরি বল, হরিনাম গাও, হরিকে ভজ, তিনি প্রাণ ধন জীবন ; অতএব ভাই, তোমরা একমন হইয়া হরিভজনা কর, এই আমাদের ভিক্ষা।" ব্যাকুলভাবে আস্তে ব্যস্তে আসিয়া এই কথা বলিয়া তাহারা চলিয়া যান। তাঁহাদের সন্ন্যাস বেশ দেখিয়া কেহ কেহবা ভিক্ষা দিতে আসিত। তাহা দেখিয়া—"নিত্যানন্দ হরিদাস বলে এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা।" যাহারা সুজন, তাহারা সুখী এবং আর্দ্র হয়, কেহ সন্তুষ্ট হইয়া বলে, আচ্ছা আচ্ছা করিব। কেহ বা নিন্দাও করে। যাহারা শ্রীবাসের দ্বারে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ মনে ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহারা মার মার শব্দে বাহির হইয়া বলিতে লাগিল, "তোমরা সঙ্গদোষে পাগল হইয়াছ বলিয়া আমাদিগকেও পাগল হইতে বল না কি? নিমাই পণ্ডিতটে সকলকেই নষ্ট করিল।" কেহ বলে "এ ব্যাটারা চোর, চুরি করিবার জন্য ছদ্মবেশ ধরিয়াছে, তাহা না হইলে এমন করে কেন? পুনরায় যদি আসে, ধরিয়া রাজদ্বারে চালান করিব।" এ সব কথা শুনিয়া হরিদাস নিতাই দুই জনে মনে মনে হাসেন ; গৌরাঙ্গের শিষ্য, কিছুতেই ভয় নাই, নাম প্রচার করিয়া প্রতি দিন গুরুদেবকে গিয়া সংবাদ দেন। এ দেশে হিন্দুধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের ভাব কোনকালে ছিল না, একা একা নির্জ্জনে বসিয়া সাধন ভজন করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করা হিন্দুধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম প্রচারেরধর্ম্ম ছিল, অপর ধর্ম্মিদিগকে তাঁহারা অভিষেক করিতেন। তদনন্তর চৈতন্য প্রচারের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিলেন। ভ্রাতৃপ্রেমে সম্বদ্ধ হইয়া একত্র সাধন ভজন করা এ ভাব চৈতন্য মহাপ্রভু দিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচার এবং সামাজিক সাধন এই দুইটী নূতন ভাব তাঁহার হৃদিস্থিত ভক্তির ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল, স্বভাবতঃ আপনা হইতেই তাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ভক্তির ধর্ম্ম যে স্বাভাবিক এবং মানবপ্রকৃতিসম্ভূত ধর্ম্ম তাহা ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে।

---

# জগাই মাধাই।

এক দিন নিতাই ও হরিদাস প্রচার করিতে বাহির হইয়া দেখিলেন, পথের মধ্যে দুই প্রকাণ্ড মাতাল, ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটির সহিত বিচরণ করিতেছে। তাহারা আর কেহ নহে, প্রসিদ্ধ দুরাচারী জগাই মাধাই। ইহাদের মত পাষণ্ড আর তখন কেহ ছিল না। জগাই মাধাই ব্রাহ্মণের ছেলে, ইহাদের পিতা পিতামহ ভদ্র এবং সম্রান্ত লোক ছিলেন; কিন্তু ইহারা দুই ভাই বালককাল হইতে মদ্যপান করিতে অভ্যাস করে। যৌবনকালে এমনি দুর্দ্ধর্ষ ঘোর পাষণ্ড হইয়া উঠিল যে, কাহার সাধ্য তাহাদের নিকট যায়, যেন পিশাচের মত ব্যবহার। গোমাংসের সঙ্গে সুরাপান করিত, লোকের ঘরে সিঁদ দিত, আগুন লাগাইত, বন্য মহিষের ন্যায় পথের মাঝে দুইজনে পরস্পর মারামারি গালাগালি করিত, অশ্লীল কথা কহিত; তাহাদের ভয়ে লোক অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। যেখানে সেখানে দুইজনে গোলযোগ করিয়া বেড়াইত। সম্মুখে কাহাকে পাইলে হয়ত বিনামূল্যে দুইটা কিলই বসাইয়া দিত। নিতাই গৌর যেমন প্রেমে মত্ত, ইহারা দুই ভাই তেমনি সুরাপানে মত্ত। অভিভাবকেরা আঁটিতে না পারিয়া ইহাদিগকে একবারে ছাড়িয়া দিয়াছিল। এমন দুষ্কর্ম্ম নাই যাহা এই দুইজনে না করিয়াছে। জগাই মাধাই পাষণ্ডের দৃষ্টান্ত স্থল, এবং পাপীউদ্ধারেরও একটি আশ্চয্য উদাহরণ। পাপের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শেষে মুক্তিলাভ করত ইহারা বঙ্গসমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। জগাই মাধাইয়ের ঘোর দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া এবং স্বচক্ষে তাহাদের কুব্যবহার দেখিয়া পরপ্রেমী নিতাই বড় দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন, ইহাদের যদি মনের পরিবর্ত্তন হয়, তবেইত চৈতন্যের দাস বলিয়া আমি পরিচয় দিতে পারি। এখন যেমন ইহারা সুরাপানে মত্ত হইয়া আছে, তেমনি যদি হরিনামরসে মত্ত হয়; এবং এখন যাহারা ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়া গঙ্গাস্নান করে, তাহারা যদি ইহাদিগকে কখন পবিত্র বোধে স্পর্শ করে, তবেই আমার হরিনাম প্রচার সার্থক। ফলতঃ ইহাদের উপর নিতাইয়ের অত্যন্ত দয়া হইল। বাস্তবিকও এমন দয়ার পাত্র নবদ্বীপে কেহ আর তখন ছিল কি না সন্দেহ। নিতাই হরিদাসকে বলিলেন, হরিদাস! তুমি যবনহস্তে অশেষ যন্ত্রণা পাইয়াও তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলে, প্রভুকে বলিয়া যদি এই ভ্রষ্টপ্রকৃতি ব্রাহ্মণতনয়দ্বয়ের কিছু করিতে

পার! পতিত নরাধমদিগকে উদ্ধার করাইত তাঁহার কার্য্য। হরিদাস বলিলেন, ঠাকুর, কেন আর আমার মাথা খাও, তোমার যে ইচ্ছা প্রভুরও সেই ইচ্ছা। নিতাই বলিলেন, চল তবে আমরা ঐ দুই জনের কাছে প্রভুর আদিষ্ট নাম প্রচার করি। সকলকেইত তিনি এ নাম শুনাইতে বলিয়াছেন, বিশেষতঃ মহাপাপীর প্রতি তাঁহার বিশেষ কৃপা। বলিবার ভার আমাদের আছে, আমরা বলিয়া যাই, তার পর তিনি যাহা জানেন করিবেন। এই বলিয়া দুই জনে জগাই মাধাইয়ের নিকট নাম প্রচার করিতে গেলেন। নিকটস্থ ভদ্র লোকেরা নিষেধ করিল যে, তোমরা উহাদের নিকটে গেলে এখনই প্রাণ হারাইবে, এই দেখ আমরা ভয়ে দূরে রহিয়াছি, সাবধান! নিকটে কদাপি গমন করিও না। নিতাই তাহা না শুনিয়া হরিদাসকে লইয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং বলিলেন, "তোমরা বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম, তিনি মাতা তিনি পিতা তিনি ধন প্রাণ। অনাচার ছাড়িয়া হে জগাই মাধাই! তোমবা হরিভজন কর।" এ কথা শুনিয়া তাহারা ক্ষিপ্ত বৃষের ন্যায় আরক্ত নয়নে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিল, দুই জন সন্ন্যাসবেশধারী মনুষ্য নিকটে দণ্ডায়মান। দেখিবামাত্র ক্রোধভরে অমনি ধর! ধর! বলিয়া তাড়া করিল। নিত্যানন্দ হরিদাস প্রাণভয়ে দৌড়িতে লাগিলেন, তাহারাও গালি পাড়িতে পাড়িতে পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ধরে আর কি! কোন রূপে সাধু দুই জন প্রাণ রক্ষা করিলেন। ভদ্র সজ্জ-নেরা বলিতে লাগিল, "তখনই আমরা নিষেধ করিলাম উহাদের নিকট তোমরা অগ্রসর হইও না, এখন দেখ মহা শঙ্কটে পড়িলে। হায়! হায়! হায়! উহাদের হাতে পড়িলে কি কাহারো রক্ষা আছে?" পাষণ্ডী বিদ্বেষীরা মনে মনে হাসে আর বলে, এইবার ভণ্ডদের উচিত শাস্তি হইয়াছে! ক্রমা-গত দুই জন পাছে পাছে দৌড়িতে লাগিল। ধরি ধরি করে আর ধরিতে পারে না। প্রকাণ্ড স্থূলকায় দুই ষণ্ডা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে চলিল। বলে, তোরা আজ যাবি কোথা? জগা মাধা এখানে আছে তোরা জানিস্ না? নিত্যানন্দ মনে ভাবিলেন, আচ্ছা বৈষ্ণব করিতে গিয়াছিলাম, এখন প্রাণ রক্ষা হইলে বাঁচি! বৃদ্ধ হরিদাস দৌড়িতে পারেন না, ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, মহা বিপদ্ হইল, মাতালও পাছ ছাড়ে না। হরিদাস নিতাইকে বলিলেন, তোমারই বুদ্ধিতে আজ অপমৃত্যুতে প্রাণটা গেল। মদ্যপায়ীকে হরিকথা শুনাইলে এই তাহার ফল হয়। যবনের হস্ত হইতে কৃষ্ণ রক্ষা করিলেন,

এবার চঞ্চলবুদ্ধির সঙ্গে পড়িয়া মারা গেলাম। নিতাই হাসেন আর দৌড়ান। তিনি বলিলেন, ও হে হরিদাস! আমি চঞ্চল নহি, ঠাকুরের আজ্ঞায় আমি ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করি। সে আজ্ঞা পালন না করিলেও সর্ব্বনাশ হয়, আবার করিলেও দেখ এই দশা ঘটে। তাঁহার দোষ তুমি দেখ না, কেবল আমাকেই দোষী করিতেছ। এইরূপে আমোদ ও বিবাদ করিতে করিতে দুই জনে চলিলেন, মাতালদ্বয়ও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। চৈতন্যের বাড়ীর নিকট গিয়া তাহারা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। অবশেষে আপনারা দুই জন পরস্পরে হুড়াহুড়ি কিলাকিলি আরম্ভ করিল। কোথায় তাহারা ছিল আর কোথায় আসিয়াছে কিছুই জ্ঞান নাই। ভক্তদ্বয় মাতালের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সাধুবৃন্দপরিবেষ্টিত গৌরচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট এই ভয়ানক বিপদেব কথা সমস্ত বর্ণন করিলেন। গঙ্গাদাস ও শ্রীবাস জগাই মাধাইয়ের দুরবস্থার কথা বিশেষ অবগত ছিলেন, তাঁহারা বিস্তারিতরূপে তাহা প্রভুকে জানাইলেন। গৌব বলিলেন, তাহাবা এখানে আসিলে আমি তাহাদের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিব। নিতাই বলিলেন, তুমি তাহাদিগকে যাহাই কর, কিন্তু তাহারা দুই ভাই থাকিতে আমি আর কোথাও যাইব না। কিসের তোমার এত গৌরব? সেই দুই জনকে যদি তুমি উদ্ধার করিতে পার, তবে বুঝি তোমার মহিমা। আমাকে উদ্ধার করিয়া যত তোমার মহিমা তাহা হইতে অধিক মহিমা প্রকাশ পাইবে যদি তুমি ইহাদিগকে ভাল করিতে পার। বিশ্বম্ভর হাসিয়া কহিলেন, নিতাই, তুমি যখন তাহাদের মঙ্গলচিন্তা করিতেছ তখন নিশ্চয় জানিবে, অচিরে কৃষ্ণ তাহাদের বন্ধন মোচন করিবেন। এ কথা শুনিয়া ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে হরিধ্বনি পড়িয়া গেল। হরিদাস অদ্বৈতের নিকট সে দিনের বিপদের কথা এবং নিত্যানন্দের চঞ্চলতার কথা সমুদায় বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "প্রভু আমাকে চঞ্চলমতির সঙ্গে পাঠাইয়াছেন। সে বা কোথা, আমি বা কোথা। নিতাই কখন জলে পড়িয়া সাঁতার দেয়, কুমীর ধরিতে যায়। ছোট ছেলেদের তাড়না করে, তাদের অভিভাবক পিতা আবার সে জন্য তাহাকে মারিতে আসে, আমি কোনরূপে হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাদিগকে থামাই। কুমারী দেখিলে বলে আমি বিবাহ করিব। ষাঁড়ের উপর চড়ে, পরের গরুর দুধ দুহিয়া খায়। আমি যদি কিছু বলি, তোমাকে গালি

পাড়ে। বলে যে তোব অদ্বৈত আমার কি করিবে? চৈতন্যই বা কি করিতে পারে? দেখিযা শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া আছি। আজ দৈবযোগে প্রাণরক্ষা পাইয়াছে।” অদ্বৈত বলিলেন, “মাতালেরা মাতালের সঙ্গে মিশিবে, তুমি নিষ্ঠাবান্ হইয়া সে জন্য এত ভীত হও কেন? দিন দুই পরে দেখিবে কি হয়। নিতাইকে আমি ভালরূপে জানি, সে সকলকে প্রেমে মাতোয়ালা করিবে।”

তদনন্তর কিছু দিন পর্য্যন্ত জগাই মাধাই কখন গঙ্গাতীরে, কখন চৈতন্যের বাড়ীর নিকটে ঘুরিযা বেড়াইত। শেষ গৌর যে ঘাটে স্নান করিতেন সেই খানে উহারা আড্ডা কবিল। ইহাদের ভয়ে একাকী রাত্রিকালে ঘাটে কেহ যাইতে সাহস করিত না। কিন্তু যদিও ইহারা দুই ভাই অতি ভয়ানক মাতাল, তথাপি মন তাহাদেব বড় শাদা ছিল। তাহারা সরলভাবে অকপট মনে দুষ্কর্ম্ম করিয়া বেড়াইত, ভদ্রতা বা ধর্ম্মের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া কুটিল মন্ত্রণা বা যুক্তি বিজ্ঞান কপট কৌশলের সাহায্যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত না, এই জন্য সহজে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়। পরে চৈতন্য যেখানে কীর্ত্তন করিতেন তথায় গিয়া ইহারা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কীর্ত্তন শুনিত। ভিতরে যাইবার সুযোগ পাইত না, বাহিরে থাকিয়া মৃদঙ্গ মন্দিরার সঙ্গে তালে তালে নাচিত, নানা রঙ্গ ভঙ্গ করিত। মদের সঙ্গে সঙ্গে গৌরের সঙ্কীর্ত্তন যেন তাহাদের চাটনী হইল। সেই খানে বসিয়া মদ্য পান করিত আর কীর্ত্তন শুনিয়া নাচিত। মদের নেশার সঙ্গে কাহারো কাহারো ধর্ম্মের ভাব হয়, এই জন্য অনেকে মাদকবিশেষকে সাধনের অঙ্গ এবং অনুকূল উপায় বলিযা থাকেন। কিন্তু তাহা নিতান্ত বিকৃত উপায়, আধ্যাত্মিক প্রেমের নেশাই এ পথের অনুকূল সহায়। নেশার সঙ্গে হরিসঙ্কীর্ত্তনের রস মিশ্রিত হইয়া জগাই মাধাইয়ের মনের ভিতরে কি ভাব উৎপন্ন করিত তাহা সেই অন্তর্য্যামী হরিই জানেন। তাহারা গৌরচন্দ্রকে দেখিয়া বলিত, নিমাই পণ্ডিত, তোমার মঙ্গলচণ্ডীব গীত কি সমাপ্ত হইল? তোমার গায়েন গুলি সব ভাল, তাহাদিগকে আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি, যেখানে যাহা আমবা পাইব তাহাদিগকে আনিয়া দিব। এই বলিয়া উপহাস বিদ্রূপ করিত। ভক্তগণ তাহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে দূরে পলায়ন কবিতেন।

এক দিন নিত্যানন্দ নগব ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন

সময় বিকৃত গম্ভীর স্বরে কে রে! কে রে! বলিয়া পথের মাঝে জগাই মাধাই তাঁহাকে ধরিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল তুমি কোথা যাও? তোমার নাম কি? ইহাদের প্রতি নিতাইয়ের যথার্থই একটু টান হইয়াছিল; তিনি বলিলেন, আমার নাম অবধূত, আমি প্রভুর গৃহে যাইতেছি। মাধাই নাম শুনিবামাত্র ক্রোধভরে তাঁহার মস্তকে কলসির কানা ফেলিয়া মারিল, তাহাতে মস্তক বিদ্ধ হইয়া অজস্রধারে শোণিতস্রোত বহিতে লাগিল, নিতাই কাতর অন্তরে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন। কিন্তু রক্তধারা দেখিয়া জগাইয়ের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। মাধাই পুনরায় প্রহারে উদ্যত হইলে জগাই তাহার হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল, তুই কেন নির্দ্দয় হইয়া এই বিদেশী সাধুকে মারিলি? পরিত্যাগ কর, ক্ষমা দে, অবধূতকে আর প্রহার করিস্ না, ইহাতে কি তোর ভাল হইবে? গণ্ডগোল রক্তপাত দেখিয়া পথের লোকেরা চৈতন্যকে এই সংবাদ জানাইল, তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হইলেন। হইয়া দেখেন যে নিত্যানন্দের সর্ব্বাঙ্গে শোণিতধারা বহিতেছে, কিন্তু তিনি প্রসন্নচিত্তে জগাই মাধাইয়ের নিকট দণ্ডায়মান আছেন। তাহা দেখিবা মাত্র শোকে দুঃখে ক্রোধে গৌরাঙ্গ একবারে অস্থির হইলেন, আপনার উত্তরীয় বসন দ্বারা অবধূতের ক্ষত মস্তক বাঁধিয়া দিলেন। তাঁহাকে অধীর দেখিয়া নিতাই বলিলেন প্রভু, তুমি ক্ষান্ত হও, এই দুই জনের শরীর আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি। মাধাইকে মারিতে দেখিয়া জগাই আমাকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিল, দৈবে রক্তপাত হইয়াছে, আমি কোন দুঃখ পাই নাই। জগাইয়ের দয়ার কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গ তাহাকে আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন, নিত্যানন্দকে বাঁচাইয়া তুমি আমাকে আজ কিনিয়া রাখিলে, কৃপাময় কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করুন! আমি আশীর্ব্বাদ করি অদ্য হইতেই তোমার প্রেমভক্তি লাভ হউক! ভক্তগণ পাপীর প্রতি শ্রীচৈতন্যের দয়া দেখিয়া হরিধ্বনি করিলেন। পূর্ব্বেই জগার মন কতকটা নরম হইয়া আসিয়াছিল, পরে এই আশীর্ব্বাদ বাক্য শুনিয়া ও নিজের দুর্গতি অনুভব করিয়া একেবারে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। গৌরের পদ ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। এক দিকে ঘোর অত্যাচার, প্রহার, শোণিত পাত; অপরদিকে প্রেমালিঙ্গন, স্নেহপূর্ণ শুভাশীর্ব্বাদ, ইহা কে সহিতে পারে? প্রেমের প্রচণ্ড পরাক্রম দেখিয়া পাষণ্ড ভ্রাতৃদ্বয় হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। পাপের পূর্ণাবস্থার ভীষণ মূর্ত্তি এবং প্রেমের

কমনীয় পবিত্র ভাব এক সঙ্গে না দেখিলে পাপী ব্যক্তি সে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না। পাপ অল্পে অল্পে যখন নরহত্যা, ঘোর দুষ্ক্রিয়ায় পরিণত হয়, তখন তাহার বিকটাকার দর্শনে মন চমকিয়া উঠে। প্রকাণ্ড পর্ব্বত-সমান তুলারাশির উপর এক কণিকা অগ্নি পড়িলে যেরূপ হয়, এখানে ঠিক তাহাই হইল। পাষণ্ডদলন হরিভক্তির প্রভাব দুরন্ত মাধাইও আর অতি-ক্রম করিতে পারিল না, গৌর নিতাইয়ের উজ্জ্বল প্রেমপ্রতিভা এবং মধুর অমায়িক ব্যবহার সন্দর্শনে সেও অবসন্ন হইয়া পড়িল। অনন্তর গৌরের চরণে পড়িয়া সে বহু বিনয় সহকারে কাঁদিতে লাগিল। বলিল ঠাকুর! আমরা দুই দেহ এক জীবন, এক জনকে যদি কৃপা করিলে, আমাকে কেন আর তবে বঞ্চিত রাখ? চৈতন্য কহিলেন, নিত্যানন্দের অঙ্গে তুমি রক্ত-পাত করিয়াছ, তাঁহার দেহ আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমি তোমার কিছু করিতে পারি না, যদি তিনি তোমাকে ক্ষমা করেন তবেই তুমি রক্ষা পাইতে পার। যাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছ তিনিই তোমাকে রক্ষা করিবেন। মাধাই তখন নিতাইয়ের চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, এবং কাতর-ভাবে অনুতাপাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। নিতাই বলিলেন, আমার সুকৃতি আমি তোমাকে দিলাম, তোমার অপরাধ সব দূর হইল। এই বলিয়া মাধাইকে তিনি গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। শত্রুর প্রতি এতাদৃশ অভূতপূর্ব্ব প্রেম দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া রহিল। তখন দুই জনে দুই ভাইয়ের পদতলে পড়িয়া আপনাদের উৎকট পাপ স্মরণ করত আত্ম-গ্লানিপূর্ণ হৃদয়ে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। মহাপ্রভু বলিলেন, শুন জগাই মাধাই, তোমরা যদি আর পাপ না কর, তবে তোমাদের সমস্ত পুরাতন পাপ আমি গ্রহণ করিলাম, তোমাদের সে জন্য আর কোন ভয় নাই। ভগবানের কৃপায় যথার্থ অনুতাপ যদি হয়, তবে পুরাতন পাপ-রাশি সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়। পাপ দূর হওয়ার তাৎপর্য্য একবারে তাহা সমূলে বিনষ্ট হওয়া, এই জন্য গৌর তাহাদিগকে এই আশাবাক্য শুনাইলেন। অভয় প্রাপ্ত হইয়া জগাই মাধাই তাঁহার চরণে বার বার লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অতঃপর গৌরাঙ্গ বৈষ্ণবদিগকে বলিলেন, এই দুই জনকে আমার গৃহে লইয়া চল, আজ আমি ইহাদিগকে লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিব। ভক্তগণ একত্রিত হইয়া আনন্দের সহিত গভীর নিনাদে যখন হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, তখন জগাই মাধাই পৃথিবীতে স্বর্গের শোভা

দর্শন করিল। তাহারা ক্রমাগত ভক্তদিগের চরণধূলিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। এই সময়ের জন্য কোন রসগ্রাহী সাধু প্রেমবিজয় নিতাই চৈতন্যের মুখে নিম্নলিখিত সঙ্কীর্ত্তনটী তুলিয়া দিয়াছেন ;—

"আয় রে আয় জগাই মাধাই আয়!
মেরেছে তার ভয় কি আছে আয়। হরিসঙ্কীর্ত্তনে নাচবি যদি আয়।
ও রে মার খেয়েছি না হয় আবার খাব, ও রে তবু হরিনাম দিব আয়।
ও রে মেরেছ কলসির কাণা, (মাধাইরে! ওরে মাধাই)
ওরে তাই বলে কি প্রেম দিব না আয়।
ওরে আমরা দু ভাই গৌর নিতাই, ওরে দু ভাইয়ে তরাব দু ভাই আয়।
তোদের স্নান করাব গঙ্গাজলে, হরিনামের মালা দিব গলে আয়।
ওরে আয়রে মাধাই কাছে আয়, হরিনামের বাতাস লাগুক গায় আয়।"

দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে যাহারা মহা ঘোর নরকে ডুবিয়া ছিল তাহারা একবারে স্বর্গে প্রবেশ করিয়া পতিতপাবন হরিনামরসে মত্ত হইল, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য অলৌকিক ক্রিয়া আর কি হইতে পারে? যেন পাপের নদী পুণ্য-সাগরে গিয়া মিলিত হইল। মনুষ্য হইয়া কেহ যদি সমুদ্র শোষণ করে, তাহা ও ইহার নিকট আশ্চর্য্য নহে। বাহিরের অসাধারণ অলৌকিক কোন ঘটনা এইরূপ মহাপাপীর মন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কখন তুলনা হইতে পারে না। আজন্ম মূর্খ পাষণ্ড মদ্যপায়ী, বিষম দুষ্ক্রিয়ার যাহারা সাক্ষাৎ অবতার, হরি-ভক্তিরূপ দৈবশক্তিগুণে এবং পবিত্রাত্মা ভক্তদিগের অঙ্গস্পর্শে তাহারাও পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। জগাই মাধাই অবিশ্রান্ত ক্রন্দনের সহিত গৌর নিতাইকে কতই স্তুতি মিনতি করিল! নাম সঙ্কীর্ত্তনের পুণ্যভূমিতে তাহাদিগকে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া সকলে বিমোহিত হইলেন। পাপিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই ক্রন্দন অনুতাপ স্তব আর্ত্তনাদ শ্রবণে পাষাণ ভেদ হইয়া যাইতে লাগিল। ভক্তগণ চৈতন্যকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, প্রভো! কাহার বাপের সাধ্য যে তোমার এই মহিমা বুঝে? তুমি দুরাত্মা মদ্যপ জগাই মাধাইকে পদানত করিলে! গৌর বলিলেন, অদ্য হইতে তোমরা আর ইহাদিগকে মাতাল বলিয়া ঘৃণা করিও না, ইহাদের যে কিছু অপরাধ থাকে তাহা মার্জ্জনা করিয়া তোমরা এই দুই জনকে আশীর্ব্বাদ কর। জগাই মাধাই প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া তৎ-ক্ষণাৎ সমস্ত ভক্তবৃন্দের চরণধূলি লইতে লাগিল। তাহাদের চিরজীবনের পাপরাশির উপর অনুতাপ অশ্রু পড়িয়া যেন নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধৌত

করিয়া ফেলিল। বৈষ্ণব ভাগবতগণ সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর চৈতন্য ভ্রাতৃদ্বয়কে আশা দিয়া বলিলেন, আর তোমাদের কোন চিন্তা নাই, আজ তোমরা সশরীরে স্বর্গলাভ করিলে। এই বলিয়া তাহাদিগকে উঠাইয়া পরম আনন্দের সহিত নৃত্য গীত সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আহা সে কি চমৎকার শোভা! সেই বিখ্যাত পুরাতন পাপী জগাই মাধাই গলদশ্রুলোচনে গৌরচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে লাগিল! চৈতন্য সকলকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা এই দুই জনকে আর পাপী মনে করিয়া পরিহাস করিবে না, আপনাদের সমতুল্য জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধা করিবে, তাহা না করিলে তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। উদারাত্মা বৈষ্ণবগণ তাঁহার কথা শুনিয়া জগাই মাধাইকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সত্য সত্যই তখন আর তাহারা পাপী ছিল না, ভগবানের কৃপায় সাধুভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। অভ্যাসের পাপ শীঘ্র যায় না সত্য, কিন্তু ঈশ্বরেব কৃপাবারি সংস্পর্শে অচিরে তাহা ধৌত হইয়া যায়।

পর দিন সেই মত্ততার বেশে ধূলিধূষরিত অঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে গঙ্গাস্নানে গিযা জলক্রীড়া করিলেন। ভক্তদলের মধ্যে আমোদ প্রমোদ হাসি মস্কাবাম যথেষ্ট ছিল। জলকেলীর সময় প্রভু ভৃত্য, গুরু শিষ্য ভেদাভেদ জ্ঞান থাকিত না। গৌর অগ্রেই বৈষ্ণবগণের চোখে মুখে গায়ে জলের ছিটা মারিলেন, শেষ পরস্পরে মহা জলযুদ্ধ হইল। গৌর তাহাতে সকলকে পরাভূত করিলেন। পরে দুই দুই জনে জল ফেলাফেলি করিতে লাগিলেন। যিনি বৃদ্ধ বিজ্ঞ ভক্তিতে তিনিও বালকের মত। এখনকার কালে সে সমস্ত অসভ্যতার পরিচায়ক, কিন্তু তখন এ বিষয়ে ভক্তদিগের একটী বিশেষ আমোদ ছিল। নিত্যানন্দের সঙ্গে অদ্বৈতাচার্য্যের কিছু অধিক রঙ্গ রস চলিত। নিতাই বৃদ্ধের চক্ষে সজোরে জলের ছিটা মারিলেন। বৃদ্ধ আমোদচ্ছলে কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "শ্রীবাস ব্রাহ্মণের যেমন জাতি নাই, তেমনি কোথা হইতে একটা অবধূত আনিয়া জুটাইয়াছে। এ ব্যক্তি পশ্চিমে গিয়া কত লোকের অন্ন খাইয়াছে, ইহার পিতা মাতা গুরু কে তাহাও জানি না; কোন্ কুলে জন্ম, কোথায় বাড়ী ঘর কিছুই স্থির নাই; কোথাকার একটা মাতাল!" এইরূপ পরিহাস করিয়া দুই জনে জলক্রীড়া করিলেন। গৌরাঙ্গ বলিলেন, একবারে হার জিত বুঝা যায় না, তিন

বার যুদ্ধ কর। তাঁহার উৎসাহ পাইয়া নিতাই অদ্বৈত পুনরায় জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন।

পরে ভাগীরথীতীরে জগাই মাধাইকে বিশেষরূপে অভিষেক করা হয়। তাহাদের হস্তে তুলসীপত্র দিয়া চৈতন্য বলিলেন, "তোমরা এই পত্রের সহিত সমুদায় পাপভার আমার হস্তে অর্পণ কর, আমি তোমাদের পাপ-ভার গ্রহণ করিলাম।" তাঁহার আশাপ্রদ মধুর বাক্য শ্রবণে ভ্রাতৃদ্বয় কাঁদিয়া আকুল হইল। বলিল, প্রভো! আমাদেব যে পাপের অন্ত নাই। এ মহাপাষণ্ডদের কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে? এই বলিযা তাহারা গৌরা-ঙ্গের চরণে পুনঃপুনঃ লুটাইতে লাগিল, ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই সময়কার দৃশ্য অতীব আশ্চর্য্যজনক হইয়াছিল। তদনন্তব গৌর বিশ্বম্ভর নিজের গলার মালা তাহাদিগের গলায দিয়া সকলকে বলি-লেন, আমি তোমাদের হস্তে এই দুই জনকে সমর্পণ করিলাম। মহাপ্রভু চৈতন্যের প্রচারক্ষেত্রে এমন মনোহর ব্যাপার আব হয় নাই। এই হইতে ইহাঁর নাম বিশেষরূপে বিখ্যাত হয়, এবং কর্ম্মী জ্ঞানী কুতার্কিক ভক্তি-বিদ্বেষী সকলে একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যায়। জগাই মাধাই হরিনামে মাতিবে এ কথা সহসা কাহারো বিশ্বাস হইতে পারে না। কিন্তু প্রত্যক্ষ ঘটনা সকলকে বিশ্বাস করিতে হইল। গৌরাঙ্গের প্রতাপ বাড়িল, সাধু ভক্তজনের আনন্দ এবং পাপী দীনাত্মাদিগের আশা বৃদ্ধি হইল। হরিনামের যে কি অদ্ভুত মাহাত্ম্য তাহা জগাই মাধাই পাপীদ্বয়ের জীবনে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইল।

জগাই মাধাই প্রতি দিন উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া দুই লক্ষ হরিনাম জপ করেন আর পূর্ব্ব পাপ স্মরণ করিয়া কাঁদেন, কিছুতেই আর তাঁহাদের সে দুঃখের বিরাম হয় না। এক এক বার গৌরচন্দ্র বাপ! বলিয়া ভ্রাতৃ-দ্বয় কাতরস্বরে বিলাপ করিয়া উঠিতেন। নির্ম্মল দর্পণে যেমন নিজমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাঁরা নবজীবনের দর্পণে তেমনি পূর্ব্বজীবন দেখিয়া আপনা-দিগকে শত শত ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা অনুতাপ আর নাম জপ, আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। চৈতন্য স্বয়ং কখন কখন ভক্তগণসঙ্গে তাঁহাদিগের নিকট গিয়া প্রবোধ দিয়া আহার করাইয়া আসি-তেন। অনুতাপের প্রজ্বলিত হুতাশনে জগাই মাধাইয়ের রাশি রাশি পাপ দগ্ধ হইতে লাগিল। কয়েক দিন পরে জগাইয়ের মন কথঞ্চিৎ শান্ত হইল,

কিন্তু মাধাই আর কিছুতেই সুস্থির হইতে পারেন না। তিনি অবধূত নিত্যানন্দকে প্রহার করিযাছেন ইহা যত বার স্মরণ করেন, ততবারই নয়ন-জলে বুক ভাসিয়া যায়। নিরন্তর এই ভাবিয়া তিনি বিস্তর খেদ করিতে লাগিলেন। পুনরায় এক দিন আবার নিতাইয়ের পদধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং স্তব স্তুতি বিনয় করিয়া বলিলেন, ঠাকুর! আমি তোমার শ্রীঅঙ্গে রক্তপাত করিয়াছি, এ অপরাধ কি আমার ঘুচিবে? নিতাই প্রেমভরে আলিঙ্গন দিয়া মাধাইকে আশ্বস্ত করিলেন এবং বলিলেন. বাপে কি শিশু সন্তানের প্রহারকে কখন অপরাধ গণনা করে? মাধাই বলিল ঠাকুর! আমি যে যে লোকের বিরুদ্ধে অপবাধ কবিয়াছি তাহাদের সকলকেত চিনি না, তবে কিরূপে তাহাদিগের নিকট ক্ষমা চাহিব, এক্ষণে উপায় কি বলিয়া দিন। নিতাই এই পরামর্শ দিলেন যে, তুমি গঙ্গাস্নানের পথে গিযা বসিয়া থাক, যত লোক স্নান করিতে যাইবে সকলকে বিনয়পূর্ব্বক নমস্কার করিও, তাহা হইলে তাহারা প্রসন্ন হইয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে এবং তোমার অপরাধ ভঞ্জন হইয়া যাইবে। মাধাই অবিলম্বে গঙ্গাব ঘাটে গিয়া বসিলেন। লোকদিগকে দেখিযা তাঁহার মনে বড় আহ্লাদ জন্মিল। তখন অবনত মস্তকে সজলনয়নে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এইরূপে সকলকে বলিতে লাগিলেন, "জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে আমি যত অপবাধ করিয়াছি, তাহা হইতে মুক্ত করিয়া তোমরা আমাব প্রতি প্রসন্ন হও!" নবদ্বীপবাসী নরনারী মাধাইয়েব ব্যাকুলতা বিনয় দেখিয়া কেহ আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিল না। তাহারা প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিল, নিমাই পণ্ডিত ধন্য যে তিনি এমন লোককে সচ্চরিত্র করিলেন! তাঁহাব কীর্ত্তনই যথার্থ কীর্ত্তন। তিনি ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক। তাঁহাকে যাহারা নিন্দা করে তাহারা দুর্জ্জন পাষণ্ড। মাধাইয়ের পরিবর্ত্তন দেখিযা চৈতন্যকে ক্রমে অনেক লোক চিনিতে পারিল। তদবধি অনেকে তাঁহার নিন্দা করিতে সঙ্কুচিত হইত। মাধাই নিজে কোদালি ধরিয়া পবিশ্রম কবিতেন আর গঙ্গাতীরে দিবানিশি তপস্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। পরিশেষে তিনি একজন ব্রহ্মচাবী সাধকের ন্যায় সাধারণের চক্ষে প্রতীত হন। যে স্থানে তিনি থাকিতেন তাহা মাধাইয়ের ঘাট বলিয়া বিখ্যাত হয়।

# রসভঙ্গ এবং পরিতাপ।

বহির্দ্বার বন্ধ করিয়া শ্রীবাসের গৃহে চৈতন্য প্রতি রজনীতে সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। এক দিন কিছুতেই আর ভাবাবেশ হয় না; নৃত্য করেন সুখ পান না, হরি বলেন অন্তরে উল্লাস জন্মে না; পূর্ণ মাত্রায় ভক্তি না হইলে তাঁহার হৃদয় কিছুতেই আরাম বোধ হইত না। তখন মহা দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আজি কেন আমার প্রতি প্রভুর কৃপা হইতেছে না? সকলেই মহা ভাবিত হইলেন, শেষ স্থির করিলেন দেখ তবে ঘরের মধ্যে কেহ হয়ত লুকাইয়া আছে। শ্রীবাস পণ্ডিত সমস্ত বাড়ী অন্বেষণ করিয়া অনেক কষ্টের পর শেষ দেখেন যে তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী কীর্ত্তনের ঘরের এক কোণে ডোলের আড়ালে লুকাইয়া রহিয়াছেন। জামাতার গৃহবাসিনী গরিব বিধবা শাশুড়ীর দুরবস্থা চিরকালই সমান। কীর্ত্তনে রসভঙ্গ হইতেছে, চৈতন্য অসুখ অনুভব কবিতেছেন, ইহাতে পারিষদগণের মনে কিরূপ ক্ষোভ বিরক্তি হইতে পারে তাহা সহজেই বুঝা যায়। শ্রীবাস ক্রোধভরে শাশুড়ীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাহাকে টানিয়া বাহির করিলেন। দুঃখিনী নারী গৌরের কীর্ত্তন শুনিবে, নৃত্য দেখিবে, এই অভিলাষে ঘরের কোণে লুকাইয়াছিল, কিন্তু তাহা কপালে ঘটিবে কেন? শাশুড়ী হইয়া জামাতার গৃহে দুহিতার সহচরী হইয়া থাকা অনেক পাপের ফল; সুতরাং সে বিধবার অদৃষ্টে আর হরিসঙ্কীর্ত্তন শুনা ঘটিল না। সে বাহির হইবামাত্র চৈতন্যের ভাবাবেশ উপস্থিত হইল, কীর্ত্তন জমিয়া গেল, ভক্তগণ হাসিতে লাগিলেন, শ্রীবাসও প্রেমে মত্ত হইলেন। তদনন্তর ভক্তগণ নির্ব্বিঘ্নে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। চৈতন্য সে দিন এক একবার এমনি ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন যে, তাহা শুনিয়া পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। তিনি সকলকে বলিলেন, "ভাই সকল! হরি আমার প্রাণ জীবন পিতা মাতা, তাঁহার দাসত্ব ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই। তোমরা আমার চিরকালের বন্ধু, যদি কখন আমাকে ইহার অন্যথাচরণ করিতে দেখ তবে তখনই আমাকে বলিও।"

জ্ঞাতসারে সহজে কেহ তাঁহার পদধূলি লইতে পারিতেন না, বরং তিনিই বৈষ্ণবদিগের পদস্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে মহা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। অদ্বৈতকে তিনি গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, তাঁহার পায়ের ধূলা লইতেন, কিন্তু তিনি লইতে গেলে চৈতন্য মহা রাগ করিতেন; ইহাতে অদ্বৈত বড়

বিপদে পড়িতেন। যখন তাঁহার ভাবাবেশ হইয়া চেতনা রহিত হইত, সেই অবসরে গোপনে অদ্বৈত আচার্য্য মনের সাধ পূর্ণ করিয়া লইতেন। এক দিন বিশ্বম্ভরের কীর্ত্তনে রসভঙ্গ হওয়াতে কে তাঁহার পদধূলি লইয়াছে এই সন্দেহ করিয়া তিনি অদ্বৈতকে ধরিয়াছিলেন। বিনয় তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তাহা দেখিয়া পারিষদগণ মনে করিতেন এ সব ছলনা এবং আত্মগোপন করিবার ইচ্ছা। কিন্তু গৌরের কাছে সেটী হইবার যো ছিল না, যাহা তাঁহার মনে তাহাই বাহিরে প্রকাশ পাইত, অন্তর বাহির সমান ছিল। যেমন তাঁহার হরিপ্রেম ব্যাকুলতা, তেমনি ভ্রাতৃপ্রেম সাধুভক্তি সরলতা। সে দিন কীর্ত্তন করিতে করিতে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভক্তিভাব দেখিয়া গৌর বড় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। শুক্লাম্বর এক জন মহৎ লোক, ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতেন, আর সর্ব্বদা হরিরসে মগ্ন থাকিতেন। চৈতন্য বৈরাগ্য, দীনতা, অনাসক্তি যাহার জীবনে দেখিতেন তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন। এক দিন শুক্লাম্বরের ভিক্ষার ঝুলি হইতে তণ্ডুল লইয়া তাহা চিবাইতে লাগিলেন। ইহাতে বৈষ্ণবগণের পরম সন্তোষ জন্মিল।

একদিন বন্ধুবর্গের সহিত শচীকুমার নগরমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। কয়েক জন বিরুদ্ধবাদী বলিল, ওহে নিমাই পণ্ডিত! তুমি নিশাকালে লুকাইয়া কীর্ত্তন কর, আমরা বন্ধুভাবে নিষেধ করিলাম তাহাতো শুনিলে না, এ কথা কিন্তু রাজার কর্ণগোচর হইয়াছে; শীঘ্র দেখিবে কি হয়, তোমাকে ধরিবার জন্য রাজাজ্ঞা বাহির হইয়াছে। গৌর সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা! আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। আমাকে যে অন্বেষণ করিতে চায় আমি তাহাকে দেখা দিব। সে দিন কীর্ত্তনের সময় ভক্তগণকে তিনি বলিলেন, অদ্য পাষণ্ডীদিগকে সম্বোধন করিয়া নাম গাও, তাহাদের সকল দুঃখ দূর হউক। গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই আর ভাবোদয় হয় না, চিত্ত বড় অস্থির হইল। বন্ধুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই সকল! আজ কেন আমার ভাবাবেশ হইতেছে না। আমার বা কোন অপরাধ হইল! তোমরা আমাকে ক্ষমা করিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।" এই বলিয়া অনেক কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কি দুঃসহ বিরহজ্বালায় তিনি দগ্ধ হইতেছিলেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। বৃদ্ধ অদ্বৈত সেই খানে শয়ান ছিলেন, উঠিয়া ভ্রূকুটি করিয়া নাচিতে লাগিলেন। ইনি অনেক রঙ্গরস জানিতেন। যদিও বয়সে

সকলের অপেক্ষা প্রাচীন, কিন্তু বড় রসিক ছিলেন। আচার্য্য গোসাঞী প্রেমাহ্লাদে মত্ত হইয়া অনেক বিধ আমোদ পরিহাস করিতেন। তিনি বলিলেন, অদ্বৈত শুইয়া আছে, প্রেম হইবে কেন? আমি এবং শ্রীবাস বাহিরে পড়িয়া রহিলাম, যত সব তিলি মালীর সঙ্গে তোমার প্রেমবিলাস! অবধূত হইল তোমার প্রেমের ভাণ্ডারী! গোসাঞী! তুমি যদি আমাকে প্রেম-যোগ না দাও, তবে আমি সব শুষিয়া ফেলিব! বৃদ্ধের এ সকল অভিমানের কথা ভিন্ন আর কোন মন্দ ভাবের নহে। চৈতন্য কিছু না বলিয়া বিষাদিত মনে দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন, হরিদাস এবং নিতাই পশ্চাতে চলিলেন। প্রেমহীন দেহ ধারণে ফল কি, এই ভাবিয়া গৌরচন্দ্র একেবারে জাহ্নবীর জলে গিয়া পড়িলেন। নিতাই তখনই তাঁহার কেশে ধরিলেন, হরিদাস পদদ্বয় ধরিয়া উপরে তুলিতে চেষ্টা করিলেন। "কেন তোমরা আমাকে ধর? প্রেমহীন জীবনে কি কাজ আছে?" এই বলিয়া বিশ্বম্ভর তাঁহাদিগকে ধমক্ দিতে লাগিলেন। সকলে কম্পিত কলেবর। আজ না জানি ঠাকুর বা কি করেন! নিতাই কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অনেক ক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে বুঝান হইল। তখন চৈতন্য তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করিলেন যে, অদ্য আমি গোপনে বাস করিব, এ কথা তোমরা কাহাকেও বলিবে না। ইহা বলিয়া সে দিন সমস্ত রাত্রি তিনি নন্দন আচার্য্যের গৃহে বাস করেন। রজনীতে তাঁহার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিয়া মন কতকটা শান্ত হইল। এ দিকে ভক্তগণ গাভীহারা বৎসের ন্যায় নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছেন, কোথাও আর গৌরের দেখা পান না; অদ্বৈত দুঃখে শোকে অনাহারে ভূতলে পড়িয়া রহিলেন। পর দিন প্রাতে শ্রীবাসকে ডাকাইয়া তাঁহার সঙ্গে গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের নিকট গেলেন এবং সকলের আনন্দ বর্দ্ধন এবং সন্তোষ উৎপাদন করিলেন।

## সখীভাবে নৃত্য গীত।

একদা গৌরাঙ্গ সুন্দর পারিষদবর্গকে ডাকিয়া বলিলেন, অদ্য আমি প্রকৃতিবেশে নৃত্য করিব। গদাধরকে রুক্মিণী, ব্রহ্মানন্দকে তালবুড়ী, নিতাইকে বড়াই, হরিদাসকে কোতয়াল, শ্রীবাসকে নারদ সাজিতে হইবে। সদাশিব এবং বুদ্ধিমন্ত খাঁয়ের প্রতি অনুমতি হইল যে, তোমরা চন্দ্রশেখ-

বের গৃহে শঙ্খ কাঁচুলী পাটসাড়ী অলঙ্কারাদি সমুদায় প্রস্তুত রাখিবে। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সামিয়ানা খাটাইয়া সরাব উপর সরিষার পুঁটলি জ্বালিয়া রোসনাই করিলেন। এ প্রস্তাবে বৈষ্ণবদিগের চিত্তে মহা আহ্লাদ জন্মিল। গৌর বলিলেন আমি সখীবেশে নৃত্য করিব, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভিন্ন তথায় কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই কথা তিনি খুব শক্ত করিয়া ধরিয়া বসিলেন, তাহাতে অনেকেরই মুখ শুকাইয়া গেল। অদ্বৈত সর্ব্বাগ্রে মাটিতে আঁচড় দিয়া বলিলেন, আমিত বাপু সেখানে তবে যাইতে পারিব না। আমি অজিতেন্দ্রিয় মনুষ্য, আজিকার নৃত্য দেখা আমার কার্য্য নহে। শ্রীবাস বলিলেন আমারও ঐ কথা। তখন চৈতন্য গোসঞী মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, তোমরা সকলে না গেলে কাহাকে লইয়া তবে নৃত্য হইবে? কোন চিন্তা নাই, তোমরা আজ মহা যোগেশ্বর হইবে, চল! তখন সকলে অভয় প্রাপ্ত হইয়া নৃত্য দেখিতে চলিলেন। শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনী এবং অপরাপর বৈষ্ণবগণের পরিবার চন্দ্রশেখরের গৃহে সমাগত হইলেন। বিষয়টা ঠিক কৃষ্ণযাত্রার মত। প্রথমে মুকুন্দ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন। পরে হরিদাস প্রকাণ্ড এক যোড়া কৃত্রিম গোঁফ পরিয়া মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া হস্তে দণ্ড লইয়া আসরে উপস্থিত হইলেন। শ্রোতৃবর্গকে জাগ্রত করা তাঁহার প্রথম কার্য্য। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিল। তদনন্তর শুভ্র কেশশ্মশ্রুধারী বীণাহস্ত শ্রীবাস ঠাকুর নারদ হইয়া আসিলেন, রামাই ভৃত্য সাজিয়া তাঁহার সঙ্গে কুশাসন লইয়া উপস্থিত হইলেন। শচী মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনিই কি শ্রীবাস পণ্ডিত? তাঁহাকে দেখিয়া সকলের মন বিস্ময়রসে পূর্ণ হইল। প্রথম রাত্রিতে গৌরচন্দ্র রুক্মিণী সাজিয়া তদুপযুক্ত ভাব ভঙ্গী প্রদর্শন করিলেন। শিশুপালের সহিত তাঁহার বিবাহ না হয়, কৃষ্ণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক অধিবাস দিবসে হরণ করিয়া লইয়া যান, এই প্রার্থনা করিয়া কৃষ্ণকে তিনি পত্র লিখিলেন। রুক্মিণীরূপী গৌর বলিলেন, "হে যদুকুলসিংহ, ভুবনসুন্দর, তোমার যশের কথা শুনিয়া আমার চিত্ত লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার পানে ধাবিত হইতেছে। আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা কর। আমি ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না। পত্নীপদ দিয়া আমাকে তুমি দাসী করিয়া লও। আমি তোমার চরণে মন প্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলাম। নাথ, আমায় গ্রহণ কর। যেন সিংহের ভোগ্য শৃগালের হস্তগত না হয়।" এই সকল কথা শুনিয়া ভক্তদল আনন্দে

কাঁদিয়া উঠিল। এই যাত্রা ভগবানকে পতিরূপে সাধন করিবার একটী উপায়।

পরে গদাধর ও ব্রহ্মানন্দ গোপিনী সাজিয়া অভিনয় করিলেন। তাঁহাদিগকে কোতয়াল এবং নারদ বলিলেন, তোমরা কোথায় যাইবে? কে তোমরা? অদ্বৈত বলিলেন, পরনারী মাতৃবৎ, কেন আর ইহাদিগকে লজ্জা দাও? বলি ও গো! তোমরা নৃত্য গীত কর, প্রচুর ধন পাইবে, আমাদের ঠাকুর নৃত্য গীত বড় ভাল বাসেন। তখন সখীদ্বয় গাঁইতে এবং নাচিতে লাগিলেন। গদাধর বড় ভাবুক, তিনি নিজে মুগ্ধ হইয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন। প্রেমসলিলে সকলের চিত্ত দ্রবীভূত হইল। বৃদ্ধ অদ্বৈতের প্রতি আদেশ ছিল তিনি ইচ্ছা মত নানা সাজে সাজিয়া নাচিবেন। তিনি সে দিন নানা প্রকার রঙ্গ ভঙ্গী করিয়াছিলেন। পরিশেষে বিশ্বম্ভর গোপীকার বেশে নিত্যানন্দকে সহচরী করিয়া আসরে সমাগত হইলেন। তাঁহার রূপে চারিদিক্ আলোকময় হইল। তিনি পরমাসুন্দরী দেবকন্যার ন্যায় দিব্য লাবণ্যময়ী সখী সাজিয়া সকলকে একবারে আশ্চর্য্যরসে নিমগ্ন করিলেন। যেন ভক্তি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী জননীর ন্যায় হইয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইল, গৌর বিশ্বম্ভর বলিয়া কেহ আর চিনিতে পারিল না। তাঁহাকে দেখিয়া সকলের মনে মাতৃভাব সমুদিত হয়। আদ্যাশক্তি ভগবতী জননী বলিয়া তাঁহাকে ভক্তগণ করপুটে স্তব স্তুতি বন্দনা করিলেন। প্রেমভক্তিরসে বিগলিত হইয়া দর্শক নরনারী সকলে কাঁদিয়া একবারে আচ্ছন্ন হইল। বিশ্বম্ভর মাতৃভাবে শ্রোতাগণের হৃদয়ে এমনি ভক্তি উদ্দীপন করিলেন যে,চন্দ্রশেখরের গৃহ আনন্দধাম হইয়া উঠিল। শেষ নিতাই ভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহা আনন্দ কোলাহল। ভাবে ভোর হইয়া একদিকে স্ত্রীগণ শচীর চরণে পড়িয়া কাঁদিতেছে, বাহিরে শ্রোতা, গায়ক নর্ত্তক ভক্তিতে সকলেই কাঁদিতেছে, এমন সময় হঠাৎ রাত্রি প্রভাত দেখিয়া সকলে বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে তাঁহাদের বিষম ব্যাকুলতা আর্ত্তি দর্শনে সেই মাতৃবেশধারী চৈতন্য সকলকে স্তন্য পান করাইয়া সুস্থির করেন। সে ভাবের তেজ সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত ছিল।

ভাবুক বৈষ্ণবদল প্রেম ভক্তির রসেই উন্মত্ত, মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত, তখন বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্ট বস্তু এবং ব্যক্তিতেও তাঁহারা সে ভাবের ছবি দেখিতেন। ভাবাবেশের অন্ত নাই, নবনীতের ন্যায় কোমল প্রকৃতি

যেন গলিয়াই আছে। যা হউক, যাত্রাতে কিছু আনন্দ এবং উপকার অধিক হইয়াছিল। এ প্রকার নৃত্যের তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষেরা পুরুষত্ব বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতিভাবাপন্ন হইলে কামরিপুর হস্ত হইতে একবারে নিষ্কৃতি লাভ করে। সখীভাবে ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণের সহিত মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়াছিলেন ইহা সেই নিঃস্বার্থ কামগন্ধহীন প্রেমলীলার অনুকরণ। নারী প্রকৃতির প্রতি সম্মান ভক্তি প্রদর্শনও ইহার অন্যতর এক উদ্দেশ্য। ঈশ্বরকে পতিভাবে ভজনা করাই তাঁহাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মসাধন, ইহা ঈশ্বরপ্রেমের চরমাবস্থা। এরূপে না ভজিলে ভক্তের প্রেমপিপাসা চরিতার্থ হয় না, অনেকের এই বিশ্বাস ছিল। ব্রজগোপীরা নিষ্কামভাবে ভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া তাঁহাকে প্রাণপতিরূপে গ্রহণ করত মাধুর্য্যরস সম্ভোগ করেন।

# গৌরের শান্তিপুর দর্শন।

চৈতন্য গদাধর ও নিতাইকে লইয়া নানা ভাবে নানা স্থানে বিহার করিয়া বেড়ান, যেথানে সেথানে সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হন, শুদ্ধচিত্ত ভক্তগণ সকলেই সুখী, কেবল অদ্বৈতের আর কিছুতেই মনঃক্ষোভ নিবৃত্ত হয় না। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা যে দাস্যভাবে শিষ্যের ন্যায় চৈতন্যের সঙ্গে থাকেন, কিন্তু তিনি বলবান্ যুবাপুরুষ, বলপূর্ব্বক বৃদ্ধের পদধূলি লয়েন। অদ্বৈত এ বিষয়ে এক উপায় মনে মনে স্থির করিয়া পরম মিত্র হরিদাসের সঙ্গে শান্তিপুর চলিয়া গেলেন। তথায় গিয়া কেবল যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করেন আর ভক্তির গৌরব হ্রাস করিয়া জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন। দুলিয়া দুলিয়া বলিতে লাগিলেন, "বিষ্ণুভক্তি দর্পণ, জ্ঞান লোচন স্বরূপ, চক্ষুহীন জনের দর্পণে কি প্রয়োজন? সর্ব্ব শাস্ত্র পাঠ করিয়া দেখিলাম জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ পদার্থ।" বৃদ্ধের রঙ্গ দেখিয়া হরিদাস কেবল হাসিতেন আর কিছু বলিতেন না।

কিছু দিবস পরে এক দিন চৈতন্য দেব নগরে বিচরণ করিতে করিতে নিতাইকে বলিলেন, চল আমরা শান্তিপুর যাই। যে ইচ্ছা সেই কার্য্য, অমনি দুই জনে গঙ্গা পার হইয়া শান্তিপুরে চলিলেন। পথিমধ্যে ললিত

পুর নামক কোন গ্রামে গঙ্গার তটে কুটীরমধ্যে এক সন্ন্যাসী বাস করিত, ভ্রাতৃদ্বয় তৃষ্ণায় এবং পথশ্রান্তিতে কাতর হইয়া তাহার নিকট গিয়া উঠিলেন। গৌর সেই সন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, তোমার ধন বংশ বিদ্যা লাভ হউক, বিবাহ হউক! আশীর্ব্বাদ শুনিয়া শচীনন্দন বলিলেন, গোসাঞী! এ কি প্রকার আশীর্ব্বাদ? বল যে ভগবানের চরণে ভক্তি হউক। সন্ন্যাসী দুঃখিত হইয়া বলিল, হে ব্রাহ্মণতনয়! আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, তুমি কোথায় কৃতজ্ঞ হইবে, না আবার নিন্দা করিতেছ? পৃথিবীতে জন্মিয়া যে ব্যক্তি বিলাস সুখ ধন ঐশ্বর্য্য উত্তম কামিনীর সহবাস ভোগ না করিল তাহার জীবনই বৃথা। ইহাতে কি তুমি লজ্জা পাইতেছ? তোমার বিষ্ণুভক্তি থাকিলই বা? যদি অর্থ না থাকে তবে কি খাইয়া বাঁচিবে? গৌর শুনিয়া হাসিয়া সন্ন্যাসীকে বলিলেন, দেখ, যাহার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে, ভক্তিই সার, তদ্ব্যতীত যত কিছু সকলই মিথ্যা, অসার। জীবের চিত্ত বিষয়সুখে বড় সন্তুষ্ট হয়; তাই শাস্ত্র এবং ধর্ম্মসাধন প্রণালী এইরূপ নিকৃষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। সন্ন্যাসী এ কথা শুনিয়া মনে করিল, সঙ্গের এই অবধূত যুবাটিকে কি মন্ত্র দিয়া পাগল করিয়াছে। নিতাই তাহাকে বলিলেন, মহাশয়! ছেলে মানুষের সঙ্গে আর বিচারে কাজ নাই, আমি আপনাকে চিনিয়াছি। তখন সে সন্তুষ্ট হইয়া অতিথিদ্বয়কে ফল মূল দুগ্ধ আহার করিতে দিল। পরে ইঙ্গিত করিয়া নিতাইকে বলিতেছে, তোমার এ সব চলে কি? আইস আনন্দ করা যাউক। নিত্যানন্দ অনেক তীর্থ, অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, বামাচারী মদ্যপায়ী সন্ন্যাসীর ভাব গতি সব বুঝিতেন। পুনঃ পুনঃ আনন্দ কর, আনন্দ কর বলিতে লাগিল, শুনিয়া চৈতন্য অবধূতকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষ যখন বুঝিলেন যে সন্ন্যাসী মদ্য খাইতে অনুরোধ করিতেছে, তখন তিনি বিষ্ণু! বিষ্ণু! বলিয়া কাণে হাত দিলেন এবং তদ্দণ্ডে আচমন করিয়া দুই জনে গম্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। সন্ন্যাসী কেবল মদ্যপায়ী নহেন, তাঁহার কুটীরে একটী স্ত্রীলোকও দেখা গিয়াছিল। কথিত আছে এই স্থান হইতে গৌর নিতাই গঙ্গার জলে ভাসিতে ভাসিতে শান্তিপুরের ঘাটে গিয়া উঠেন।

গৌর নিতাই অদ্বৈতভবনে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বৃদ্ধ আচার্য্য জ্ঞানমাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন আর ঢুলিতেছেন। ইহা দেখিয়াই চৈতন্যের

মন মহাক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আচার্য্যকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি জ্ঞান বড়, কি ভক্তি বড়? গৌরকে রাগাইয়া মার খাইবার ইচ্ছাতেই অদ্বৈত এই চাতুরী খেলিয়াছিলেন; তিনি উত্তর দিলেন, জ্ঞানই সর্ব্বকালে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান বিনা ভক্তিতে কি হয়? শচীনন্দন যাই এই কথা শুনিলেন অমনি ঘরের দাওয়া হইতে বৃদ্ধকে নামাইয়া উঠানে ফেলিয়া দমাদম কিল্ মারিতে লাগিলেন। ভক্তিব প্রতি কণামাত্র অনাস্থা দেখিলে তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেন। একান্ত নির্ভর আত্মত্যাগ তাঁহার ধর্ম্ম ছিল, তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র জ্ঞানাভিমান, সাধন ভজন তপস্যাগত তমঃ স্থান পাইত না। এই জন্য বৃদ্ধকে প্রহার করেন। সীতাঠাকুরাণী দেখিলেন ঘোব বিপদ উপস্থিত, আস্তে ব্যস্তে আসিয়া বলিলেন, আরে কর কি! কর কি! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাখ রাখ! যদি কিছু ভাল মন্দ হয় তোমার ঘাড়েই সব ঝোঁক পড়িবে। কেইবা তাঁহার কথা শুনে, গৌরচন্দ্র মহা তর্জ্জন গর্জ্জন ও প্রহার আরম্ভ করিলেন। রঙ্গ দেখিয়া নিতাই হাসেন, হরিদাস ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করেন, এ দিকে বৃদ্ধ কৃতার্থ হইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন। প্রহার সমাপ্ত হইলে অদ্বৈত বলিলেন, তুমি ভালই করিলে, যেমন অপরাধ করিয়াছিলাম তেমনি শাস্তি পাইলাম। ইহাতেই আমার আনন্দ। এখন কোথা গেল তোমার সে স্তব স্তুতি? এই কথা বলেন, আর নানা অঙ্গভঙ্গীর সহিত হাসে তালি দিয়া উঠনময় নাচিয়া বেড়ান। অতঃপর বিশ্বম্ভরকে কহিলেন, শাস্তিত দিলে, এখন পদছায়া দাও, তোমার পাতের উচ্ছিষ্ট আমার প্রাপ্য। এই বলিয়া তিনি গৌরচন্দ্রের চরণে মস্তক রক্ষা করিলেন। তখন চৈতন্য সসম্ভ্রমে উঠিয়া বৃদ্ধকে কোলে লইলেন, চারি দিকে ক্রন্দনেব রোল উঠিল, প্রেমের নদী বহিতে লাগিল, নিতাই হবিদাস অদ্বৈতের পরিবার পুত্র দাস দাসী সকলে কাঁদিয়া একেবারে অস্থির হইল। দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বম্ভর কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। বৃদ্ধের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া অঙ্গীকার করিলেন, তোমার অনুরোধে আমি শত অপরাধে অপরাধীকেও ক্ষমা করিব। তখন অদ্বৈতের আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। প্রেম ভক্তির বিচিত্রতা কে বুঝিবে। ভক্তের দাস হইবার জন্য কতই আগ্রহ! অদ্বৈত বলিলেন, তোমাকে লঙ্ঘন করিয়া যে আমাকে ভক্তি করিবে, সে বিনষ্ট হইবে। যে তোমার দাস না হয় সে আমার কথন প্রিয় হইতে পারিবে না। চৈতন্য বলিলেন, যাহারা আমার

স্বগণদিগকে ভাল না বাসিয়া আমাকে ভাল বাসিতে আসিবে তাহাদিগকে আমি গ্রাহ্য করিব না।

কত ক্ষণ পরে গৌর হাস্যমুখে বলিলেন, আমি কি আজ কিছু চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়াছি? বৃদ্ধ বলিলেন, না, এমন কিছু নয়! নিত্যানন্দকে গৌর বলিলেন, যদি আমার কিছু চাঞ্চল্য দেখিয়া থাক, ক্ষমা করিতে হইবে; ইহাতে হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। পরে অদ্বৈতের গৃহিণীকে তিনি বলিলেন, শীঘ্র গিয়া রন্ধনের আয়োজন কর। সুরাপায়ী মাতালদিগের সঙ্গে ইহাদের ব্যবহার আচরণের অনেক মিল আছে। তদনন্তর চারি জনে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে সীতাদেবী দ্বারদেশে হরিদাসকে এবং ঘরের ভিতরে তিন জনকে বসাইয়া আহার করাইলেন। নিতাই সে দিন ঘরের মধ্যে ভাত ছড়াছড়ি করিয়া বৃদ্ধকে বড় বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বৃদ্ধ কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক প্রশংসার ছলে অনেক নিন্দা করিলেন, ঠাট্টা তামাসা, ফষ্টি নষ্টি অনেক হইল, শেষ দুই জনে কোলাকোলি আলিঙ্গন। এই দুই জনের মধ্যে প্রেমের কন্দল প্রায়ই হইত। অবোধ বৈষ্ণবেরা তাহা বিদ্বেষ বিবাদ মনে করিত। বস্তুতঃ ইহা ভক্তদিগের বাল্য লীলা খেলা ভিন্ন আর অন্য কিছু নহে। কয়েক দিবস পরে চারি জনে আনন্দ করিতে করিতে পুনরায় নবদ্বীপে ভক্তসমাজে আসিয়া উপস্থিত হন।

# পাপের শাসন।

মাতাল দুরাচারীদিগের প্রতি চৈতন্যের বড় দয়া ছিল। এক দিন মদ্যপায়ীদিগের পল্লীর ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে সুরার আঘ্রাণ পাইয়া তিনি শ্রীবাসকে বলিলেন, আমি উহাদের বাড়ীতে যাইব। শ্রীবাস বলিলেন, তাহা হইলে আমি জলে ডুবিয়া মরিব, এমন কর্ম্ম কখন তুমি করিতে পাইবে না। সুরাসক্ত ব্রাহ্মণগণ নিকটে আসিয়া কেহ বলে, নিমাই পণ্ডিত, তোমার নাচ গান আমাদের বেশ ভাল লাগে। কেহ হাতে তালি দিয়া হরি বলিয়া নাচে, কেহ বা সঙ্গে সঙ্গে আসে; সে দিন গৌরকে পাইয়া তাহাদের বড় আমোদ বোধ হইয়াছিল। মদ্যপায়িগণের রঙ্গ ভঙ্গী দেখিয়া গৌর

হাসিতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে তাই বুঝি এত আকর্ষণ!

সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালে দেবানন্দ নামে এক পণ্ডিত থাকিতেন। তিনি এক জন জ্ঞানী শান্তচিত্ত শুদ্ধস্বভাব মোক্ষাভিলাষী, আজন্ম উদাসীন্। তাঁহার ভক্তি ছিল না, অথচ তিনি ভাগবত পাঠ করিতেন; সুতরাং তাহার ভাবার্থ বোধগম্য হইত না। চৈতন্য এক দিন এই বিপ্রের ভাগবত পাঠ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভাগবতের ন্যায় পীযূষপরিপূরিত গ্রন্থ কঠোর মায়াবাদীর হস্তে কলঙ্কিত হইবে, ইহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য। ভাগবত তাঁহার পরম আদরের ধন ছিল, সর্ব্বদা তিনি তাহার শ্লোক আবৃত্তি করিতেন এবং অপর ভক্তমুখে তাহা শুনিতেন। কিছু দিন পরে পথে দেখা পাইয়া দেবানন্দকে তিনি বড় ভর্ৎসনা করেন। তাহার কারণ এই যে, অনেক দিন পূর্ব্বে একবার শ্রীবাস এই ব্রাহ্মণের নিকট ভাগবত শুনিতে যান। শ্রীবাস ভক্তিপথের লোক; সুতরাং রসময়ী ভাগবতকথা শুনিয়া তিনি ভাবে মগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, ভাবাবেশে তাঁহার চিত্ত বিহ্বল হইল। চিরকৌমার্য্যব্রতধারী দেবানন্দ ভাগবত পড়েন কেবল ঐ পর্য্যন্ত, কখন ভাবও হয় না, এ প্রকার ভাবাবেশ কখন কাহারো হইতে দেখেনও নাই; শ্রীবাসের ঘন ঘন নিশ্বাস ও ক্রন্দনের শব্দে পাঠের ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল, কেহ কিছু শুনিতে পায় না দেখিয়া দেবানন্দের ছাত্রগণ মহা বিরক্ত হইল। পরিশেষে শ্রীবাসকে ধরাধরি করিয়া সকলে দূরে ফেলিয়া আসিল। দেবানন্দও কিছু নিষেধ করিলেন না। ক্ষণকাল পরে শ্রীবাস চেতনা পাইয়া অতিশয় ব্যথিত হন। এই ব্যাপার চৈতন্য জানিতেন, তজ্জন্য দেবানন্দকে অনেক তিরস্কার করিলেন। সে ব্রাহ্মণ আর না রাম, না গঙ্গা, মলিন মুখে অধোবদনে আপনার আশ্রমাভিমুখে চলিয়া গেল। চৈতন্য যাহা বলিলেন সে কথা ভুলিবার নহে, দেবানন্দের মন তাহাতে আন্দোলিত হইতে লাগিল, তিনি লজ্জিত হইলেন। লজ্জার বিষয়ও বটে। কত সাধ্য সাধনা করিয়া একটু ভক্তির ভাব কত লোকে পায় না, তাহার প্রতি এত অবহেলা! দেবানন্দ অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। কিছু দিন পরে এক জন বৈষ্ণবের সাহায্যে তিনি চৈতন্যের প্রসাদ প্রাপ্ত হন।

কোন সাধুকে কেহ অপমান করিলে চৈতন্য তাহাকে সহজে ছাড়িতেন

না। দুর্ব্বাসা ঋষি যেমন রাজর্ষি অম্বরীষকে বিনা অপরাধে অভিসম্পাত করিয়া শেষ মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হন, সুদর্শন চক্রের ভয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়েন, শেষ ভগবানের আদেশে অম্বরীষের আশীর্ব্বাদ প্রসন্নতার ভিখারী হইয়া বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পান ; বিশ্বম্ভর ঠিক অনেকের সম্বন্ধে এই প্রণালী অবলম্বন করিতেন। যাঁহার নিকট অপরাধ তাঁহাকে প্রসন্ন না করিয়া যদি মহা যাগ যজ্ঞ তপস্যা কর ঈশ্বর তাহা গ্রাহ্য করিবেন না, এ কথা তিনি নিজমুখে দুর্ব্বাসাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, চৈতন্য শচীর প্রতিও এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইলে কিছু দিন পরে বিশ্বম্ভরও অদ্বৈতের নিকট যখন যাতায়াত করিতেন, গৃহধর্ম্মে মন দিতেন না, স্ত্রীর নিকট থাকিতেন না, তখন শচী বিরক্ত হইয়া অদ্বৈতকে কটু কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কার ছিল যে, ঐ বৃদ্ধই আমার সন্তান দুইটিকে গৃহত্যাগী করিয়াছে। স্ত্রীজাতি সহজে উতলা, মনের দুঃখে অদ্বৈতকে তিনি অনেক কুকথা বলিয়া ফেলেন। এ জন্য গৌর মাতাকে দিয়া আবার অদ্বৈতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করান। এই উপলক্ষে বৈষ্ণবাপরাধ ভঞ্জন সকলকে তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন। সকলকেই তিনি প্রেমযোগ শিক্ষা দিয়া যখন স্বীয় জননীর প্রতি তদ্বিষয়ে উদাসীন রহিলেন, তখন শ্রীবাস ঠাকুর বহু বিনয় সহকারে এ বিষয়ে অনেক অনুরোধ করেন। পরে শচীদেবী অদ্বৈতের পদধূলি লইয়া বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্ত হন।

শ্রীবাসের শাশুড়ীর মত আর একজন ব্রহ্মচারীরও একবার সেই দশা ঘটিয়াছিল। ইনি চৈতন্যের নৃত্য দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হন ; শ্রীবাসকে অনেক বলিয়া কহিয়া এক দিন তাঁহার গৃহে লুকাইয়া থাকেন। শ্রীবাস ভাবিলেন, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী ফলমূলাহারী শুদ্ধসত্ত্ব লোক, কীর্ত্তন শুনিবে ইহাতে বোধ হয় কোন দোষ নাই ; তাঁহাকে লুকাইয়া থাকিতে বলিলেন। সন্ধ্যা হইলে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, কিন্তু সে দিন ভাবের জমাট আর বাঁধে না ; ব্রহ্মচারী তথায় লুকাইয়া আছেন, শ্রীবাসকে তখন সে কথা বলিতে হইল। চৈতন্য বলিলেন, বাহির কর উহাকে ! কেবল পয়ঃপান করিলে হরিভক্তি হয় না। আত্মত্যাগী শরণাগত দাস ভিন্ন সে বস্তু কেহ পায় না। ব্রাহ্মণ হরিধ্বনি শুনিয়া এবং নৃত্য দর্শন করিয়া গলিয়া গিয়াছিল, শচীকুমারের অগ্নিময় উপদেশ বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ বাহির হইল, এবং তাঁহার ভৎর্সনা তাড়নাকে পাপের দণ্ডস্বরূপ মনে করিয়া লইল।

গৌরচন্দ্র ব্রাহ্মণের দীনতা দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে শেষ বলিলেন, তুমি তপস্যার অহঙ্কার করিও না, কিন্তু বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বোপরি মনে করিবে। ব্রহ্মচারী কৃতার্থ হইল, সাধু বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনির সহিত আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

এই সময় হরিসঙ্কীর্ত্তন প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের দেবপ্রভাব সমস্ত নবদ্বীপে বিস্তার হইয়া পড়ে। শচীর গৃহ প্রতিদিন শত শত নর নারী যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইতে লাগিল। বিবিধ উপহার পুষ্পমালা লইয়া মহাপ্রভুকে সকলে দেখিতে আসিত, এবং গোপনে আসিয়া রাত্রিকালে তাহারা কীর্ত্তন শুনিত। পাষণ্ডীদিগের দৌরাত্ম্যে গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের বহির্দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিতেন, ইহাতে অনেক ভক্তিপিপাসু নির্দ্দোষস্বভাব ব্যক্তিরাও বঞ্চিত হইত। সেই সমস্ত লোক চৈতন্যের গৃহে গিয়া উপদেশ শুনিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে স্নেহের সহিত এই শিক্ষা দিতেন যে, তোমরা সপরিবারে মহামন্ত্র হরিনাম জপ কর, ইহাতেই তোমাদের আশা পূর্ণ হইবে, সর্ব্বদা এই নাম লইবে, আর প্রতিবাসী দশ পাঁচ জনে স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া, দ্বারে বসিয়া করতালি দিয়া নিত্য হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।

## হরিভক্তির জয় ও নগরসঙ্কীর্ত্তন।

গৌরাঙ্গের আদেশানুসারে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নগরবাসিগণ মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ঘরে ঘরে হরিনাম আরম্ভ হইল। প্রেমিক নিমাই নিজেও কখন কখন গিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেন, আপনার গলার মালা খুলিয়া তাহাদের গলায় পরাইয়া দিতেন, বিনীত ভাবে দন্তে তৃণ করিয়া "ভাই সকল! সর্ব্বদা হরি হরি বল" এই বলিয়া অনুরাগভরে দ্বারে দ্বারে সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার উৎসাহ ব্যাকুলতা অনুরাগ দর্শনে নদীয়াবাসী লোক সকল মাতিয়া উঠিল। সন্ধ্যাকালে চারিদিকে বাদ্যনিনাদ, তৎসঙ্গে গভীর হরিধ্বনি, তাহা শুনিতেই এক আমোদ। প্রবল পবনসংযোগে হুতাশন যেমন সহস্র জিহ্বা বিস্তার করিয়া নিমেষের মধ্যে শত শত বাসগৃহ দগ্ধ করিয়া ফেলে, তেমনি দেখিতে দেখিতে গৌরের হরিপ্রেমানল হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল; এক

স্থানে নির্ব্বাণ করিতে গেলে আর দশ স্থানে ধূ ধূ করিয়া সে আগুন জ্বলিয়া উঠে। মহা দাবাগ্নির ন্যায় তাহা নানাদিকে অল্পকাল মধ্যে বিস্তার হইয়া পড়িল। এত দিন যে অগ্নি প্রচ্ছন্নভাবে কতকগুলি ভক্তের মধ্যে বদ্ধ ছিল, এক্ষণে তাহা নানা স্থানে দেখা যাইতে লাগিল। চৈতন্যের এই প্রভূত প্রভাব দর্শনে রাজপুরুষ ও প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ মহা প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারে না, অথচ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য গৌরব ইহাও সহ্য হয় না; ঘোর বিপদে পড়িল, হিংসা বিদ্বেষের আগুনে তাহারা দগ্ধ হইতে লাগিল।

যে যে পথে বৈষ্ণবগণ নৃত্য করিয়া নামকোলাহল করিতেন, এক দিন নগরের কাজি সেই পথ দিয়া যাইবার সময় সে সমস্ত শুনিতে পাইলেন। মহা কোলাহল রব শ্রবণে তিনি আস্ফালন করিতে করিতে তাহাদিগের পানে ধাবিত হইলেন; ভয়ে কে কোথায় পলাইয়া গেল, কেহ বা পদাতিকের হস্তে দুই চারি আঘাতও খাইল। কাজি তাহাদের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিলেন, এবং ভয় দেখাইয়া বলিয়া গেলেন, যদি পুনরায় এরূপ দেখি, তবে আমি তোমাদের জাতি নাশ করিব, ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইব, আজ ক্ষমা করিলাম। এ সময়ে সৈয়েদ হোসেন সাহা গৌড়ের সিংহাসনে বিরাজ করিতেন। তদনন্তর বিদ্বেষী দুষ্টমতি জন কতক লোক সঙ্গে লইয়া কাজি পথে পথে কয়েক দিন ভ্রমণ করেন, সুতরাং নগরবাসিগণ তাঁহাদের ভয়ে লুকাইয়া থাকে। দুর্ব্বলচিত্ত নবানুরাগী বৈষ্ণবগণ প্রকাশ্যে আর বড় কিছু করিতে পারে না। তখন পরিণামদর্শী ভীরু স্বভাব অল্পবিশ্বাসী ও বিরোধী ব্যক্তিরা বলিতে লাগিল, হরিনাম লইবে মনে মনে লও, পথের মাঝে গণ্ডগোল চীৎকার না করিলে কি হয় না? কোন্ পুরাণে এমন কথা আছে? বেদবাক্য লঙ্ঘন করিলে এইরূপ শাস্তি হয়। ইহাদের জাতি যাইবে বলিয়াও কি ভয় নাই? এবার নিমাই পণ্ডিতের অহঙ্কার চূর্ণ হইবে। নিত্যানন্দ যে করিয়া বেড়ান, কোন্ দিন বা তাঁহার প্রাণ যায় দেখ। ভক্ত বৈষ্ণবগণ এ সব কথার আর কোন উত্তর দিতে পারে না, আতঙ্কে সকলে জড়সড় হইল। চৈতন্য সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন, ভীরু নিপীড়িত হরিভক্তেরা তাঁহাকে দুঃখের বিবরণ সকল জানাইল। তখন নবাবি আমল, যেখানে যে কর্ম্মচারী থাকিত, সেইখানে তাহার একাধিপত্য ছিল। ব্রাহ্মণ এবং সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত লোকেরা চৈতন্যের বিরোধী, অধিকন্তু কাজিও বিরোধী হইয়া উঠিল। কিন্তু চৈতন্য কিছুতেই

ভীত বা নিরুদ্যম হইবার লোক নহেন; বিরুদ্ধাচার শুনিয়া তাঁহার উৎসাহাগ্নি আরও জ্বলিয়া উঠিল; সকলকে আজ্ঞা দিলেন, অদ্য সন্ধ্যাকালে নগরের পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন হইবে। এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ মহা আনন্দে পুলকিত হইলেন। স্নান আহার বন্ধ হইয়া গেল, উৎসাহের সহিত সকলে কীর্ত্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এই প্রথম নগরসঙ্কীর্ত্তন, অতি সমারোহের সহিত ইহা সম্পন্ন হইয়াছিল। এ প্রকার সঙ্কীর্ত্তন প্রণালী গৌরাঙ্গদেবই প্রথমে প্রচলিত করেন। পথে কীর্ত্তন বাহির হইবে, ভক্তগণ সঙ্গে লইয়া বিশ্বম্ভর নৃত্য করিবেন, এই সংবাদ পাইয়া নগরবাসী নরনারী বালক বালিকা যুবা বৃদ্ধের মন যেন একবারে মাতিয়া উঠিল। অধিবাসীদিগের চিত্ত মহা কৌতূহলাক্রান্ত হইল। চৈতন্য পূর্ব্ব হইতেই কে কোন্ দলে নাচিবে, কে কাহার সঙ্গে গাইবে সমস্ত ঠিক করিয়া দিলেন। সর্ব্বাগ্রে আচার্য্য গোসঞী নৃত্য করিবেন তাঁহার সঙ্গে এক দল গায়ক থাকিবে। দ্বিতীয় দলে হরিদাস নাচিবেন তাঁহার সঙ্গে আর এক দল লোক কীর্ত্তন গাইবে। তৃতীয় দলে শ্রীবাস পণ্ডিত অন্য এক দল গায়কের সহিত নাচিবেন। এইরূপ স্থির হইল। নিত্যানন্দের পানে চাহিবা মাত্র তিনি বলিলেন, প্রভু, আমি একাকী নৃত্য করিতে পারিব না, তোমার সঙ্গে থাকিব। গৌর তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া আপনার নিকটে রাখিলেন। তদনন্তর গোধূলি সময়ে শত সহস্র লোক একত্রিত হইয়া মশাল জ্বালিল। প্রত্যেকের হস্তেই এক একটি আলোক, তাহাতে চতুর্দ্দিক দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল; এবং মৃদঙ্গ করতাল সহ গম্ভীর হরিধ্বনি গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। সকলে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন এমত কালে গৌরসিংহ ভীম গর্জ্জনে হরিনামের হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। সেই ভীষণ ধ্বনি তড়িতের ন্যায় সকলের অন্তরে প্রবিষ্ট হইল। সেনাপতির আদেশে সৈন্যগণ যেমন রণক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ সকলে উৎসাহ উদ্যমে মাতিয়া উঠিল। পশুরাজ সিংহের ঘোর গর্জ্জনে শৈলকন্দর যেরূপ প্রতিধ্বনিত হয়, চৈতন্যের শ্রীমুখবিনিঃসৃত সেই হরিধ্বনিতে তেমনি ভক্তবৃন্দের চিত্তগুহায় প্রতিধ্বনির তরঙ্গ উঠিল। এইরূপে ভক্তগণ সমরকুশল মহাপরাক্রমশালী বীরের ন্যায় বিজয়নিশান হস্তে লইয়া দলে দলে হরিনাম গান করিতে করিতে রাজপথে বহির্গত হইলেন। তাঁহাদের গলে পুষ্পমালা, বক্ষে ও ললাটে চন্দনরেখা,

এবং দেবতুল্য অঙ্গশোভা দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন ধরাতলে শত শত তারকা উদিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে পূর্ণশশধরের ন্যায় গৌরসুন্দর কনকবিনিন্দিত ভুজযুগল উত্তোলন করিয়া মৃদু মন্দ গমনে হাস্য মুখে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার প্রফুল্লকমলসদৃশ প্রেমবিকসিত মুখমণ্ডলে মধুর হাস্যদ্যুতি নিরন্তর শোভা পাইতেছিল; এবং সন্তপ্ত হৃদয় অনাথ দীনজনের মস্তক রাখিবার স্থল তাঁহার সেই সুশীতল বিশাল বক্ষ অগুরুচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া যেন পাপভারাক্রান্ত জীবদিগকে সস্নেহে নিমন্ত্রণ করিতেছিল। কি অপরূপ সে লাবণ্য! প্রিয়তম গৌরচন্দ্রের সুকোমল হস্ত যাহার দেহকে একবার স্পর্শ করিয়াছে তাহার ভবযন্ত্রণা তিরোহিত হইয়াছে। তাঁহার কণ্ঠে সুবাসিত মালতীকুসুমমালা দোদুল্যমান, স্কন্ধে রজতোজ্জ্বল শুভ্র যজ্ঞসূত্র, সুদীর্ঘ স্থূল কোমলাঙ্গ প্রশস্ত ললাট দর্শনমাত্র হৃদয়সিন্ধু মহাবেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তাঁহার সেই কমলনয়নের অবিরল প্রেমধারা, হরিনামের বিশাল ঘন গর্জ্জন, মনোহর পাদবিক্ষেপ, সমীরণবিতাড়িত সুন্দর অলকদাম, তেজোময় দেহকান্তি; অদ্বৈত হরিদাসাদি প্রমত্ত ভক্তগণের উন্মাদবৎ নৃত্য; পারিষদগণের উল্লাসকর গভীর স্বরলহরী কালের আবরণ ভেদ করিয়া যেন এখনও পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছে। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব নগরসঙ্কীর্ত্তনের মনোহর বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত, নয়ন বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হয়। এইরূপে গৌরচন্দ্র যখন সহস্র সহস্র লোক সমভিব্যাহারে হরিনামসুধা বিতরণ করিতে করিতে চলিলেন, তখন বোধ হইল যেন স্বর্গের দেবতাগণ মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে যে স্থান দিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন সেখানকার লোকদিগের বুকের উপর দিয়া প্রবলবেগে একটী বান ডাকিয়া গেল, মেদিনী কাঁপিতে লাগিল। অদ্বৈত, হরিদাস, শ্রীবাস তিন দলের অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন; সকলের পশ্চাতে চৈতন্যদেব, তাঁহার এক দিকে নিত্যানন্দ অপর দিকে গদাধর। ইচ্ছা হয় জলদক্ষরে সেই রূপের বিচিত্র ছবি চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া অনিমেষ নয়নে দর্শন করি; এবং তদ্দ্বারা হৃদয়ের ক্ষোভ নিবৃত্ত করি। কিন্তু তাহার প্রকৃত ছবি মনে আসিলে চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, জীবনের গতি স্থগিত হয়; অনুভব করিলে লিখিতে পারি না, লিখিতে গেলে সে শোভা অন্তর্হিত হয়।

দিক্ আলোকময় করিয়া সুগম্ভীর নাদে হরিগুণ গান করিতে করিতে গঙ্গার স্রোতের ন্যায় রাজপথ বহিয়া সকলে চলিলেন। ভক্তগণের পদসঞ্চালনে রাশি রাশি ধূলি উড্ডীন হইয়া নভমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল, নারীগণ মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল। সকলের মুখেই হরিনাম। যে কখন কোন কালে গান করে নাই সেও গান করিতেছে। উৎসাহে যেন অগ্নি বৃষ্টি হইতেছে। কীর্ত্তনে কীর্ত্তনে প্রতিঘাত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনির তরঙ্গ উঠিল। প্রজ্বলিত ভাবাবেশে উন্মত্ত ভক্তচূড়ামণি গৌরচন্দ্র পথিমধ্যে কথন ধূলিধূষরিত হইয়া তদুপরি অজস্র প্রেমবারি বর্ষণ করিতেছেন, কখন পুলকে কদম্বাকৃতি হইয়া মূর্চ্ছিত হইতেছেন, কখন প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক বল হরি! বল হরি! বলিয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিতেছেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া সহজ মানুষ পাগল হইয়া যায়। সে নৃত্য সে কীর্ত্তন সে উৎসাহ যাহারা একবার দেখিল তাহাদের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ তিন দল হইতে শত শত দল প্রস্তুত হইল; কে কোথায় গায়, কে কোথায় নাচে, যেন একটা প্রকাণ্ড মেলা। সকলেই উন্মত্ত কেহ যে কাহারো গান শুনিবে সে পথ নাই, প্রত্যেকেই গাইতেছে। অতি ভয়ঙ্কর কোলাহলধ্বনি! এক্ষণকার সভ্য বাবুরা হইলে হয়ত বলিতেন, মস্তিষ্ক গলিয়া যাইবে চল পলায়ন করি। না হয় পাগলাগারদে ইহাদিগকে পাঠাইবার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু গৌরাঙ্গের নৃত্য কীর্ত্তনে সে দিন পাষণ্ড দলন হইয়াছিল। লম্পট দুরাচারীবা ধূলায় লুটাইতে লাগিল। কত লোক যে দেখিতে আসিয়াছিল তাহা গণিয়া ঠিক করা যায় না। তখন নবদ্বীপে বিস্তর লোকের বসতি ছিল। বিষ্ণুভক্তগণ আপনাদের গৃহদ্বার কদলীবৃক্ষ, পূর্ণকুম্ভ, আম্রশাখা, ও পুষ্পমালা দীপাদি দ্বারা শোভিত করিয়াছেন, এ সকল দেখিয়া ভক্তগণের উৎসাহানল ক্রমেই জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। এক এক জনের অগ্নিময় মূর্ত্তি অবলোকনে প্রাণ যেন কাঁপিয়া যায়। বৃদ্ধ অদ্বৈত সে দিন কত রঙ্গেই যে নাচিয়াছিলেন তাহা আর বলা যায় না।

ভক্তগণ এই ভাবে মত্ত হইয়া গঙ্গাপুলিনের পথে চলিলেন। ইহার ভিতর আবার চঞ্চলমতি বাহ্য উৎসাহী অনেক যুবা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাদের উৎসাহ যথেষ্ট বটে, কিন্তু তাহার গতি অন্য দিকে। কেহ পাষণ্ডীদিগকে ধরিতে যায়, কেহ তাহাদিগকে ভয় দেখায়, কেহ মাটিতে কিল মারে, দন্ত ঘর্ষণ করে, বিরোধীদিগের ঘরের চাল ধরিয়া টানে; উৎসা-

হের সঙ্গে তাহারা দয়া ভক্তি বিনয় যোগ করিতে পারে নাই। আবার অন্য দিকে প্রেমোন্মত্ত ভক্তগণ কেহ কাহারো স্কন্ধে উঠিতেছেন, কেহ কাহার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিতেছেন, কেহ গড়াগড়ি দিতেছেন, কেহ মুখে এবং বগলে বাদ্য বাজাইতেছেন, কেহ কোলাকোলি করিতেছেন, কেহ কাহার চরণে পড়িয়া কাঁদিতেছেন, কেহ গাছের ডাল ভাঙ্গিতেছেন; কেহ বলিতেছেন, আমি নিমাই পণ্ডিত, জগৎ উদ্ধার করিতে আসিয়াছি! যাহারা নিতান্ত উদ্ধতপ্রকৃতির যুবা তাহারা বলিতে লাগিল, সে কাজি ব্যাটা আজ কোথা? নানা ভাবের আবির্ভাব, সমস্ত লিখিয়া উঠা যায় না। ভক্তদিগের মত্ততা দর্শনে বিরোধী শাক্তগণ হিংসানলে পুড়িতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ বলে, এই সময় যদি কাজির লোক আসে তাহা হইলে বেশ মজা হয়! সব ব্যাটা পলায়। কেহ বলে আমি ভাই তাহা হইলে উহাদিগকে ধরিয়া দিব। কেহ বলে চল কাজিকে ডাকিয়া আনি, তবেই ইহারা সব পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া কে কোথায় সরিয়া পড়িবে। আর একজন বলিল না ভাই, তাহাতে কাজ নাই, মিথ্যা করিয়া বলি চল যে, ঐ কাজি আসিতেছে! ভাবুক বৈরাগীর দল তাহা হইলে এখনি শুনিয়া ভয়ে মরিবে। সে দিন কিসের বা ভয়, আর কাহার কথা কে বা শুনে, সমস্ত লোক হরিনামে একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছে। চৈতন্য আপনি কাঁদিয়া নয়নজলে সকলকে ভাসাইতেছেন। সে বেগ যে প্রতিরোধ করিতে পারে সে সামান্য পাষণ্ড নহে। গৌরের সেই প্রেমবিগলিত নেত্র, ঊর্দ্ধ বাহুযুগল, ভাবময়ী তনু, অপূর্ব্ব মুখশ্রী মনে হইলে এখনও আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হয়।

"তুয়ার চরণে মন লাগুহু রে শারঙ্গধর, তুয়ার চরণে মন লাগুহু রে" এই গান ধরিয়া গঙ্গার ধারের পথে যাইতে যাইতে জীবন্মুক্ত মাধাইয়ের ঘাটে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান হইয়া সকলে কীর্ত্তন করিলেন। তদনন্তর কাজির বাড়ীর পথে কীর্ত্তনের দল প্রবেশ করিল। দূর হইতে ভীষণ বাদ্যনাদ শ্রবণে কাজি তত্ত্ব জানিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। দূত কিছু দূর আসিয়া দেখিয়া ফিরিয়া গিয়া বলিল, "খোদাবন্দ! বড় বিষম ব্যাপার! লক্ষ লক্ষ লোকসঙ্গে নিমাই পণ্ডিত আসিতেছে, সে বামণকে দেখিলে ভয় হয়। সহস্র সহস্র মশাল জ্বলিতেছে, গান বাদ্যের শব্দে কাণ যেন খসিয়া পড়ে।" বলিতে বলিতে বন্যার স্রোতের ন্যায় চৈতন্যের সৈন্যদল কাজির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাজি স্বগণসহ ভয়ে প্রস্থান করিলেন। চঞ্চলমতি যুবক দল

মহা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা কি করিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। কেহ কাজির ঘর ভাঙ্গে, কেহ বাগান উজাড় করে, কেহ বাড়ীর মধ্যে যায়, কেহ হাঁক মারে; মহা তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করিল। অবোধ লোক সকল গৌরের আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারে না, তাহারা মনে করিল বুঝি তিনি কাজিকে প্রহার করিতেই আসিয়াছেন। তাঁহার বল ও প্রশ্রয় পাইয়া সকলে আপনাদের নষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগিল। কাজির লোক জন কতক কীর্ত্তনের দলে মিশিয়া কপটভাবে হরি হরি বলিয়া হাততালি দিতে লাগিল। যাহার দাড়ি ছিল সে মুখ নামাইয়া লুকাইয়া রহিল। বিস্তর লোক, ভয়ানক সমারোহ, কেই বা তাহাদিগকে চিনিয়া বাহির করিবে! উৎসাহে আপনাকেই আপনি সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল চিনিতে পারে নাই, অন্যকে আর তবে কিরূপে চিনিবে! তদনন্তর গৌর কাজিকে ডাকাইলেন। সে ব্যক্তি তখন ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। পরে দূর হইতে মাথা নোয়াইয়া নিকটে আসিয়া কাজি গৌরকে বলিল, তোমার নানা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে আমি চাচা বলিতাম, অতএব তুমি গ্রামসম্পর্কে আমার ভাগনা হও, এক্ষণে আমাব অপরাধ ক্ষমা কর। গৌরচন্দ্র তাঁহাকে সম্মান করিয়া বসাইয়া আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তোমার বাড়ীতে আমরা অতিথি হইলাম, আর তুমি লুকাইয়া রহিলে? এক্ষণে আমার দুইটী ভিক্ষা। দুগ্ধবতী গাভী মাতা, বৃষগণ পিতাস্বরূপ হইয়া শস্য উৎপাদন করে, ইহাদিগকে তোমরা আহার করিও না। আর নবদ্বীপের মধ্যে কীর্ত্তন যেন বন্ধ না হয়। কাজি বলিল, গোমাংস ভক্ষণ আমাদের ধর্ম্ম, সঙ্কীর্ত্তন সম্বন্ধে আমি বলিয়া দিয়াছি, আমার বংশে কেহ কখন উহার উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। তোমাদের হিন্দুরাই আমার নিকট আসিয়া অভিযোগ করিয়াছিল, আমার কিছু অপরাধ নাই। তাহারা আসিয়া বলিল, যে "নিমাই পণ্ডিতের কীর্ত্তনের জ্বালায় আমরা ঘুমাইতে পাই না। ইহারা হিন্দুধর্ম্ম মানে না, এরূপ কীর্ত্তন করা আমাদের কখন ধর্ম্ম নয়। ইত্যাদি অনেক প্রকার অভিযোগ করিয়াছিল, তাই আমি কীর্ত্তন বন্ধ করিতে বাধ্য হই।" কাজির সঙ্গে ক্ষণকাল ধর্ম্মালাপ করিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিতে করিতে বণিক্ তন্তবায়পল্লী ঘুরিয়া গাদিগাছা, পারডাঙ্গার ভিতর দিয়া দরিদ্র শ্রীধরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইয়াছিলেন, তথায় একটি ভগ্ন লৌহপাত্রে জল

ছিল, তাহাই পান করিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীধরের আর আনন্দের সীমা রহিল না। গরিব ব্রাহ্মণ একেবারে মোহিত হইয়া গেল। গৌর বলিলেন, অদ্য আমি শুদ্ধ হইলাম। তোমার জল পান করিয়া অদ্য হরিপদে আমার ভক্তি জন্মিল, আমি ধন্য হইলাম। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নযুগলে প্রেমধারা বহিতে লাগিল। সমস্ত ভক্তগণ শ্রোতৃবর্গ ভাবরসে ডুবিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সে দিন অজস্রধারে ভক্তিস্রোত বহিয়াছিল। পরে সেই ভগ্ন লৌহপানপাত্রে সকলেই জল পান করিলেন। শ্রীধর কৃতার্থ হইয়া গেলেন, তাঁহার দুই চক্ষে জল ঝরিতে লাগিল। শ্রীধরের উঠানে নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন করিয়া নানা স্থান ঘুরিয়া ভক্তগণ নগরকীর্ত্তন সমাপ্ত করেন। মনুষ্য যে কি বস্তু তাহা এই মানুষরতন গৌরকে দেখিলে কতক চিনিতে পারা যায়। আহা! যে জীবনে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয় তাহা কি সামান্য পদার্থ? ভগবান্ এই সকল ব্যক্তিকে ধরাতলে পাঠাইয়া বলিয়া দেন যে, মনুষ্যকে এইরূপ হইতে হইবে, এবং ইহা মানবজীবনের আদর্শ। কি চমৎকার সুখের সাধুসঙ্গই ছিল! গৌরসহবাসের পবিত্র বায়ু অঙ্গে লাগিলে প্রাণ পুলকিত এবং উদাস হইত। এমন এক আশ্চর্য্য আকর্ষণী শক্তি তিনি পাইয়াছিলেন যে, তাহাতে লোকগুলকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। ধন্য শ্রীগৌরাঙ্গ! তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

এক দিকে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের যেমন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, চৈতন্যের ভক্তি প্রমত্ততা তেমনি বাড়িয়া চলিল; তিনি ভক্তিরসময় হইয়া সাধু মহাত্মাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন, হরিনাম শুনিলেই অমনি নাচিয়া উঠিতেন। দিন রাত্রি বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে বাস, বাড়ীতে কেবল জননীর অনুরোধে নাম মাত্র এক একবার আসিতেন। ক্রমশঃ প্রেম ঘনীভূত হইয়া তাঁহাকে এমনি মত্ত করিতে লাগিল যে, উপহাসচ্ছলে পথে ঘাটে দুষ্ট বালকগণ হরি বলিয়া হাততালি দিয়া তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিত! এক দিন কয়েকটি বালক গঙ্গাস্নানের পথের মধ্যে এইরূপ করাতে তিনি হতচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, শচী তাহা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিতা হন।

শেষ যেন তিনি পাগলের মত কথাবার্ত্তা কহিতেন। স্বয়ং কৃষ্ণকেও চোর দস্যু বলিয়া গালি দিতেন! কখন গোপী গোপী, কখন মথুরা বৃন্দাবন ইত্যাদি বাক্য পুনঃ পুনঃ জপ করিতেন। দিনকে রাত্রি, রাত্রিকে দিন বলিয়া ভ্রম হইত। ভক্তির আবেশে ভক্তের হৃদয়ের ভাব কখন কি প্রকার হয়

কীর্ত্তনে কোন ব্যাঘাত জন্মে এই জন্য তিনি পরিবারস্থ সকলের ক্রন্দন নিবারণ করিয়া আপনি কীর্ত্তনে যোগ দিলেন, দুঃসহ পুত্রশোক সংবরণপূর্ব্বক হরিনাম গানে নিমগ্ন রহিলেন। ক্ষণকাল পরে কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে গৌর-সুন্দর এ সমুদায় কথা শুনিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কি! আমার অনুরোধে শ্রীবাস পুত্রশোক সংবরণ করিল? হায়! আমি এমন বন্ধুসহবাস কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিব? এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। "ত্যাগ" শব্দ শুনিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মনে সন্দেহ হইল, তবে বুঝি গোসাঞী গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হই-বেন। তদনন্তর ক্রন্দন ক্ষান্ত হইলে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া সকলে মিলে গঙ্গাতীরে চলিলেন। গৌরচন্দ্রও সঙ্গে গিয়াছিলেন। পরে তিনি শ্রীবাসকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, তুমি খেদ করিও না, আমাকে এবং নিত্যানন্দকে তুমি আপনার পুত্র বলিয়া জানিবে। চৈতন্যের প্রগাঢ় সহানুভূতির এই সুমিষ্ট বাক্যে শ্রীবাসের শোক দুঃখ বৈরাগ্য প্রেমে পরিণত হইল, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও পরিবার সকলেই ইহাতে সান্ত্বনা লাভ করিলেন। গৌর নিতাই যাহার নিকট পুত্রত্ব স্বীকার করেন, তাহার আর কি সামান্য সন্তানের জন্য শোক মোহ উপস্থিত হয়? শ্রীগৌরাঙ্গের এই সান্ত্বনা বচন কি মধুময়! শ্রীবাসভবনে ভক্তদলের মধ্যে যখন কীর্ত্তনের খুব মাতামাতি, তখন এক জন যবন দর্জি তথায় বস্ত্র সেলাই করিতে আসিত। কথিত আছে, যে চৈতন্যের প্রেমভক্তি দেখিয়া সে যবন বিহ্বল হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল।

## সন্ন্যাস ব্রতগ্রহণ।

অল্প দিন পরেই বিশ্বম্ভরের জীবনপ্রবাহ আর একটি নূতন পন্থা অবলম্ব-নের জন্য উৎসুক হইল। সংসারে পরিবারমধ্যে এরূপে অবস্থিতি করিলে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না, জীবের দুর্গতি ঘুচিবে না, লোকের স্বভাব চরিত্র দেখিয়া তৎকালে ইহা তিনি মনে মনে বোধ হয় যথেষ্ট আন্দোলন

করিতেছিলেন; আভাসে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল। যদিও স্পষ্ট কিছু বলেন নাই, কিন্তু ভিতরে প্রভূত আন্দোলন চলিতেছে, ইহা বাহ্য লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি গৃহস্থাশ্রমে আছেন বলিয়া যদি লোকে এই সুমিষ্ট ভক্তির ধর্ম্ম গ্রহণে বীতরাগ প্রকাশ করে, এবং সন্ন্যাসী হইলেই জীবের মুক্তির পথ যদি পরিষ্কার হয়, তবে তাহাদের মঙ্গলের অনুরোধে সেই পথই অবলম্বনীয়; এই ভাব এবং হরিপদে একান্ত আত্মসমর্পণের ইচ্ছা তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী দণ্ডধারী করে। এই উপলক্ষে পারিষদবর্গকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়াও বোধ হয় অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। নিতান্ত শোকাবহ ব্যাপার বলিয়া সহসা সে সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন নাই, কিন্তু দিন দিন তাঁহার চিত্ত ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। কখন গোপী গোপী জপ করিতেন, কখন কৃষ্ণকে চোর দস্যু বলিয়া তিরস্কার করিতেন; এ সকল প্রেমবিকার আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

নবদ্বীপের অধ্যাপক ও টোলের ছাত্রগণ তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা দিত। জ্ঞান ধর্ম্মের উচ্চাসনে বসিয়া যাহারা সাধারণ জনসমাজকে পরিচালিত করে, তাহাদের কপট ধর্ম্মভাব, কঠোরতা, অবিশ্বাস, অভক্তি, দেবাবমাননা দেখিলে প্রকৃত বিশ্বাসী ও কোমলহৃদয় ভক্ত মহাপুরুষদিগের মনে যেরূপ ক্লেশ দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে চৈতন্যের তাহা যথেষ্ট হইয়াছিল। ধর্ম্মযাজক শাস্ত্রী আচার্য্য গুরুদিগের দুর্ব্ব্যহার দর্শনে একেবারে তিনি নিরাশ হইয়াছিলেন। তাহারা নিজেও ভাল হইবে না, অন্যকেও ভাল হইতে দিবে না, অথচ ধর্ম্ম জ্ঞান শাস্ত্র বিধি লইয়া লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, ইহা কি ভক্তিরসময় গৌরাঙ্গের কোমল প্রাণ সহ্য করিতে পারে? এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তিনি দেশত্যাগ করিলেন। সন্ন্যাসী হওয়ার পর অনেক বিরোধীও তাঁহার মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল। এই সময় কেশব ভারতী এক দিন নবদ্বীপে আসেন, বিশ্বম্ভর তাঁহাকে আপনার আলয়ে লইয়া গিয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের কোন কথা গোপনে তাঁহার সঙ্গে হইয়াছিল কি না তাহা অপর কেহ জানিতে পারে নাই। সেই উন্মত্ত প্রেমাবস্থায় চৈতন্য এক দিন বিষ্ণুপূজা করিতে যান, এমনি অন্তরের বিরহ ব্যাকুলতা, এবং ভাবের প্রচুরতা যে, নয়নজলে তাঁহার পরিধেয় বসন ভিজিয়া গেল। তিন বার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন, তিন বারই যেন স্নান করিয়া

উঠিলেন; শেষ পরাস্ত হইয়া গদাধরকে বলিলেন, আজ তুমি পূজা কর, আমার ভাগ্যে আর ঘটিল না।

একদা প্রেমবিকারে উন্মাদপ্রায় হইয়া গৌর বিশ্বম্ভর "গোপী" "গোপী" এই নাম জপ করিতেছেন। নিকটে এক জন টোলের ছাত্র বসিয়াছিল, ভক্তের বিচিত্র ভাব সে কি বুঝিবে? বলিল, হে নিমাই পণ্ডিত! তুমি গোপী গোপী কেন বলিতেছ, কৃষ্ণনাম কেন বল না? কৃষ্ণনাম লইলে পুণ্য হয়, তাহাই বল। টোলের ছাত্রেরা কি ধাতুর লোক তাহা চৈতন্য বিলক্ষণ জানিতেন। এ কথা শুনিয়া তিনি উত্তর কবিলেন, সেই দস্যু কৃষ্ণকে কে ভজে? তাহাকে ভজিলে কি হইবে? এই বলিয়া কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করত এক খণ্ড যষ্টি হস্তে লইয়া ছাত্রের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। ছাত্র ভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল, এবং ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দৌড়িতে দৌড়িতে অন্যান্য ছাত্রদিগের মধ্যে প্রবেশ রিয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিল, "ভাই, নিমাই পণ্ডিত এখনি মারিয়া ফেলিয়াছিল! সকলে ইহাকে সাধু সাধু বলে, আমি তাই দেখিতে গিয়াছিলাম, গিয়া দেখি যে সে গোপী গোপী জপ করিতেছে। আমি কৃষ্ণের নাম জপ করিতে বলিলাম, ইহাতে একবারে ক্রোধে অগ্নি অবতার হইয়া সে লাঠি লইয়া আমাকে মারিতে আসিল, কৃষ্ণের নামে কত কটু কথা বলিল, ভাগ্যগুণে আজ আমি বাঁচিয়া আসিয়াছি।" তাহার কথা শুনিয়া আর সকল ছাত্রগণ চৈতন্যকে গালি দিয়া নানা মতে নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ বলে কেন, আমরাও ব্রাহ্মণ তিনিও ব্রাহ্মণ, তবে এত ভয় কিসের জন্য? তাঁহাকে বৈষ্ণবই বা কিরূপে বলিব? তিনি বৈষ্ণব হইয়া ব্রাহ্মণকে মারিতে আসেন! আমরা এত সহিয়া থাকিব কেন? তিনিত আর রাজা নন? এস আমরাও সকলে ঠিক হইয়া থাকি, পুনরায় যদি তিনি মারিতে আসেন, আমরাও আর সহ্য করিব না। তিনি জগন্নাথ মিশ্রের সন্তান, আমরাও কিছু সামান্য লোকের ছেলে নই? সে দিন আমরা তাঁহার সঙ্গে একত্র লেখা পড়া শিখিলাম, আজ তিনি গোসাঞী কিরূপে হইলেন? এইরূপে তাহারা চৈতন্যকে অপমান তিরস্কার করিল।

কয়েক দিন পরে নিমাই হঠাৎ পারিষদ ভক্তবৃন্দকে বলিয়া উঠিলেন, "আমি কফ নিবারণের জন্য পিপুল চূর্ণ করিলাম, কিন্তু তাহাতে দেখিতেছি কফ আরও বৃদ্ধি হইল।" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করি-

লেন। এ কথার অর্থ কেহ বুঝিতে পারিল না, কেবল নিতাই মনে মনে বুঝিলেন, এবার প্রভু গৃহত্যাগ করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি দুঃখেতে অতিমাত্র বিষণ্ণ হইলেন। তদনন্তর চৈতন্য নিত্যানন্দের হস্তধারণপূর্ব্বক নিভৃতে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ নিতাই, আমি যাহা করিব ভাবিলাম, তাহার বিপরীত হইল। কোথায় আমি জীব উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিব, না তাহাদিগকে সংহার করিলাম! আমাকে দেখিয়া লোকের বন্ধন বিমোচন হইবে, তাহা না হইয়া আরও সুদৃঢ় হইল! হায়! আমাকে মারিতে চাহিয়া তাহারা মহা পাপে পড়িয়া গেল। আর আমার গৃহাশ্রমে থাকা উচিত হয় না, শীঘ্রই আমি সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিব। তাহা হইলে গৃহী বলিয়া আর আমাকে তাহারা কেহ উপেক্ষা করিতে পারিবে না।" এই প্রাচীন হিন্দুস্থানে সর্ব্বত্যাগী উদাসীন না হইলে, সন্ন্যাসব্রতধারী হইয়া প্রকাশ্যরূপে বৈরাগীর বেশ না ধরিলে তাঁহার ধর্ম্মভাবের প্রভাব সাধারণের নিকট তত সমাদৃত হয় না, আসক্তিশূন্য হইয়া গৃহেতে বৈরাগ্যধর্ম্ম পালন করিলে তাহার প্রকৃত মূল্য কেহ বুঝিতে পারে না, এই জন্য লোকশিক্ষার্থ গৌরকে প্রচলিত নিয়মানুসারে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইল। জীবের কল্যাণের জন্য ইহা আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা না হইলে তাঁহার ভক্তির ধর্ম্মের মহিমা কেহ বুঝিতে পারিত না, এবং শিষ্যগণের সংসারবন্ধন শিথিল হইত না। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সঙ্কীর্ত্তনাদি করিতেন তাঁহারাওএ পর্য্যন্ত গূঢ় সংসারাসক্তির হস্ত হইতে প্রায় কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের প্রবল বৈরাগ্যাঘাত সকলের মর্ম্মস্থানকে কম্পিত করিয়াছিল। গৌর বলিলেন, নিতাই, আমি নিশ্চয়ই এবার গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব, এজন্য তুমি দুঃখিত হইও না, আমাকে বিধান দাও, আমি চলিয়া যাই। নিতাই বলিলেন, তোমাকে আর কে বিধান দিবে? যাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই তোমার কার্য্য; তথাপি আর পাঁচ জন ভক্তকে একবার জিজ্ঞাসা কর। নিমাইকে বিদায় দিয়া শচীদেবী কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবেন ইহা ভাবিয়া নিত্যানন্দ অতিশয় শোকার্ত্ত হইলেন। নিতাইয়ের সঙ্গে কথা কহিয়া পরে চৈতন্য মুকুন্দ গদাধর প্রভৃতি কতিপয় বন্ধুকেও তদ্বিষয় জ্ঞাপন করেন। সোণার গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইবেন, চিরকালের জন্য গৃহ পরিবার স্বদেশ বন্ধু বান্ধব ত্যাগ করিয়া যাইবেন, মস্তকের ঘন চিকুর কুন্তল

ছেদন করিবেন, ইহা শুনিয়া সকলে নানামতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই বজ্রতুল্য নিদারুণ বাক্য শ্রবণে ভক্তগণের মুখ ম্লান হইল। মুকুন্দ কাতর হইয়া প্রার্থনা করিলেন, প্রভো! যদি তুমি নিশ্চয়ই যাও, তবে আর দিন কয়েক আমাদের সঙ্গে থাকিয়া কীর্ত্তন কর। এ প্রস্তাবে গৌরের সম্মতি হইল। অনন্তর তিনি সরল হৃদয় পরমাত্মীয় গদাধরকে সন্ন্যাসের অভিপ্রায় অবগত করাতে গদাধর দুঃখের সহিত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তোমার যত সব অদ্ভুত কথা! তবে কি তোমার মতে গৃহস্থ ব্যক্তি বৈষ্ণব হইতে পারে না? ইহাত তোমার বেদের মত নয়? দেখ ভাই নিমাই, প্রথমেইত তোমাকে মাতৃবধের ভাগী হইতে হইবে। তিনি কি আর তোমাকে বিদায় দিয়া প্রাণে বাঁচিবেন? যাও যাহা ইচ্ছা কর, যদি মস্তক মুণ্ডন করিলে সুখী হও তবে তাহাই কর!

গদাধরের কথা যদিও যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু চৈতন্যের যেরূপ দায়িত্ব, পাপসমাজের প্রতি তাঁহার যে প্রকার গুরুতর কর্ত্তব্য, দেশ কাল অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে গদাধরের কথা এখানে তত খাটে না। গৌর যদিও যুবক, কিন্তু তিনি কি করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা চাই। জীবের দুঃখ দুর্গতি, ধর্ম্মসমাজের জীবনহীন শুষ্ক কঠোর ভাব দেখিয়া তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়াছিল। হস্তে প্রচুর অন্ন থাকিতে কি আর তিনি এই ঘোর দুর্ভিক্ষ দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? যাঁহার সংসার তাঁহারই আদেশে তিনি সন্ন্যাসী হইলেন, একটি পরিবার ত্যাগ করিয়া সহস্র সহস্র পরিবারকে ধর্ম্মনিয়মে নিয়মিত করিলেন। যতই অনাসক্তচিত্ত বৈরাগী কেন তিনি হউন না, পরিবার মধ্যে থাকিলে অবোধ কুতার্কিক লোকে বলিবে গৃহীর নিকট আবার বৈরাগ্য ভক্তি কি শিখিব? এ দেশে বৈরাগ্যসম্বন্ধে সাধারণের এমনি সংস্কার যে, ঈশ্বরাদেশে নিজের শরীর রক্ষা করিতে দেখিলে, কিংবা আত্মীয় পরিবারের প্রতি কিঞ্চিৎ মায়া মমতা প্রকাশ করিলে তাহারা বলে, এ ব্যক্তি স্বার্থপর; কেন না, সে যথা নিয়মে পান আহার করে, এবং পরিবারকে ভালবাসে। সংসারে অনাসক্ত থাকিয়া ভক্তি বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা অতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, কিন্তু সংসারের কুটিল চক্র সমুদায় ভেদ করিয়া তাহা দেখাইতে, এবং রিপুসংগ্রাম ও বৈষয়িক প্রতিকূলতার উপর জয়লাভ করিতে করিতে এ দিকে যে জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়া আইসে!

অতএব গৌর আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিতে নিজের সম্বন্ধে যাহা শ্রেয়ঃ বোধ করিয়াছিলেন তাহার উপর আর তোমার আমার কোন কথা চলে না। গৌর আপনি সন্ন্যাসী হইয়াও অন্যকে গৃহী করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম গৃহীর ধর্ম্ম।

গৌরগতপ্রাণ বৈষ্ণবগণ ও আত্মীয় বন্ধু প্রতিবাসী এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া সকলেই মহা দুঃখিত হইল, অনেকে ভগ্নমনা হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। হায়! সন্ন্যাসী হইলে আর তবে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, আর তিনি নবদ্বীপের মৃত্তিকা স্পর্শ করিবেন না। গৌরধনে বঞ্চিত হইয়া তবে আমরা কি লইয়া থাকিব? এমন সঙ্কীর্ত্তন আর কে শুনাইবে? এই বলিয়া তাহারা খেদ করিতে লাগিল। কোমলহৃদয় গৌরচন্দ্র বন্ধুগণকে শোক দুঃখে নিতান্ত কাতর দেখিয়া বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! আমি লোকশিক্ষার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করিতেছি, কিন্তু তোমরা আমার চিরসঙ্গী জানিবে। চিরকাল আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিব। আরও দুই বার এইরূপ অবতার ও সঙ্কীর্ত্তন এ দেশে হইবে, তোমরা চিন্তা দূব কর, আমাব জন্য আর ভাবিও না।" অতঃপর তিনি সকলকে আলিঙ্গন দান করিয়া সুখী করিলেন।

পুত্রবৎসলা শচীমাতা প্রথমে যখন এই হৃদয়বিদারক সংবাদ শুনিলেন, দুর্জ্জয় শোকাবেগে তখন তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। অনন্তর বহু বিলাপ ক্রন্দন করিয়া বলিলেন, রে বৎস নিমাই! তুমি অদ্বৈত শ্রীবাসাদির সঙ্গে গৃহে বসিয়া সঙ্কীর্ত্তন কর, দুঃখিনী জননীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইও না; তুমি বনচারী হইলে আর আমার প্রাণ বাঁচিবে না। বিশ্বরূপ একবার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আমি পতিহীনা অনাথিনী, কেবল তোমার মুখ চাহিয়া জীবিত আছি; তুমিও যদি আমাকে পরিত্যাগ করিবে, তবে কাহাকে লইয়া আমি থাকিব? মাতাকে বধ করিয়া কিরূপে তুমি লোকদিগকে ধর্ম্ম শিখাইবে? হায়! হায়! বুক যে ফাটিয়া যায়; তবে আর কি আমি তোর চাঁদ মুখ দেখিতে পাইব না? হাতে ধরিয়া বলি বাপ! দুঃখিনীকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া তুমি যাইও না। তুই যে আমার অঞ্চলের নিধি, প্রাণের অধিক, জীবনের সম্বল। শোকে অধীরা জননীর নয়ন-যুগলে অবিরল অশ্রুধারা দেখিয়া এবং তাঁহার মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া চৈতন্যের কণ্ঠরোধ হইল, তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। শেষ শাস্ত্রবচন দ্বারা তাঁহাকে বৈরাগ্যপূর্ণ পরমার্থতত্ত্বের

মর্ম্ম কিছু বুঝাইয়া দিলেন, তাহাতে মায়ের শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল।

এই ভাবে দুই চারি দিন যায়, ভক্তসঙ্গে চৈতন্য পূর্ব্ববৎ নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন, তাঁহাব সহবাসে থাকিয়া ক্রমে সকলে সন্ন্যাসের কথা ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। এ দিকে বিশ্বম্ভর গোপনে গোপনে নিতাইকে বলিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি আগামী উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিবসে গৃহত্যাগ করিয়া কাটোঁয়া নগরে কেশব ভারতীর নিকট দণ্ড গ্রহণ করিব। গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর এবং ব্রহ্মানন্দও এ কথা জানিতেন; তাঁহারা পাঁচ জনে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। যাইবার পূর্ব্ব দিন সমস্ত সময় ধর্ম্মালাপ নাম সঙ্কীর্ত্তন এবং বন্ধুগণের সঙ্গে অনেক কথা বার্ত্তা হইয়াছিল। ঐ পাঁচ জন এবং শচী ভিন্ন কল্যকার কথা আর কেহ জানেন না। সন্ধ্যাকালে গৌরচন্দ্র বন্ধুবর্গের সহিত ভাগীরথীতীর পর্য্যটন করিয়া রজনীযোগে স্বীয় বাসভবনে সকলের সঙ্গে আলাপ করিতে বসিলেন। ভক্তগণ প্রতিদিন কেহ পুষ্পমালা, কেহ সুগন্ধি চন্দন আনিযা গৌরদেহকে সজ্জিত করিতেন। কেহ বা উপাদেয় ফল শস্য আনিয়া উপহার দিতেন। অনন্তর ভক্তমণ্ডলীমধ্যে হরিগুণ গান, সৎপ্রসঙ্গ প্রেম ভক্তিব বিনিময় হইতে লাগিল; রজনী প্রভাত হইলে নবদ্বীপচন্দ্র সমস্ত অন্ধকার করিয়া সন্ন্যাসে চলিয়া যাইবেন, শচী এবং ঐ পাঁচ জন ব্যতীত আর কেহ তাহা অবগত নহেন। নবদ্বীপধামে গৌরচন্দ্রের এই শেষ দরবার। তিনি ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই সকল! তোমবা হরিনাম বিনা আর কিছু জানিবে না, সদা সর্ব্বদা নামগুণগানে রত থাকিবে, হরিনামের জয়ধ্বনি করিবে, শয়ন ভোজন জাগরণে নিরন্তব তাঁহার নাম বদনে বলিবে। যদি আমার প্রতি তোমাদের স্নেহ ভালবাসা থাকে, তবে আমার এই উপদেশ তোমরা পালন করিও।" পরে প্রসন্নমুখে শুভদৃষ্টিতে একে একে সকলকে বিদায় দিলেন। এমন সময় শ্রীধর এক লাউ হস্তে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। শ্রীধর ঠাকুর গৌরাঙ্গের বড় প্রিয়পাত্র, সুতরাং তাঁহার লাউ থোড় ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার বড় মিষ্ট লাগিত। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে বসিয়াছেন, তথাপি দীন সেবক পরম ভাগবত শ্রীধরের লাউ উপেক্ষা করা হইবে না; জননীকে সেই রাত্রিতেই লাউ রন্ধন করিতে অনুমতি দিলেন।

সকলে বিদায় হইলে আহারান্তে বিশ্বম্ভর শয়ন করিলেন, হরিদাস,

গদাধর বহির্দ্বারে প্রহরী রহিলেন। অপর জীবসকল নিদ্রায় নিমগ্ন, চারিদিক্ নিস্তব্ধ, কিন্তু সে কাল নিশিতে শচীর চক্ষে আর নিদ্রা নাই; নয়নজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, কেবল তত্ত্বোপদেশের গুণে এবং পুত্রের অলৌকিক প্রভাবে অপেক্ষাকৃত তিনি শান্ত হইয়া আছেন। পতিপ্রাণা অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া পর দিবসে কি ঘোর পরীক্ষায় নিপতিত হইবেন তাহার কিছুই জানেন না। চৈতন্য তাঁহাকে কোন কথাই বলেন নাই। বরং সে রাত্রে তিনি বিশেষরূপে তাঁহাকে প্রেম প্রদর্শন করিলেন। নিশাপ্রভাতে যে দুঃসহ শোকের ব্যাপার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে তাহার সঙ্গে পূর্ব্ব রজনীর কি বিপরীত সম্বন্ধ! এক দিকে স্নেহপূর্ণ পারিবারিক প্রেমবন্ধন, অপর দিকে ডোর কৌপীন পরিধান, শিখাসূত্রপরিত্যাগ, চিরবৈরাগ্য; নিশান্তে সন্ন্যাসের নির্দ্দয় অস্ত্রাঘাতে সমস্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, অথচ তাহার পূর্ব্বে কতই মায়া মমতা প্রীতি স্নেহ! কি অলৌকিক অনাসক্তি! নিদ্রাভিভূতা স্বর্ণপ্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়াকে অনন্ত শোকসিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়া প্রভু সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন।

রাত্রিশেষে চৈতন্য বহির্গমনের আয়োজন করিতেছেন দেখিয়া হরিদাস এবং গদাধর তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। মহাপ্রভুর মনে তখন আর একটি নূতন ভাব আবির্ভূত হইয়াছে। দুই আশ্রমের সন্ধিস্থলে পতিত হইয়া তিনি দাবানলদগ্ধ অরণ্যের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমার সঙ্গী আর কেহ নাই, কেবল সেই এক অদ্বিতীয় আমার সঙ্গী।" পুত্রের গমনশব্দ শ্রবণে শচী দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিলেন। গৌর তখন পাগলের প্রায়। জননীর দুইটি হাত ধরিয়া অতি বিনয় ও ব্যাকুলতার সহিত বলিতে লাগিলেন, "মাতঃ! তোমার অপরিশোধ্য ঋণে আমি আবদ্ধ আছি। তুমি আমার জন্য কত কষ্ট সহ্য করিলে, নিজের সুখের প্রতি একবারও দৃষ্টি কর নাই, আমার লালন পালন শিক্ষা পাঠ, সুখ স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্যই চির দিন যত্ন করিয়াছ; এ ঋণ আমি কোন কালে শোধ দিতে পারিব না। শুন জননি! ঈশ্বরের অধীন সমস্ত সংসার, তিনি সংযোগ করেন, আবার তিনিই বিয়োগ করিয়া দেন, তাঁহার ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কাহার আছে? তোমার পরমার্থ সম্বন্ধীয় সমস্ত ভার আমার উপর রহিল।" পুনর্ব্বার মাতৃবক্ষে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "তোমার সকল ভার আমার উপরে রহিল।" যত কিছু তিনি বলিলেন, শচী তাহা

নিরুত্তর হইয়া শুনিয়া অবিশ্রান্ত নয়নজলে ধরাতল সিক্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই গুণধাম পুত্র গৌরচন্দ্র মাতার পদধূলি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বহির্গত হইলেন। কিছু দূর একাকী গিয়াছিলেন, তাহার পর উপরিউক্ত পাঁচ জন ভক্ত পথে গিয়া তাঁহার সঙ্গে সম্মিলিত হন।

প্রাণাধিক অঞ্চলের নিধি পুত্রকে বিদায় দিয়া রোরুদ্যমানা শচীমাতা ধরাসনে পড়িয়া রহিলেন। চিরদুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়া বাণবিদ্ধ কুরঙ্গিণীর ন্যায় অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আনন্দময় গৌরের গৃহ একবারে যেন ঘোর শ্মশানের ন্যায় হইয়া উঠিল। মাতা ও বধূর আর্ত্তনাদে আকাশ ফাটিতে লাগিল। উষাকালে স্নান করিয়া মহন্তগণ গুরুদেবকে প্রণাম করিতে আসিয়া দেখেন গৃহ শূন্য, শোকের মলিন বসনে সমুদায় আচ্ছন্ন, নবদ্বীপ অন্ধকার করিয়া গৌর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন! পতিবিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া এবং শোকাতুরা শচীর অজস্র অশ্রুধারা তাঁহাদিগকেও গৌরশোকে ব্যাকুল করিয়া দুঃখসাগরে ডুবাইল। মহন্ত বৈষ্ণবগণ শিরে করাঘাত করিয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন, চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। যে এ কথা শ্রবণ করে সেই দুঃখেতে ব্যাকুল হয়। শচী বলিলেন, বৎসগণ! তোমরা এই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া যাও, আমি যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে চলিয়া যাই। কাহার মুখ চাহিয়া আর আমি গৃহে বাস করিব? নগরবাসী নরনারী এই বিষম শোকাবহ সংবাদ শ্রবণে শচীগৃহে উপস্থিত হইয়া হা হতোঽস্মি! করিতে লাগিল। কঠোর হৃদয় চিরবিরোধী ব্যক্তিরাও রোদন করিতে লাগিল। সমস্ত নগর যেন গৌরবিরহে আকুল হইয়া শোকবসন পরিধান করিল। নয়নের জলে নবদ্বীপ ভাসিতে লাগিল। প্রতিবাসীরা তখন বলে, হায়! সে চন্দ্রানন আর কি দেখিতে পাইব না! কেহ বলে, ঘরে আগুন দিয়া চল আমরা বাহির হই, এবং কর্ণে কুণ্ডল পরিয়া যোগীর বেশ ধারণ করি। চৈতন্য যদি দেশ ছাড়িলেন তবে আর আমাদের বাঁচিয়া কি সুখ? শত্রু মিত্র জ্ঞানী কর্ম্মী তার্কিক সকলেই শোকার্ত্ত হইল। গৌর যেন বৈরাগ্যের বিশাল লৌহ দণ্ড দ্বারা সকলকে চূর্ণ করিয়া চলিয়া গেলেন। অতি বড় বিষয়াসক্ত ঘোর সংসারীর মনও এ কথা শুনিয়া উদাস হইয়াছিল। অদ্বৈত শ্রীবাসাদি ভক্তমণ্ডলী পূর্ব্ব রজনীতে প্রভুর সঙ্গে কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন, প্রাতে আর তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পান না; পাগলের ন্যায় দিশাহারা হইয়া কতক ক্ষণ ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিয়া যখন প্রকৃত ঘটনা তাঁহারা

শুনিলেন, তখন যিনি যে ভাবে ছিলেন তিনি সেই ভাবেই রহিয়া গেলেন, আর কাঁদিবার শক্তিও থাকিল না। হরিদাস অদ্বৈত প্রভৃতি সকলেই অকূল শোকসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

এ দিকে গঙ্গা পার হইয়া উষাকালের তরুণ সূর্য্যের ন্যায় মত্ত সিংহ গৌর-রায় কাটোয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্ব কথানুসারে গদাধর, নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ, ব্রহ্মানন্দ পাঁচ জনে পথিমধ্যে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন। কাটোয়া পৌছিতে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। কেশব ভারতীর কুটীরে উপস্থিত হইয়া গৌর তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, আর্য্য! অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে উপদেশ প্রদান করুন! এই কথা বলিতে বলিতে প্রেমজলে তাঁহার সর্ব্ব শরীর অভিসিঞ্চিত হইল। শেষ মহা হুঙ্কার ধ্বনি করিয়া নাচিতে লাগিলেন, দেহে ভক্তির অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশ পাইতে লাগিল, মুকুন্দ মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিলেন, নিমেষের মধ্যে তথায় ভাবের তরঙ্গ উঠিল। ভক্ত গৌরের তেজঃপুঞ্জ দেহ, অদ্ভুত মুখজ্যোতি, প্রেমের মত্ততা, ভাবের উচ্ছ্বাস, মত্ত মাতঙ্গবৎ নৃত্য কুর্দ্দন নিরীক্ষণ করিয়া ভারতী গোসাঞী চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, দর্শকবৃন্দ মোহিত হইয়া গেল। গৌরচন্দ্র দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া সকলের নিকট দাস্যমুক্তি ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন হাস্য হুঙ্কার নৃত্য দেখিয়া তত্রত্য নরনারীগণ কাঁদিতে লাগিল। ভারতী বলিলেন, "শুন বিশ্বম্ভর! তোমার সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের প্রস্তাব শুনিয়া আমার অন্তর কম্পিত হইতেছে। তুমি এমন সুন্দর যুবা পুরুষ, জন্মাবধি দুঃখের লেশমাত্র জান না, এখনও অপত্য সন্ততি তোমার হয় নাই, পঞ্চাশ ঊর্দ্ধ হইলে তবে সংসারকামনা নিবৃত্ত হয়, অতএব তোমাকে সন্ন্যাসী করা বিচার-সিদ্ধ হইতেছে না। তবে যদি একান্তই সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা কর, গৃহে গিয়া জননী এবং আর সকলের নিকট বিদায় লইয়া আইস, তদ্ভিন্ন কেমন করিয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি।" এ কথা শ্রবণে গৌর নিতান্ত কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "তোমার নিকট আমি আর কি বলিব, ধর্ম্মের তত্ত্ব আমি কি জানি; সংসারে আসিয়া এই দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়াছি, ক্ষণভঙ্গুর এই দেহ, বিলম্ব করিতে গেলে যদি দেহ ধ্বংস হইয়া যায়, তবে আর আমি বৈষ্ণবের সঙ্গ কবে করিব! তুমি আমাকে নিরাশ করিও না, তোমার প্রসাদে আমি কৃষ্ণের দাস হইয়া থাকিব।" এই বলিয়া

অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত তিনি ভারতীর চরণালিঙ্গন করিলেন। তখন ভারতী গোস্বামীকে পরাস্ত হইতে হইল। তাদৃশ ব্যাকুলতা দেখিয়া কি আর কেহ স্থির থাকিতে পারে? বিশ্বম্ভর ইতঃপূর্ব্বে স্বপ্নযোগে এক মন্ত্র পাইয়াছিলেন তাহা ভারতীকে জানাইলেন এবং সেই মন্ত্রে পুনর্ব্বার আপনি দীক্ষিত হইলেন। দণ্ডী ভারতী যখন তাঁহাকে সন্ন্যাসী করিতে সম্মত হইলেন, তখন গৌরের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না, উন্মত্তপ্রায় হইয়া তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। কাটোয়াবাসী স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা এই অলৌকিক ধর্ম্মোন্মত্ততা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। শত শত লোক একত্রিত হইয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে লাগিল। নারীগণ দুঃখিত হইয়া বলে, আহা! এমন সুন্দর রূপ আরত কখন দেখি নাই! নয়ন যে আর ফিরাইতে পারি না। হায়! এমন যুবাকালে সন্ন্যাসী হইলে ইহার মাতা কিরূপে জীবন ধারণ করিবে! স্ত্রী ইহা শুনিলে যে তৎক্ষণাৎ প্রাণে মরিবে! লোকদিগকে এই প্রকারে শোক বিলাপ করিতে দেখিয়া গৌর তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ও গো মা বাপ সকল! তোমরা আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, হরিপদে মস্তক সমর্পণ করিব এই আমার বড় সাধ। তিনি আমার প্রাণপতি, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমার আর অন্য গতি নাই। এই কথা বলিয়া তিনি অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

পর দিন প্রাতে চন্দ্রশেখর দীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় আয়োজন প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। নিকটস্থ অধিবাসিগণ সকলে দলে দলে দেখিতে আসিল। গঙ্গাতীরস্থ ভারতীর আশ্রম হরিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। কেশব ভারতী শিষ্যের অনুপম দেবভাব দর্শনে আপনাকে আপনি ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। যথাকালে গৌরসুন্দর মস্তক মুণ্ডন করিবার জন্য নাপিতের নিকট বসিলেন। তখন চারিদিক্ হরিধ্বনি ও ক্রন্দনকোলাহলে শব্দায়মান হইয়া উঠিল। এক দিকে সঙ্গী ভক্তগণ বসনাবৃত বদনে অবিশ্রান্ত রোদন করিতেছেন, অন্য দিকে দর্শক নরনারীগণ চীৎকার স্বরে কাঁদিয়া বলিতেছে, হায়! হায়! ইহার জননী এবং ভার্য্যা কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিবে। একে পরম সুন্দর গৌর রূপ, তাহাতে যুবা বয়স, মনোহর চিকুর কেশ, নাপিত আর কিছুতেই ক্ষুর ধরিতে পারে না। সে ক্ষৌরি করিবে কি নিজেই কাঁদিয়া অস্থির হইল। চৈতন্য এক দণ্ডের জন্যও স্থির নহেন। সহজেই ভক্তির প্রবল আবেশে উন্মাদ, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যব্রতের

অগ্নিময় সাগরগর্ভে প্রবেশ করিতেছেন, কিছুতেই আর স্থির হইতে পারেন না। বিস্ফারিত ভাবরসে শরীর কদম্বাকৃতি হইতেছে, অনুরাগের ভীষণ বায়ু-হিল্লোলে হৃদয়সিন্ধুমধ্যে নব নব ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছে, তদুপরি প্রেমের সুমন্দ লহরীলীলা সমুত্থিত হইয়া মত্ত হস্তীর ন্যায় চিত্তকে উন্মাদ করিয়া তুলিতেছে; এক একবার হরি! হরি! বলিয়া ভীম গর্জ্জনে হুঙ্কার করিতেছেন, নাপিতের সাধ্য কি যে শিখা মুণ্ডন করে। মস্তকে হস্তস্পর্শ করিতে গিয়া নাপিত কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল, ঠাকুর! তোমার শিরোমুণ্ডন করা আমার কর্ম্ম নয়, কেহ যদি পারে করুক, আমি পারিব না, ভয়েতে আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। অধম নাপিত জাতি আমি, তোমার মাথায় হাত দিয়া সেই হাত আমি আবার কার পায়ে দিব? আমার দ্বারা ইহা হইবে না। তখন মহাপ্রভু প্রসন্ন হইয়া তাহাকে প্রবোধ বচনে বলিলেন, তুমি আর এ ব্যবসায় করিও না, কৃষ্ণের কৃপায় তুমি ইহলোকে সুখী হইবে এবং পরলোকে স্বর্গ লাভ করিবে। তৎপরে বহু কষ্টে সমস্ত দিনে ক্ষৌরিকার্য্য সমাধা হইল। গৌরাঙ্গ নিজপ্রদত্ত মন্ত্র গুরুমুখ হইতে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া চতুর্গুণ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। কি নাম রাখিবেন ইহা ভাবিয়া ভারতী গোস্বামী আর সকলের নিকট বুদ্ধির পরামর্শ লইতেছিলেন, এমন সময় "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" এই দৈববাণী হইল। চৈতন্য যখন মস্তক মুণ্ডন করিয়া অরুণ বসন পরিধানান্তর এক হস্তে দণ্ড অপর হস্তে কমণ্ডলু ধারণ করিলেন, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি মহাবৈরাগ্যের জ্বলন্ত হুতাশনে অবগাহন করিয়া উঠিলেন। তপ্তকাঞ্চনতুল্য গৌর দেহে রক্তবসন কি অপূর্ব্ব দেবপ্রভাই বিস্তার করিল! তখন অস্তাচলচূড়াবলম্বী লোহিত বর্ণ তপনের ন্যায় তাঁহার শোভা হইল। বৈরাগ্যের প্রদীপ্ত কিরণে মুখমণ্ডল যেন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। যে দিকে তিনি নয়ন ফিরান সে দিক্ যেন একবারে দগ্ধ করিয়া ফেলেন। নবীন ব্রহ্মচারী ভক্তাবতার বিশ্বম্ভরের এই সন্ন্যাসবিবরণ শুনিলে সুদৃঢ় সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। দীক্ষার পর হইতে ইহাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হইল। ১৪৩১ শকে [ ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে ] পঁচিশ বৎসর বয়সে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিবসে চৈতন্য সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। গৌরসন্ন্যাসের এই অনির্ব্বচনীয় ভাবদর্শনে মোহিত হইয়া প্রেমদাস নিম্ন লিখিত সঙ্গীতটি রচনা করিয়া গাইয়াছিলেন।

( কীর্ত্তন ) "কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে, অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গমূরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শত ধারে।

গৌর মত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়, কভু লুটায়ে ধরায় নয়নজলে ভাসে রে; কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করি, সিংহ রবে রে; আবার দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে, দাস্যমুক্তি যাচে দ্বারে দ্বারে।

কি বা মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ, দেখে ভক্তিভাবাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে; জীবের দুঃখে কাতর হযে, এলেন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে প্রেম বিলাতে রে; প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, চৈতন্যচরণে দাস হয়ে সঙ্গে বেড়াই ঘুরে।"

ভারতী গোস্বামী চৈতন্যকে সন্ন্যাসী করিয়া সে দিন সমস্ত রাত্রি আনন্দ মনে উভয়ে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিলেন। লোকগুরু প্রেমিক ভক্তকে তিনি শিষ্যত্বে বরণ করিয়া আপনিও কৃতার্থম্মন্য হইলেন, ভক্তি প্রেমের আস্বাদন পাইলেন। তদনন্তর গুরুস্থানে বিদায় হইয়া সেই বৃহদ্ব্রতধারী ভক্তিরসসিন্ধু চৈতন্য গোসাঞী বনপ্রস্থানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, ভারতী বলিলেন, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব, সর্ব্বদা আমি তোমার সঙ্গে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইব। গমনকালে চৈতন্যদেব চন্দ্রশেখরকে কোলে লইয়া গদগদশ্রুলোচনে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর এবং সকল বৈষ্ণবকে সংবাদ দাও যে আমি বনপ্রস্থান করিলাম। কিছু চিন্তা করিও না, তুমি আমার পিতা, আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা তুমি আছ, কোন কালে আমার সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ হইবে না।"

চন্দ্রশেখর ভগ্নান্তঃকরণে গৃহে ফিরিয়া আসলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শচীদেবীর প্রথমে আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। তদনন্তর উথলিত শোকাবেগে ব্যাকুল হইয়া আলুলায়িত কেশে উন্মাদিনীর ন্যায় দৌড়িয়া গিয়া চন্দ্রশেখরের নিকট তিনি পুত্রবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করত বহু আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। পুনরায় ক্রন্দনের উপর গভীর ক্রন্দনের ধ্বনি নবদ্বীপকে আচ্ছন্ন করিল। চন্দ্রশেখর কথা কহিবেন কি, শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা দর্শনে তাঁহার এক গুণ শোক দশ গুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। রোদনশব্দ শুনিয়া গৌরভক্ত শোকদগ্ধ বৈষ্ণব ও প্রতিবাসিগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। গৃহমধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া জীবন্মৃতের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া বক্ষে করাঘাত হানিতেছেন। শচী কাঁদিয়া বলিলেন, ও রে চন্দ্রশেখর! তুই

আমার প্রাণের বিশ্বম্ভরকে কোথায় রাখিয়া আসিলি বল্! কোন্ গ্রামে কোন্ দেশে কোন্ সন্ন্যাসীর আশ্রমে কিরূপে নিমাই মাথা মুড়াইল! কোন্ নিষ্ঠুর নাপিত তাহার সুন্দর কেশ ছেদন করিল! কোথায় গিয়া আমার সেই প্রাণাধিক গৌরচন্দ্র ভিক্ষা করিল! কি ভাবে সে এখন কোথায় আছে সমস্ত আমাকে বল্! হায়! সে চাঁদমুখ আর আমি চুম্বন করিতে পাইব না! আমার সকল দিক্ যে অন্ধকার হইল! তেমন করিয়া আর কাহার পাতে আমি ভাত রাঁধিয়া দিব! তাহার কোমল অঙ্গে কে আর হাত বুলাইবে! সে যে পাগল আত্মবিস্মৃত, ক্ষুধার সময় কে তাহাকে খাওয়াইবে! মা বলিয়া কে আর আমার সন্তপ্ত প্রাণকে শীতল করিবে! হায়! হায়! আমার হৃদয়ের ধন নিমাই, তুমি কোথায় রহিলে! বাপ! এক দিন তোরে না দেখিলে আমি সমস্ত সংসার শূন্য দেখিতাম, এখন তোর অদর্শনে কিরূপে জীবন ধারণ করিব! হা! এ নির্দ্দয় প্রাণ আর কত ক্ষণ দেহে থাকিবে! আমার যে সকল আশা ফুরাইয়া গেল! পৃথিবী অরণ্যময় হইল! আমি এখন কোথায় গিয়া কাহার নিকট দাঁড়াইব! বিষম শোকে অভিভূত হইয়া শচীমাতা শিরে আঘাত করিলেন, সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা বহিতে লাগিল। অপর দিকে বিষ্ণুপ্রিয়া দুর্ব্বিষহ পতিবিরহ যন্ত্রণার অনলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া হাহাকার করিতেছেন। যাহারা তাঁহাকে প্রবোধ দিতে যায় তাহারা আপনারাই কাঁদিয়া আকুল হইয়া ফিরিয়া আসে। চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া এইরূপে সকলের শোকানল প্রদীপ্ত হইয়াছিল। প্রভুর সন্ন্যাসবার্ত্তা এবং বনগমন সংবাদ শ্রবণে অদ্বৈত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, আর আর ভক্তগণ ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য হারাইয়া কেহ বলেন, এ প্রাণ আর রাখিব না, কেহ বলেন, বিবাগী হইয়া এক দিকে চলিয়া যাইব। সেই আনন্দের মেলা ভক্তসমাজ ভাঙ্গিয়া এখন যেন বিষম শোকের আলয় হইল। এমন সময়ে তাঁহারা এই দৈববাণী শুনিলেন,—"পুনরায় তোমরা শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলিত হইয়া পূর্ব্ববৎ নামসঙ্কীর্ত্তন এবং প্রেমবিহার করিবে। কয়েক দিন পরে তাঁহার দেখা পাইবে, নিরাশ হইও না।" দৈববাণী শ্রবণে সকলে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন, এবং শচীকে বেষ্টন করিয়া সেই শুভ দিনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

চন্দ্রশেখরকে গৃহে পাঠাইয়া চৈতন্য অবশিষ্ট কয়েক জন বন্ধু এবং কেশব ভারতীকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন। এক্ষণে ভক্তিচন্দ্রিকার

সহিত বৈরাগ্যের মধ্যাহ্ন সূর্য্য মিলিত হইল। প্রেম পুণ্যের ঘনীভূত জ্যোতিতে চৈতন্যের হৃদয়াকাশ জ্যোতিষ্মান হইল। তখন তিনি চারি দিক্ হরিময় দেখিতে লাগিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কয়েক দিন ভাগবতোক্ত এই শ্লোকটি তিনি বারংবার আবৃত্তি করিয়াছিলেন;—"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ। অহন্তরিষ্যামি, দুরন্তপারং তমো-মুকুন্দাংঘ্রিনিষেবয়ৈব।" অর্থাৎ পূর্ব্বতন সাধুদিগের অবলম্বিত পরমাত্মনিষ্ঠা আশ্রয় করিয়া মুকুন্দচরণসেবা দ্বারা আমি এই দুস্তর মোহান্ধকার উত্তীর্ণ হইব। ভক্ত সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য যে গ্রামের ভিতর দিয়া যান বোধ হয় যেন একটী উজ্জ্বল অগ্নিশিখা চলিয়া গেল। পথে পথে গ্রামে গ্রামে লোকের সমারোহ হইল। তাঁহার গমন আরত সহজ নয়, একজন মহাপুরুষ যাই-তেছেন তাহা সকলে বুঝিতে পারিল। মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় এমনি দ্রুত-বেগে তিনি চলিতে লাগিলেন, যে সঙ্গিগণ হাঁটিয়া উঠিতে পারেন না। তদ্দেশীয় প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে পুলকিত হইয়া আনন্দের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে ক্রমাগত চলিলেন। বীরভূম অঞ্চলে বক্রেশ্বরের বনমধ্যে কিছু দিন নির্জ্জনবাস করিবেন এই তাঁহার অভিপ্রায়। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে কোন পল্লীমধ্যে এক ব্রাহ্মণগৃহে অতিথি হইয়া আহারান্তে তথায় সকলে নিদ্রিত আছেন, প্রহরেক রাত্রি থাকিতে তাঁহারা দেখেন যে চৈতন্য কোথায় উঠিয়া গিয়াছেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি সঙ্গিগণ মহা ভাবিত হইলেন, গৃহস্থের মনও বড় চিন্তিত হইল; নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া তাঁহারা শেষ দেখিলেন, প্রান্তরমধ্যে একাকী বসিয়া গোসাঞী কৃষ্ণ রে বাপ! কোথা গেলে! এই বলিয়া এমনি চীৎকার রবে কাঁদিতেছেন, যে তাহা এক ক্রোশ দূর হইতে শুনা যাইতেছে। কি ব্যাকুলতাই তাঁহার ছিল! আর কত রোদনই বা তিনি করিতেন! চক্ষে যেন গঙ্গানদী বহিয়া যাইত। তাহার এক বিন্দু জল পাইলে আমাদের পাপদগ্ধ জীবন শীতল হয়। ইচ্ছা হয়, মনের অনুরাগে একাকী প্রান্তরে বসিয়া তেমনি করিয়া কাঁদি। চৈতন্যের প্রেমের ক্রন্দন শুনিলে পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইত। ক্রন্দনের শব্দানুসারে সঙ্গিগণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া সেইখানে সকলে মিলে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন, বিরহের উত্তাপ কতক বাহির হইয়া গেল, তার পর প্রভু গম্যস্থানে যাত্রা করিলেন। বক্রেশ্বর পৌছিতে চারি ক্রোশ পথ বাকী আছে এমন সময় যাত্রীকের গতি পুনরায় পূর্ব্বাভিমুখে ফিরিল। গৌর বলিলেন,

আমি নীলাচল যাত্রা করিব, জগন্নাথ প্রভু আমাকে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন। পথে আসিবার কালে কোথাও আর হরিনাম শুনিতে পান না, তজ্জন্য দুঃখিত হইয়া আসিতেছেন, সহসা এক রাখাল বালক হরিনাম গান করিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ মহা সন্তুষ্ট হইলেন। তদনন্তর গঙ্গাস্নানের ইচ্ছা হইল। এমনি প্রবলবেগে গঙ্গার অভিমুখে তিনি আসিতে লাগিলেন, যে নিত্যানন্দ ব্যতীত আর কেহ সঙ্গে যোগ দিয়া উঠিতে পারিলেন না। ভাগীরথীর নির্ম্মল সলিলে অবগাহনান্তর সুস্থতা লাভ করিয়া তথায় নিকটবর্ত্তী কোন এক গ্রামে রজনী যাপন করেন। তৎপর দিবস অপর সঙ্গিগণ পৌঁছিলেন, তখন দলবদ্ধ হইয়া সকলে নীলাচল যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া চৈতন্য নিতাইকে বলিলেন, তুমি নবদ্বীপ যাও, গিয়া বৈষ্ণবদিগকে বল আমি নীলাচলে চলিলাম, ফুলিয়া গ্রামে হরিদাসকে দেখিয়া শান্তিপুর নগরে অদ্বৈত আচার্য্যের ভবনে আমি অপেক্ষা করিব, তুমি বন্ধুবর্গকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র তথায় আসিবে। অতঃপর নিত্যানন্দকে বিদায় দিয়া মহাপ্রভু হরিদাসের আশ্রমে চলিলেন। নিত্যানন্দকে দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে শুভ সংবাদ শুনিয়া শচীমাতা এবং ভক্তবৃন্দ আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যে দিন হইতে গৌর গৃহত্যাগ করিয়াছেন সেই হইতে শচীর মুখে অন্ন যায় নাই। দ্বাদশ দিন উপবাসী আছেন। নিত্যানন্দের প্রবোধ বচনে শান্ত হইয়া তিনি রন্ধন এবং ভোজন করেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে, নিতাই গৌরকে বৃন্দাবন যাইতেছি বলিয়া ভুলাইয়া কালনার পথে গঙ্গার ধারে ধারে একবারে তাঁহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে আনয়ন করেন। এবং গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া প্রভুকে তিনি বুঝাইয়া দেন। গৌর ভিজা কৌপীন বহির্ব্বাস পরিয়াছিলেন, অদ্বৈত আসিয়া তাহা ছাড়াইয়া শুষ্ক কৌপীন পরাইয়া দিয়া, নিজভবনে লইয়া যান।

---

# শান্তিপুরে ভক্তের মেলা।

শান্তিপুরে চৈতন্য আসিয়াছেন শুনিয়া নানা স্থান হইতে সহস্র সহস্র লোক তথায় ধাবিত হইল। প্রভূত উৎসাহে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে দলে দলে সকলে গঙ্গা পার হইতে লাগিল। এত লোকের ভিড় হইল যে নৌকায় আর ধরে না। কেহ কলসী বুকে, কেহ কলাগাছের ভেলায়, কেহ বা সাঁতার দিয়া পার হইল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই চলিল, দুই এক খান নৌকা ডুবিযাও গেল, কিন্তু কাহারো প্রাণের হানি হয় নাই। চতুর্দ্দিক হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে লোক সকল ফুলিযার দিকেও দৌড়িতে লাগিল। একটী প্রকাণ্ড উৎসবের মত হইয়া দাঁড়াইল। গৌর-বিরহশোকের জলন্ত আগুনেব উপর তাঁহাব পুনর্দ্দর্শন লালসা উদিত হইয়া লোকের প্রাণকে যেন অস্থির করিয়াছিল। আশা উৎসাহে পুল-কিত হইযা সকলে নামসঙ্কীর্ত্তন কবিতে করিতে বাহির হইলেন, কেহ কেহ শচীদেবীর শিবিকার সঙ্গে চলিলেন। এই সময় চিরদুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়া যে কথাটী বলিয়াছিলেন তাহা শুনিলে হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হয। হরি-ধ্বনি সহকারে দলে দলে নরনারী সকলে চলিল, শচীদেবীও চলিলেন, যাত্রিগণের আনন্দকোলাহলে গগনমেদিনী কম্পিত হইল, ইহা দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া আর কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, হায়! সকলেই আমার প্রাণনাথকে দেখিতে চলিল, আমি অভাগিনী এত কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে তাঁহাকে একবার চক্ষে দেখিতেও পাইব না। হায়! বিধাতা যদি আমাকে প্রভুপত্নী না করিতেন, তাহা হইলে আমিও তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। এই বলিয়া তিনি অজস্রধারে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিলাপ আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভক্তগণের হৃদয় অতিমাত্র ব্যথিত হইয়াছিল। শচীমাতা অনেক বুঝাইয়া, দুই এক জন আত্মীয়ের নিকট তাঁহাকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিলে পত্নীর মুখাবলোকন করিতে নাই, এই জন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে পতিদর্শনে বঞ্চিত হইতে হইল। গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর শচীনন্দন আর গৃহীর ন্যায় সংসারধর্ম্ম করেন নাই, গৃহবাসী বৈরাগী হইয়া সর্ব্বদা ভক্তিরসেই প্রমত্ত থাকিতেন, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া বিষ্ণু-

প্রিয়ার নয়ন পরিতৃপ্ত হইত। এক্ষণে তিনি যেন স্বামীর বৈরাগ্যব্রত গ্রহণের বলিস্বরূপ হইলেন। কি করিবেন, দাস আপনার প্রভুর আজ্ঞায় তাঁহার বিশেষ কার্য্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন ইহার উপর আর কথা নাই। গৌরের দেবপ্রভাবে বিষ্ণুপ্রিয়াও মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এই জন্য সংসাররূপা সামান্যা রমণীর ন্যায় তিনি আর তাঁহাকে অভিসম্পাত করিতে পারিলেন না।

নবদ্বীপবাসিগণ দলে দলে শান্তিপুরাভিমুখে চলিল। ওদিকে ফুলিয়া গ্রামে চৈতন্যের আগমনসংবাদ শুনিয়া নানা স্থান হইতে লোক সকল তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের হরিনামকোলাহল শ্রবণে শচীকুমার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং সকলকে প্রসন্নচিত্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া সুখী করিলেন। তাঁহার অপরূপ নবীন সন্ন্যাসবেশ কি মনোহর! সহসা সে তেজঃপুঞ্জ দেবশ্রী দর্শনে দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইল এবং তাঁহার চরণে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল। তদনন্তর অদ্বৈতের গৃহে আসিয়া তিনি উপস্থিত হন। তাঁহাকে নিজগৃহে পাইয়া বৃদ্ধ আচার্য্য পাগলের মত হইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন, উভয়ে কোলাকোলি প্রেম সম্ভাষণ করিলেন। অদ্বৈতের বালক পুত্র অচ্যুতানন্দ ধূলিধূষরিত অঙ্গে প্রণাম করিল। গৌর তাহাকে কোলে লইয়া বলিলেন, তুমি আমার ভাই। এমন সময় অবধূত নিতাই সদলবলে উপস্থিত হইয়া গৌরের সহিত মিলিত হইলেন। বিচ্ছেদের পর সম্মিলন অতি সুখের অবস্থা, বৈষ্ণব ভক্তগণ আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রেমের মহাপ্লাবনে তখন ভক্তবৃন্দের হৃদয় ভাসিয়া গেল। একবারে সকলে মহাকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিলেন, ভাবের আবেগে আত্মহারা হইয়া নাচিলেন এবং গাইলেন। পরে বেগ কিছু কমিয়া আসিলে ইষ্টালাপ নমস্কার দণ্ডবৎ আলিঙ্গনের বিনিময় হইল। সন্ন্যাসগ্রহণের পর গৌরের কিছু গাম্ভীর্য্য অধিক হইয়াছিল; নিয়মিতরূপে আহার পান করিতেন, বৈরাগ্যের শাসনাধীনে সর্ব্বদা থাকিতেন। ভক্তদিগকে বাহু প্রসারণপূর্ব্বক পৃথক পৃথক ভাবে তিনি আলিঙ্গন দান করিলেন। অনন্তর শিবিকারোহণে শচীমাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শোকে তাঁহার শরীর শীর্ণ হইয়াছে, চক্ষে নিরন্তর জল ঝরিতেছে, চৈতন্য গদগদ ভাবে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শচীর নয়নদ্বয় অশ্রুজলে এমনি পরিপূর্ণ হইল, যে তিনি সন্তানের মুখ আর দেখিতে পান না। তদনন্তর গৌরকে কোলে লইয়া স্নেহনীরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া দিলেন। গৌরচন্দ্র যুবা বয়সে মস্তক মুণ্ডন করিয়া দণ্ডীর বেশ

ধরিয়াছেন, রক্তবসন পরিয়াছেন, জননীর প্রাণে কি তাহা সহ্য হয়! সে বেশ দর্শন করিয়া শচীর শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি নয়নজলে অন্ধপ্রায় হইয়া বারংবার পুত্রের মুখচুম্বন এবং নিরীক্ষণ করিয়া অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রগাঢ় পুত্রবাৎসল্য এবং অকৃত্রিম মাতৃভক্তির কি চমৎকার সম্মিলনই এখানে হইল! অনন্তর শচীমাতা খেদ করিয়া বলিলেন, বাপ নিমাই! বিশ্বরূপ যেমন নিষ্ঠুরতা করিয়াছে তেমন করিও না, এক একবার যেন দেখা পাই। গৌরের চক্ষু হইতে দরদরিত ধারে প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি জননীকে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করিয়া প্রবোধ বাক্যে বুঝাইলেন, এবং অঙ্গীকার করিলেন, আমি কথন উদাসীন হইব না, যেখানে তুমি থাকিতে বলিবে সেইখানে আমি থাকিব। কেবল গৃহাশ্রমে যাইতে পারিব না, ব্রহ্মচারীর পক্ষে তাহা নিষেধ।

পরে সীতাদেবী শচীকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেলে গৌরচন্দ্র ভক্তবৃন্দের সঙ্গে ভালরূপে আলাপ করিতে বসিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা আমাব জন্য দুঃখিত হইও না, আমি চিরাদন তোমাদেরই থাকিব; তবে জন্মস্থানে কুটুম্ব লইয়া থাকা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নয়, এই জন্য আমাকে দেশ পরিত্যাগ করিতে হইল। কিয়ৎকাল পরে শচী মাতার সঙ্গে সকলে এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে, নীলাচলে প্রভু যদি থাকেন, তাহা হইলে কথন বা আমরাও তথায় যাইতে পারিব, হইল কথন বা তিনিও গঙ্গাস্নান উপলক্ষে গৌড়দেশে আসিতে পারিবেন। শচী সকল মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া বলিলেন, আমার বিশ্বম্ভর যাহাতে সুখে থাকেন, আমি তাহাই করিব, তাঁহাকে লোকে নিন্দা করিবে ইহা আমার প্রাণে সহিবে না, যেখানে তিনি থাকিতে ভালবাসেন থাকুন, কেবল এক একবার আমি যেন দেখা পাই। চৈতন্য পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহারও মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা ছিল। পরে শচীমাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভক্তগণ সহ সন্তানকে ভোজন করাইলেন। ইহার পূর্ব্বে কয়েক দিন গৌরাঙ্গের প্রায় উপবাসেই গিয়াছিল। দশ দিন কাল এখানে তিনি থাকেন। নগরমধ্যে সে কয়েক দিন অতিশয় জনকোলাহল হইয়াছিল। এত লোক গৌরদর্শনে আসিয়াছিল যে তাহা গণনা করা যায় না। একদিন অদ্বৈত আচার্য্য চৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল তুমি জ্ঞানপথ ত্যাগ করিয়া ভক্তিশিক্ষা দিয়া থাক, তবে অদ্বৈতবাদপথের সন্ন্যাসব্রত কেন গ্রহণ করিলে? ইহাতে তিনি এই উত্তর দিলেন যে, আমি হরিবিরহে

কাতর হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য, এবং সংসার ছাড়িয়া নিরন্তর তাঁহার সেবার জন্যই যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডন করিয়াছি। মায়াবাদ অদ্বৈত মত আমি কখন স্বপ্নেও কর্ণে শুনি না। দণ্ড ধারণ করিয়াছি তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আমার মন পশুর সমান, হস্তে দণ্ড না থাকিলে সে পশুকে বশে রাখা যায় না। অদ্বৈত গোস্বামী হাসিয়া বলিলেন, ঠাকুর! তুমি আবার আমার নিকট প্রতারণা করিতেছ! যখনই চৈতন্য আপনাকে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় নিজের দৈন্যভাব প্রকাশ করিতেন তখনই অদ্বৈত এবং আর আর সকলে তাঁহাকে প্রবঞ্চক প্রতারক বলিয়া হাস্য করিতেন। এই জন্য বোধ হয়, এ কথা পুনঃ পুনঃ আর তিনি বলিতেন না, বলিলে আরও বিপরীত ঘটিত। ইহা বড় কৌতুকের বিষয় যে মহাপুরুষেরা শত্রু, মিত্র, উভয়েরই নিকট প্রবঞ্চক বলিয়া পরিগৃহীত হন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত মহাজনেরা প্রবঞ্চক কি পৃথিবীর লোকেরা প্রবঞ্চিত তাহা এ পর্য্যন্ত ঠিক হইল না। সকলই ভগবানের লীলা খেলা ছলনা চাতুরী. মানুষ কেবল সাক্ষীগোপাল।

শচীদেবী এবং ভক্তগণকে বিদায় দিয়া চৈতন্য যখন নীলাচল যাত্রা করেন তখনকার অবস্থা স্মরণ করিলে পাষাণ বিগলিত হয়। তিনি বলিলেন, হে বন্ধুগণ! আমার এইমাত্র ভিক্ষা যে তোমরা ঘরে গিয়া সর্ব্বদা হরি আরাধনা এবং হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবে, এক্ষণে আমাকে বিদায় দাও, আমি নিলাদ্রি গমন করি। শেষোক্ত প্রস্তাব শ্রবণে অদ্বৈতাদি সমস্ত ভক্তগণ বলিলেন, এ সময় উড়িষ্যার রাজার সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ হইতেছে, শ্রীক্ষেত্রের পথে অত্যন্ত দস্যুভয়, লোক জন যাতায়াত করে না, আর দিন কতক থাকিয়া বিশ্রাম কর, বিবাদ নিষ্পত্তি হইলে পরে যাত্রা করিও, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা আর কি বলিব। মহাপ্রভু বলিলেন, যতই কেন প্রতিবন্ধক থাকুক না, আমি নিশ্চয়ই যাইব। প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আর কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করিলেন না। অতঃপর নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া চৈতন্যদেব নীলাচল যাত্রা করিলেন। তাঁহার বিরহে সমস্ত ভক্তগণ চীৎকার রবে কাঁদিয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিলেন, পুত্রবিরহিণী শচীমাতা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইয়াও পুনর্ব্বার শোকে আকুল হইলেন। তৎকালে বৃদ্ধ হরিদাস কৃতাঞ্জলিপুটে সজল নয়নে যে কয়েকটী কথা বলেন তাহা শ্রবণে চৈতন্যের প্রাণ বড় বিদ্ধ হয়। হরিদাস কাঁদিয়া বলিলেন, প্রভো! তুমি

নীলাদ্রি চলিলে, আমার গতি কি হইবে? তথায় যাইবার আমার শক্তি নাই, অধম যবন আমি, কিরূপে তোমায় না দেখিয়া আমি এই পাপজীবন ধারণ করিব? দয়াবান্ গৌর প্রেমগদগদ স্বরে বলিলেন, হরিদাস, তুমি দৈন্য সংবরণ কর; তোমার কথা শুনিয়া আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়, আমি তোমাকে পুরুষোত্তমে লইয়া যাইব, তুমি আশ্বস্ত হও। তদনন্তর জননীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ, প্রত্যেক বৈষ্ণবকে আলিঙ্গন ও প্রেম সম্ভাষণ করিয়া চৈতন্য পুরীধামে চলিয়া গেলেন, যাত্রিগণ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

## চৈতন্যের নীলাচল গমন।

অনন্তর সেই তেজস্বী প্রেমোন্মত্ত মহাপুরুষ এইরূপে স্নেহময়ী জননী, পতি-প্রাণা সহধর্ম্মিণী, অনুগত পারিষদ ধর্ম্মবন্ধু ও সংসারের যাবতীয় সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়া কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে ভিখারীর বেশে বনপথে নীলাচল যাত্রা করিলেন। তৎকালে বঙ্গদেশের নবাব সৈয়দ্ হুসেন সাহার সঙ্গে উড়িষ্যা নৃপতির মহাসংগ্রাম চলিতেছিল। একে পথ অতি দুর্গম, তাহাতে দস্যুভয়ে আরও দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। পথের এক স্থানে মহাপ্রভু আপনার সঙ্গীদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা সঙ্গে কে কি সম্বল লইয়া আসিয়াছ অকপটে বল। যখন শুনিলেন তাঁহার বিনা অনুমতিতে কাহারো কিছু লইবার তাঁহাদের ক্ষমতা নাই, তখন গৌরচন্দ্র নিরতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ভক্ষ্য বস্তু ভগবান্ যে দিন দিবেন অরণ্যে বসিয়া থাকিলেও সে দিন তাহা মিলিবে। কিন্তু তিনি যে দিন না দেন, রাজপুত্র হইলেও তাঁহাকে সে দিন উপবাস করিতে হয়। এক জনের অন্ন প্রস্তুত আছে, হয়ত অকস্মাৎ কাহারো সঙ্গে বিবাদ করিয়া সে ক্রোধভরে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিল, যে আমি ভাত খাইব না। কিংবা আহারের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে এমন সময় দেহে হঠাৎ জ্বরের সঞ্চার হইল। অতএব জানিবে, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা। সেই দয়াময় অন্নদাতা সমস্ত ভূমণ্ডলে অন্নসত্র স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার যে দিন আদেশ থাকিবে সে দিন সর্ব্বত্র অন্ন মিলিবে।

হরিকথা কহিতে কহিতে এবং হরিগুণ গাইতে গাইতে ক্রমে ইহাঁরা আঁঠিসারা নামক গ্রামে উপস্থিত হন এবং অনন্ত নামক এক গৃহস্থভবনে এক রাত্রি বাস করেন। পর দিন প্রাতে হরিস্মরণপূর্ব্বক বাহির হইয়া ছত্র-ভোগে সকলে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে ভাগীরথীস্রোত শতধা বিভিন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরের দিকে ধাবিত হইয়াছে। সেই তরঙ্গাকুলিত সুবিস্তীর্ণ জলরাশি দর্শনে চৈতন্যের মন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। স্থানীয় ভূম্যধিকারী রামচন্দ্র খাঁ এক জন পরম ভক্ত, তিনি বহু সমাদরে সাধুদিগকে আপনার আলয়ে রাখেন এবং যত্ন সহকারে উড়িষ্যা প্রদেশে পাঠাইয়া দেন। রামচন্দ্র দোলায় আসিতে আসিতে পথিমধ্যে গৌর সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার প্রেমময় রূপ অদ্ভুত ভাবভক্তি দর্শনে রামচন্দ্রের প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি দোলা হইতে নামিয়া গোসা-ঞীকে প্রণাম করিলেন। সে দেশের মধ্যে তিনিই প্রধান জমিদার। শচীনন্দন জগন্নাথ দর্শনের জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, আমি যাহাতে শীঘ্র নীলাচলে পৌঁছিতে পারি এমন উপায় করিয়া দাও। রামচন্দ্র বলিল "ঠাকুর, এ পথে বাহির হইলে রাজা এখনি বিদ্রোহী বলিয়া ধরিবে এবং প্রাণে মারিয়া ফেলিবে। বিশেষতঃ আমি তাঁহার অধীন এই জন্য ভয় হয়। যা হউক, যেরূপে পারি তোমাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। অদ্য আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।" রামচন্দ্র খাঁ আদরপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহে লইয়া গিয়া রাখিল। হরিরস পানে দিবা নিশি গৌরচন্দ্র বিভোর থাকিতেন, ইদানীং আহার কেবল নাম মাত্র ছিল। সে দিন দুই চারি গ্রাস ভোজনের পর জগন্নাথ দর্শনবিরহে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নৃত্য কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, কাহারো আর পেট ভরিল না। রজনীতে মহানন্দে ভক্ত-গণ তথায় সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। হরিনামরসে রামচন্দ্রের ভবন আনন্দময় হইল। প্রতিবাসী শত শত নরনারী সেখানে সমবেত হইয়াছিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মালাপ করিয়া নিশাবসানে তাঁহারা নৌকারো-হণ করিলেন। নদীর সলিলসিক্ত স্নিগ্ধ সমীরণ সেবনে এবং লহরীলীলা সন্দর্শনে তাঁহাদের হৃদয় পুলকিত হইল, চৈতন্যের আদেশে মুকুন্দ গান ধরি-লেন। নাবিক সঙ্গীত ধ্বনি শুনিয়া ভয়ে অস্থির হইয়া বলিল, "ওগো ঠাকুর! যে পর্য্যন্ত উড়িষ্যা দেশে না যাই তাবৎ কাল তোমরা একটু নীরব হইয়া থাক; এখানে জলে কুমীর, উপরে বাঘ, নৌকাযোগে দস্যুদল স্থানে স্থানে

ভ্রমণ করে, তাহারা জানিতে পারিলে এখনই সকলের প্রাণ নষ্ট করিবে।" নাবিকের বাক্যে সঙ্গিগণকে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতে দেখিয়া গৌরসিংহ হরি হরি! বলিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। নাবিক ভাবিল কি বিপদ! সাবধান করিতে গিয়া যে আরও গোল বাধিল দেখিতেছি! চৈতন্য সকলকে সাহস দিয়া বলিলেন, "কেন? তোমরা কাহার জন্য এত ভয় কর? বৈষ্ণবগণের বিঘ্নহারী দয়াময় প্রভুর সুদর্শন চক্র এই না সম্মুখে ফিরিতেছে? কিছু চিন্তা নাই, সঙ্কীর্ত্তন কর. তোমরা কি সুদর্শন চক্র দেখিতে পাইতেছ না? হরিভক্তজনকে কে সংহার করিতে পারে? বিষ্ণুর চক্র তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিরন্তর ঘুরিতেছে।" বিশ্বাসী ভক্তগণ স্বীয় অভীষ্টদেবের দৃষ্টিরূপ অভয় কবচে সদাকাল আবৃত থাকিয়া সর্ব্বত্র তন্ময় দর্শন করেন, ভীরু নাবিকের বাক্য কি তাঁহাদিগকে ভীত করিতে পারে? গৌরের অগ্নিময় জীবন্ত বাক্য শ্রবণে সকলে অভয় প্রাপ্ত হইলেন। তখন সকলে নির্ভয় চিত্তে আনন্দ মনে গান করিতে করিতে চলিলেন, এবং নিরাপদে যথাসময়ে উৎকল দেশে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাদের সমাগম বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তদ্দেশীয় বৈষ্ণব ভক্তগণ পথে স্থানে স্থানে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

এক দিন গৌরসুন্দর সঙ্গীদিগকে এক দেবালয়ের নিকট রাখিয়া একাকী পল্লীমধ্যে ভিক্ষা করিতে যান। তাঁহার অনুপম দেহলাবণ্য দেখিয়া গৃহস্থ নরনারীগণ বিবিধ উপাদেয় ফল শস্য এবং তণ্ডুল আনিয়া দিতে লাগিল। সর্ব্বলোকপূজ্য ভক্তাবতার মহাপুরুষ স্বয়ং ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করিতেছেন, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া তরুতল আশ্রয় করিয়াছেন, চিরবৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিয়া সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, আহা! পৃথিবীতে এ দৃশ্য কি মনোহর! এরূপ ভিখারীকে কে না জীবনসর্ব্বস্ব দিতে ইচ্ছা করে? সকলের উপযুক্ত ভিক্ষা আনিয়া তিনি পুনর্ব্বার বন্ধুবর্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রচুর আহার্য্য সামগ্রী দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বুঝিলাম ঠাকুর, তুমি আমাদিগকে পুষিতে পারিবে!" গদাধর এই তণ্ডুল রন্ধন করিয়া ভক্তবৃন্দের সেবা করেন।

পথে কোন এক স্থানে নদী পার হইতেছিলেন, পারের নাবিক জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর! তোমার সঙ্গে কয় জন লোক আছে? চৈতন্য বলিলেন,

আমার সঙ্গে কেহ নাই, আমি একাকী, এবং সকলি আমারই। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে প্রেমধারা বহিতে লাগিল। নাবিক বলিল ঠাকুর, তুমি পার হইয়া যাও, কিন্তু দান না লইয়া সঙ্গের এ সকল লোককে আমি ছাড়িয়া দিব না। প্রথমে তিনি একাকী পার হইয়া পরপারে এক স্থানে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া সঙ্গিগণের চিত্তে যুগপৎ বিষাদ এবং কৌতূহলের উদয় হইল। তাঁহারা কিছু বিস্মিত হইলেন, এবং গুরুদেবের নিরপেক্ষ ভাব দর্শনে তাঁহাদের কিছু আমোদও বোধ হইল। নিত্যানন্দ সকলকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, প্রভু আমাদিগকে ফেলিয়া কখন যাইবেন না। নাবিক কহিল, তোমরাত সন্ন্যাসীর লোক নহ, তবে আমাকে দান দিয়া পার হইয়া চলিয়া যাও। এ দিকে চৈতন্য অধোমুখে বসিয়া এমনি রোদন আরম্ভ করিয়াছেন যে তাহা শ্রবণে পাষাণ বিগলিত হইয়া যায়। নাবিক এই অদ্ভুত ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে সঙ্গিদিগকে প্রভুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। ভক্তগণ তাহার নিকট আপনাদের এবং গৌরের পরিচয় দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন নাবিকের মোহাসক্ত কঠিন হৃদয় বিগলিত হইল, এবং সে সকলকে বিনামূল্যে পার করিয়া দিয়া চৈতন্যের পদতলে লুটাইতে লাগিল।

এইরূপে তাঁহারা আনন্দ মনে হরিগুণ গান করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। গৌরের প্রেমের বেগ এমনি প্রবল যে, শত শত ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিতেছেন তথাপি কিছু মাত্র শ্রান্তিবোধ নাই। ধর্ম্মের জন্য সে সময় তাঁহারা কত কষ্টই সহ্য করিয়া গিয়াছেন! কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা দুঃখ ক্লেশ অনিদ্রায় তাঁহাদের হৃদয়ের শান্তি সুখ উদ্যম হরণ করিতে পারিত না। এক দিন জগদানন্দ নিত্যানন্দের নিকট মহাপ্রভুর দণ্ড রাখিয়া ভিক্ষা করিতে যান, আসিয়া দেখেন যে নিতাই দণ্ড গাছটি ভগ্ন করিয়া বসিয়া আছেন, ইহাতে জগদানন্দের মনে ভয় ও বিস্ময় উপস্থিত হইল। "আমি যাঁহাকে হৃদয়ে বহন করি, সেই প্রাণাধিক গৌরচন্দ্র দণ্ড বহন করিবেন?" এই ভাবিয়া নিতাই তাহা ভগ্ন করিয়াছিলেন। ভগ্ন দণ্ড দর্শন করিয়া চৈতন্য বলিলেন, "আমার দণ্ড কে ভাঙ্গিল? পথে কাহারও সঙ্গে তোমরা কি কন্দল করিয়াছিলে?" নিতাই দণ্ড ভগ্ন করিয়াছেন, চৈতন্য এ কথা শুনিয়া বলিলেন, নিতাই, কেন তুমি

আমার দণ্ড ভগ্ন করিলে? অবধূত উত্তর করিলেন, বাঁশখান ভাঙ্গিয়াছি, যদি ক্ষমা করিতে না পার শাস্তি দাও! গৌরচন্দ্র বলিলেন, যে দণ্ড সর্ব্বদেবের অধিষ্ঠান স্থান, তাহা কি তোমার মতে একখান বাঁশ হইল? চৈতন্যের গম্ভীর আত্মা, স্নেহপূর্ণ হৃদয় কখন কঠোর হইতে জানে না, যাহাকে তিনি প্রহার করেন সে ব্যক্তিও প্রেমে একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, প্রাণতুল্য শিষ্যদিগের প্রতিও তাঁহার নিতান্ত নিরপেক্ষ ব্যবহার ছিল। তখন মহাপ্রভু দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, একমাত্র দণ্ড আমার সঙ্গী ছিল, ঈশ্বরপ্রসাদে তাহাও ভাঙ্গিয়া গেল; যাউক, আর আমার সঙ্গী কেহ নাই; এক্ষণে হয় তোমরা অগ্রসর হও, না হয় বল আমি আগে চলিয়া যাই। শিশুর ন্যায় সরল ব্যবহার, অভিমান রাগের মধ্যেও যেন প্রেমরস পরিপূর্ণ। মুকুন্দ বলিলেন, তবে তুমিই আগে যাও, আমরা পশ্চাতে যাইতেছি। এই স্থান হইতে জলেশ্বরের দেবমন্দির পর্য্যন্ত গৌরসুন্দর একাকী আপনার ভাবে মগ্ন হইয়া চলিয়া গেলেন। তথাকার দেবমূর্ত্তি সকল দেখিয়া মহানন্দে পুলকিত হন। ক্ষণকাল পরে অনুগামী সঙ্গিগণের সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া ঐ স্থানে নৃত্য গীতাদি আরম্ভ করেন। অল্পকাল বিচ্ছেদের পরে গৌরের ভ্রাতৃপ্রেমানল যেন আরও জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তখন তিনি নিতাইকে কোলে লইয়া বলিলেন নিতাই, কোথায় তুমি আমার সন্ন্যাস-ব্রতের সাহায্য করিবে, তাহা না করিয়া তুমি আমাকে আরও পাগল করিতে চাও? আমার মাথা খাও আর এমন কর্ম্ম করিও না। তদনন্তর নিতাইয়ের অনেক প্রশংসা করিলেন, তাহা শুনিয়া অবধূতের মহা লজ্জা বোধ হইল। পথে এক স্থানে পঞ্চ মকারের সেবক এক জন মদ্যপায়ী সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়, সে ইহাঁদিগকে আপনার মঠে লইয়া আনন্দ করিতে চাহিয়াছিল। পুরীর পথে অনেক সুরম্য দেবালয় এবং রমণীয় স্থান আছে, প্রায় প্রত্যেক স্থানেই মহাপ্রভু নৃত্য গীত সঙ্কীর্ত্তন বিহার করিয়াছিলেন। দেবমূর্ত্তি দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। হরিভক্তিরসে সর্ব্বক্ষণ জীবন অভিষিক্ত, প্রাকৃতিক বাহ্য শোভা দেখিয়াই মনে কত আহ্লাদ, দেবালয় বিগ্রহ মূর্ত্তি দেখিলেত হইবেই; কারণ, তাহাদের সঙ্গে তিনি চির দিন পবিত্র ভাবযোগে দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ ছিলেন। যাজপুরে অনেক দেবালয় আছে। সে সমস্ত একাকী দেখিবার জন্য তিনি এক দিন সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করেন। পর দিন আবার সকলের সহিত মিলিত হন। যাজপুর, কটক,

ভুবনেশ্বর অতিক্রম করিয়া কমলপুর নামক স্থানে তাঁহারা সকলে উত্তীর্ণ হইলেন। সেখান হইতে জগন্নাথের ধ্বজা নয়নগোচর হয়। ধ্বজা দেখিয়াই চৈতন্যদেব বিশাল হুঙ্কার ধ্বনির সহিত ভক্তিভাবে একেবারে হতচেতন হইয়া পড়িলেন। এ স্থান হইতে পুরী চারি দণ্ডের পথ, কিন্তু পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করিয়া আসিতে আসিতে তাঁহার তিন প্রহর সময় লাগিয়াছিল। মহাভাবরসে মণ্ডিত গৌরতনু দর্শনে তীর্থবাসী সাধু এবং অপর যাত্রিগণ এককালে মুগ্ধ হইয়া গেল। সে রূপ যাহারা এক বার দেখিল তাহারা আর ভুলিতে পারিল না। জগন্নাথ ক্ষেত্রে আঠার নালায় আসিয়া গৌরচন্দ্র আপনার সমভিব্যাহারী ভক্তগণের নিকট প্রমুক্ত হৃদয়ে বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

জগন্নাথ দেবের অপরূপ শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের জন্য চৈতন্যদেবের এত দূর ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল যে, শেষোক্ত স্থানে তিনি সঙ্গিগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া একাকী পুরীর মধ্যে চলিয়া যান। দুই চক্ষে নিরন্তর প্রেমের অগ্নি জ্বলিতেছে, যাহা কিছু দেখেন তাহাতেই ভাবোদয় হয়, বিশেষতঃ তখন জগন্নাথের দর্শনপিপাসা তাঁহার মনে অতিশয় ঘনীভূত হইয়াছিল; শ্রীমন্দিরে পৌঁছিয়া যাই সেই বিগ্রহ মূর্ত্তি দেখিলেন, অমনি অনুরাগের আবেশে উন্মত্ত হইয়া হুঙ্কারনাদে ঠাকুরকে কোলে করিবার জন্য সেই দিকে ধাবিত হইলেন। ঠাকুরের নিকট পর্য্যন্ত আর যাইতে হইল না, মন্দিরমধ্যে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। তৎকালে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে প্রহরী পাণ্ডাদিগের বেত্রাঘাত হইতে রক্ষা করিয়া নিজশিষ্য দ্বারা আপনভবনে পাঠাইয়া দেন। বাহকগণ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া হরি হরি বলিতে বলিতে সার্ব্বভৌমের গৃহে পৌঁছিয়া দিল। নবীন সন্ন্যাসীর অসাধারণ প্রেমবিকার, তেজঃপুঞ্জ দেহকান্তি অবলোকনে ভট্টাচার্য্যের মন বিস্ময়রসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। গৌরাঙ্গের সে দিনকার মূর্চ্ছা অতি গাঢ় এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এমন প্রগাঢ় মূর্চ্ছা যে, তিনি জীবিত কি মৃত তাহা জানিবার জন্য তাঁহার নাসিকার নিকট তুলা রাখিয়া পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল। তদনন্তর রাজপণ্ডিত স্থির হইয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, ইহা দেখিতেছি নিত্যসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের জীবনে যে সুদীপ্ত মহাভাব লক্ষিত হয় সেই প্রেমের সাত্ত্বিক বিকার! এই আশ্চর্য্য অদ্ভুত ভাব দর্শনান্তর সুবিজ্ঞ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

এ দিকে নিতাই মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সিংহদ্বারে আসিয়া পথিকদিগের মুখে শুনিলেন, এক জন গোসাঞী মন্দিরে এইরূপ এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে আপনগৃহে লইয়া গিয়াছেন। ইত্যবসরে হঠাৎ সেই স্থানে গোপীনাথ আচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি নবদ্বীপবাসী বিশারদের জামাতা, সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি, এবং গৌরের এক জন অনুবর্ত্তী প্রেমিক বৈষ্ণব। গোপীনাথকে পাইয়া তাঁহারা বড় আহ্লাদিত হইলেন। পরে তাঁহার সঙ্গে সকলে উক্ত ভট্টাচার্য্যের আলয়ে উপনীত হন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এক জন প্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ পণ্ডিত, নিবাস পূর্ব্বে নবদ্বীপে ছিল, এক্ষণে পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্রের সভাপণ্ডিত এবং জগন্নাথ মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক। চৈতন্য সেই যে ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন আর সংজ্ঞা মাত্র নাই, তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অচৈতন্যাবস্থাতে অতিবাহিত হইল। নিত্যানন্দ প্রভৃতি পঞ্চ জন প্রভুকে তদবস্থায় রাখিয়া জগন্নাথদর্শনে চলিয়া গেলেন। গৌরের অদ্ভুত ভাবাবেশ দেখিয়া সার্ব্বভৌমের মনে শঙ্কা হইয়াছিল যে পাছে নিত্যানন্দাদি সঙ্গিগণও মন্দির মধ্যে গিয়া বেসামাল হইয়া পড়েন, তজ্জন্য তিনি আবার সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন। তদনন্তর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্বীয় ভগ্নীপতি এবং আগন্তুক মুকুন্দকে নিকটে রাখিয়া সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করত জানিলেন, যে তিনি বিশারদের বন্ধু নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র। এত অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হইয়াছেন শুনিয়া ভট্টাচার্য্যের মনে বড় এক আশ্চর্য্য ভাব উদয় হইল। কিছু কাল পরে নিত্যানন্দ ফিরিয়া আসিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা চৈতন্যের মূর্চ্ছাপনোদন করেন। চেতনা লাভ করিয়া মহাপ্রভু সমুদ্রে স্নান করিতে গেলেন, পরে একত্র সকলের সঙ্গে জগন্নাথের প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। প্রসাদের মধ্যে লাফরাঘণ্ট তাঁহার নিকট বড় উপাদেয় বোধ হইয়াছিল। আর আর সমস্ত সুখাদ্য বস্তু অন্যকে খাইতে বলিয়া তিনি কেবল লাফরা (ভূতঘণ্ট) আর ভাত খাইলেন। সার্ব্বভৌম স্বহস্তে তাঁহাদিগকে প্রসাদ পরিবেশন করিয়াছিলেন। এই প্রেমোন্মত্ত যুবক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া অবধি তাঁহার চিত্ত ভাবান্তরিত হইয়াছিল। অতঃপর গোপীনাথ আপনার মাসীর ভবনে আগন্তুক ভক্তদিগের জন্য বাসা স্থির করিয়া দিলেন।

---

# সার্ব্বভৌমের ভক্তিগ্রহণ।

মত্ততার অবসানে গৌরাঙ্গ প্রভু উঠিয়া বসিলে সার্ব্বভৌম "নমো নারায়ণ" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। শচীতনয় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমার কৃষ্ণভক্তি হউক!" তিনি যে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, ইহা তখন ভট্টাচার্য্যের বোধগম্য হইল। সার্ব্বভৌম জ্ঞানেতে অদ্বৈতবাদী, কিন্তু বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানে কিয়ৎ পরিমাণে বৈষ্ণবের ন্যায় ছিলেন। এই কারণে তিনি জ্ঞানী পণ্ডিত হইয়াও জগন্নাথের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। পণ্ডিত মানুষ কি না, তাই ভারতী ইত্যাদি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে অতি নিকৃষ্ট মনে করিতেন। তিনি অনুষ্ঠানে পৌরাণিক, কিন্তু ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে বৈদান্তিক দর্শনবিদ্ পণ্ডিত, এই জন্য উভয় ভাবের আভাস তাঁহার ব্যবহারে লক্ষিত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি গৌরাঙ্গকে বলিলেন, সহজেই তুমি পূজ্য, তাহাতে আবার সন্ন্যাসী, অতএব আমি তোমার দাস হইলাম। ইহা শুনিয়া চৈতন্য বিষ্ণু স্মরণ করত বলিলেন, আমি বালক, কিছুই জানি না, তুমি গুরুতুল্য ব্যক্তি, তোমার আশ্রয় লইয়াছি, আমার প্রতি দয়া রাখিবে; অদ্য তোমারই কৃপায় আমি শ্রীমন্দিরে রক্ষা পাইয়াছি। আর আমি ভিতরে যাইব না, বাহিরে থাকিয়া ঠাকুর দর্শন করিব। যাহাতে আমি ভাল থাকি, সংসারকূপে না পড়ি, এমন উপদেশ তুমি আমাকে দাও; তোমার কৃপার উপর আমার সমস্ত নির্ভর করিতেছে। পণ্ডিত বলিলেন তুমি এত অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া ভাল কর নাই। যদিও মাধবপুরী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সমস্ত বিষয়সুখ ভোগ করিয়া শেষ বয়সে সন্ন্যাসী হন। সার্ব্বভৌমের সহিত আলাপ করিয়া গৌরচন্দ্র গোপীনাথের সঙ্গে নূতন বাসায় চলিয়া গেলেন, এবং সন্ধ্যাকালে ঠাকুরের আরতি দেখিলেন।

এইরূপে তাঁহারা পুরিতে থাকেন, এক দিন মুকুন্দ এবং গোপীনাথ সার্ব্বভৌমের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন দেখ, এই বিনীত স্বভাব প্রেমিক সন্ন্যাসীর প্রতি আমার অত্যন্ত ভালবাসা সঞ্চারিত হইয়াছে; এমন যৌবন বয়সে ইহাঁর সন্ন্যাসধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা পাইবে তাহাই ভাবিতেছি। আমি তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছি। ইনি কাহার

নিকট দীক্ষিত হইলেন, ইহাঁর উপদেষ্টা কে, বল দেখি শুনি? যখন শুনিলেন ভারতীসম্প্রদায়ের কেশব ভারতী নামক দণ্ডীর নিকট চৈতন্য দীক্ষিত হইয়াছেন, তখন ভট্টাচার্য্যের মন বড় ক্ষুব্ধ হইল। তাঁহাকে ক্ষুব্ধ হইতে দেখিয়া গোপীনাথ আচার্য্য বলিলেন, সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী হওয়া উদ্দেশ্য, অমুক সম্প্রদায় ভাল কি অমুক সম্প্রদায় মন্দ তদ্বিষয়ে প্রভুর দৃষ্টি নাই, সে সব কেবল লোকগৌরব বাহ্য ভাব মাত্র। ভট্টাচার্য্য এ কথার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বুঝাইয়া বলিলেন, লৌকিক বাহ্যাড়ম্বর ইহাতে লিপ্ত আছে বলিয়া কোন আশ্রমকে উজ্জ্বল করা এই ব্যবহারটি সামান্য মনে করিবে না। তাঁহার মতে গিরি, পুরী, তীর্থ প্রভৃতি সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ। আশ্রম বা সম্প্রদায়নিষ্ঠা বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যে এত প্রবল দেখা যায় ইহার ভিতরে একটি গভীর অর্থ আছে। "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ" ইত্যাদি পদ্মপুরাণোক্ত শ্লোকের দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে, সম্প্রদায়বর্জ্জিত ব্যক্তিদিগের মন্ত্র নিষ্ফল হয়। এই জন্য বৈষ্ণবগণ সর্ব্বাগ্রে সম্প্রদায়, শ্রীপাঠ, গুরু ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। সম্প্রদায় যে বিধিপ্রেরিত মুক্তির বিধান এতদ্দ্বারা এই গুরুতর সত্যই সপ্রমাণ করিতেছে। বিধানে অর্থাৎ সম্প্রদায়ে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে ধর্ম্মদ্রোহী যথেচ্ছাচারী বলিয়া যে কেহ কেহ মনে করেন ইহা ঠিক নয়। কারণ, ভগবান্ সকল ঘটেই বিরাজ করেন; তিনি পতিতপাবন অগতির গতি; তবে বিধানবিরোধী ব্যক্তি যে কঠোর হৃদয় বৌদ্ধ, ভক্তিরসহীন অল্পবিশ্বাসী এ কথার অবশ্য অর্থ আছে। অতঃপর সম্প্রদায়ের গুরু লঘু বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিচার করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, যদি আমি ইহাঁকে পাই, তাহা হইলে বেদান্ত শুনাইয়া যোগপট্ট পরাইয়া পুনরায় অদ্বৈতমার্গে আনয়ন করিবে। তচ্ছ্রুবণ গোপীনাথ নিতান্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে কহিতে লাগিলেন, তুমি ইহাঁর মহিমা জান না। স্বয়ং ভগবান্ চৈতন্যরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তুমি অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ভূরি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ সত্য, কিন্তু ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত গৌরের তত্ত্ব কেহ বুঝিতে পারে না। সার্ব্বভৌমের ছাত্রগণ গোপীনাথের কথা শুনিয়া উপহাস করিল, এবং অনুমান ভিন্ন ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, এইরূপ বলিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য নিজেও, কলিতে যুগাবতার হওয়া সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন উল্লেখ নাই, ইহা অপ্রামাণ্য কথা, গ্রাহ্য হইতে পারে না, ইত্যাদি অনেক কথার বাদানুবাদ করিলেন। গোপীনাথ বলিলেন, জ্ঞানেতে বস্তু-

তত্ত্ব কেবল জানা যায় মাত্র, কিন্তু ঈশ্বরকৃপা ভিন্ন সে বস্তুর প্রমাণসিদ্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না। অতএব ভট্টাচার্য্য, তুমি প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখিয়াও বস্তু চিনিতে পারিলে না? শ্যালক ভগ্নীপতি সম্বন্ধ, তর্কের সঙ্গে উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু উপহাস বিদ্রূপও চলিয়াছিল। কিন্তু মুখে তর্ক বিতর্ক করিলে কি হইবে, ও দিকে গৌরপ্রেমের সুতীক্ষ্ণ বড়শীতে সার্ব্বভৌমের হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অদ্বৈত এবং দ্বৈতবাদ, জ্ঞান এবং ভক্তিপথসম্বন্ধে উভয়েই বহুল শাস্ত্র প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। সে সময়ে প্রধান প্রধান ভক্ত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেক বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। মায়াবাদী পণ্ডিত হিন্দু শাক্তগণ এবং ভক্তিপথাবলম্বী বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এ প্রকার তর্কবিবাদের অল্পতা ছিল না। গোপীনাথ বিতণ্ডা করিতে করিতে ক্রমে উত্তেজিত হইয়া দুই একটা শক্ত কথাও বলিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর সার্ব্বভৌম বলিলেন, তুমি এখন বাসায় যাও, গোসাঞীজীকে আমার নিমন্ত্রণ বলিবে, কল্য সশিষ্য তিনি আমার গৃহে যেন ভিক্ষা করেন।

চৈতন্য গোপীনাথের প্রমুখাৎ ঐ সমস্ত বাদানুবাদের কথা শুনিলেন, কিন্তু সার্ব্বভৌমের প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন না, বরং তাঁহার বিষয়ে অনুরাগ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে সেই রাজপণ্ডিত মহা দিগ্‌গজ জ্ঞানীকে তিনি বিনয় ভক্তির জালে একবারে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌমের বয়ঃক্রমও অধিক, অন্তরে জ্ঞানের যথেষ্ট গরিমাও আছে, গৌরকে আপনার মতে আনিবেন, বেদান্ত শুনাইবেন, এই বড় অভিলাষ। বিচারে পরাজয় করিয়া তাঁহার উপর যে স্বীয় প্রতিপত্তি বিস্তার করিবেন এরূপ ইচ্ছা নহে, কেন না, মহাপ্রভুর স্বাভাবিক আকর্ষণ শক্তিতে তিনি ইতিপূর্ব্বেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন; সেই জন্য তাঁহাকে শাস্ত্রানুযায়ী প্রকৃত সন্ন্যাসী করিতে তাঁহার মনে বড় ঔৎসুক্য জন্মিল। এক দিন শ্রীমন্দিরে প্রভুর দেখা পাইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বেদান্ত পড়িতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে স্নেহসম্বোধন পুরঃসর বলিলেন, দেখ বাপু! বেদান্ত শ্রবণ করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, অতএব আমি পাঠ করিতেছি তুমি শ্রবণ কর। ক্রমাগত উপর্য্যুপরি সাত দিন তিনি পড়িয়া যান, চৈতন্যের মুখে হাঁ, কি না, কোন কথাই নাই, বিনম্রভাবে অনুগত শিষ্যের ন্যায় কেবল শুনিয়াই যাইতেছেন। অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ক্রমাগত সাত দিন কেবল শুনিয়াই যাইতেছ, ভাল মন্দ কিছুই বল না, বুঝিতেছ কি না, তাহাও জানি না, এ বিষয়ে তোমার

বক্তব্য প্রকাশ কর? সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি মূর্খ, কি জানি, কিই বা বলিব, তোমার আজ্ঞায় এবং সন্ন্যাসধর্ম্মের অনুরোধে কেবল মাত্র শুনিতেছি, কিন্তু তোমার কৃত অর্থ আমার বোধগম্য হইতেছে না। সূত্রের অর্থ বেশ পরিষ্কার বুঝিতেছি, কিন্তু ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার চিত্ত বিকল হইতেছে। ভাষ্যের দ্বারা সূত্রের অর্থ প্রকাশিত হয়, কিন্তু তুমি সেই ভাষ্যদ্বারা সূত্রের মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করিয়া কল্পিত গৌণার্থ ব্যাখ্যা করিতেছ। ব্যাসসূত্রে উপনিষদের যথার্থ অর্থ প্রকাশিত আছে, কিন্তু তোমার স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘের ন্যায় সূর্য্যকিরণতুল্য সেই মূলার্থকে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বেদ এবং পুরাণে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু, ঐশ্বর্য্য লক্ষণে ভূষিত হইয়া তিনি ঈশ্বর হইয়াছেন। যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ ভগবান্ তাঁহাকে কি না তুমি নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছ? শ্রুতি সকল তাঁহাকে এই জন্য নির্ব্বিশেষ নিগুর্ণ বলিযাছে যে সৃষ্ট পদার্থের লক্ষণ তাঁহাতে নাই। তাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া তাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়; তিনি স্বয়ং অপাদান, করণ এবং অধিকরণ কারক, ইহাই তাঁহার বিশেষ চিহ্ন। তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া প্রাকৃত শক্তি অর্থাৎ মায়াকে অবলোকন করিলেন,—প্রাকৃত চক্ষে নহে, অপ্রাকৃত নয়নে তিনি অবলোকন করিলেন। বেদেতে যে নিগূঢ় অর্থ নিশ্চিত হয় নাই তাহা পুরাণদ্বারা হইয়াছে। শ্রুতিতে বলে তাঁহার হস্ত পদ নাই, অথচ তিনি চলেন, গ্রহণ করেন। অতএব মুখ্যার্থে শ্রুতিতে তাঁহাকে সবিশেষ বলে, কল্পিত অর্থে নির্ব্বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যিনি, যে ব্রহ্মেতে স্বাভাবিক সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিন শক্তি বিরাজ করে, তাঁহাকে তুমি নিঃশক্তি বলিতেছ? ঈশ্বরের স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা এই তিন শক্তিতে মিলিত হইয়া পরাশক্তিযোগে ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়াছেন। এই পরাশক্তি হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ * ভেদে ত্রিবিধ। অন্তরঙ্গাপরাশক্তি এবং ঈশ্বর, ইহা অভিন্ন ও অদ্বিতীয়। বহিরঙ্গামায়াশক্তি এবং তটস্থাজীবশক্তি

* ঈশ্বর সত্য স্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ, অথচ যে শক্তিযোগে তিনি সমুদায় দেশ কালের সঙ্গে সংযুক্ত হন তাহাকে সন্ধিনী বলে। যে শক্তিযোগে তিনি সমুদায় জানেন তাহাকে সংবিৎ, এবং যে শক্তিযোগে আনন্দ অনুভব করেন তাহাকে হ্লাদিনী শক্তি বলে।

উপাদান, এবং পরাশক্তি নিমিত্তকারণ। এই উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ-যোগে চরাচর সৃষ্ট হইয়াছে।” এই শক্তিত্রয়বিশিষ্ট ঈশ্বরকেই চৈতন্য কৃষ্ণ বলিতেন। অমূর্ত্ত ঈশ্বরের আশ্রয়ীভূত মূর্ত্ত ঈশ্বর, যথা স্বচ্ছ স্ফাটিকমণি এবং তাহার আভা, অর্থাৎ নিত্য এবং লীলা এই উভয় স্বরূপে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। উন্নত শ্রেণীর ভক্তগণ প্রাকৃত মূর্ত্তি স্বীকার করেন না, কিন্তু উঁহাকে ঘনচিদানন্দরূপে গ্রহণ করেন। তদনন্তর প্রভু বলিলেন, এমন যে মায়াধীশ ভগবান্, মায়াবশ জীবের সঙ্গে তাঁহাকে এক করিতেছ? শুদ্ধসত্বময় এই যে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, ইহা যাহারা না মানে তাহারা বেদ মানিয়াও বৌদ্ধের ন্যায় নাস্তিক। জীবের নিস্তার জন্য ব্যাসদেব যে সূত্র করিয়াছেন, মায়াবাদীর ভাষ্যে তাহার বিপরীত অর্থ হয়। জীবের আত্মবুদ্ধি মিথ্যা, কিন্তু জগৎ মিথ্যা নহে, নশ্বর।

চৈতন্যের এই সকল কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম অবাক্ হইলেন, তথাপি সাধ্যানুসারে তর্ক করিতে ছাড়িলেন না। কিন্তু শেষে একেবারেই তাঁহাকে পরাস্ত হইতে হইল। পণ্ডিতকে নির্ব্বাক্ ও বিস্ময়াপন্ন দেখিয়া চৈতন্য বলিলেন, ভট্টাচার্য্য! তুমি বিস্মিত হইও না, ভগবানেতে যে ভক্তি ইহাই পরম পুরুষার্থ জানিবে। আত্মারাম মুনিগণ তাঁহাকেই ভজনা করেন। ভাগবতে সৌনকাদির প্রতি সূত এইরূপ বলিয়াছেন, “আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থংভূতগুণো হরিঃ”। হরির এমনি গুণ যে, বিমুক্ত চিত্ত আত্মারাম মুনিগণও সেই মহিমান্বিত দেবতাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। ভট্টাচার্য্য এই শ্লোকের অর্থ শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে চৈতন্য বলিলেন, অগ্রে তুমি ব্যাখ্যা কর, তাহার পর আমি যাহা জানি বলিতেছি। সার্ব্বভৌম তর্কশাস্ত্র অনুসারে নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। তখন প্রভু ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন, ভট্টাচার্য্য! তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, এরূপে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার আর কাহারো ক্ষমতা নাই, কিন্তু তুমি কেবল পাণ্ডিত্যের প্রতিভায় ব্যাখ্যা করিলে; ইহা ব্যতীত শ্লোকের আরও অভিপ্রায় আছে। পরে তিনি ইহার আঠার প্রকার নূতন অর্থ করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন। তখন সার্ব্বভৌম কেবল পরাজয় স্বীকার করিলেন তাহা নহে, উক্ত শ্লোকের ভাবরসে মত্ত হইয়া গৌরকে শত শ্লোক দ্বারা স্তব স্তুতি বন্দনা করিতে লাগিলেন, এবং ভক্তি প্রেমের লক্ষণ সকল তাঁহার শরীরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এক জন সুবিখ্যাত রাজপণ্ডিত

এইরূপে চৈতন্যের অনুবর্ত্তী হন, এবং ভক্তিরসে মাতিয়া উঠেন। তাঁহার এই পরিবর্ত্তনে পুরীমধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল, উৎকল প্রদেশের শত শত লোক গৌরাঙ্গের অলৌকিক মহত্ত্ব বুঝিতে পারিল। শেষ এমনি হইল যে, যেখানে যখন তিনি উপস্থিত হন সেখানে চারিদিক্ হইতে হরি-ধ্বনি উঠে। নগরময় প্রচারিত হইল যে, গৌড়দেশ হইতে একজন পরম ভাগবত প্রেমিক সন্ন্যাসী আসিয়া সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে বিচারে পরাভূত করত হরিভক্তিতে তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়াছেন।

বিচারের পর দিন অতি প্রত্যূষে জগন্নাথের প্রসাদ হস্তে লইয়া চৈতন্য-দেব একবারে সার্ব্বভৌমের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাতঃকৃত্যের পূর্ব্বেই বৈদিক আচার লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিতে হইল। অনন্তর দুই জনে ভাবে প্রমত্ত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য চৈতন্যের প্রতি এত দূর আসক্ত হইয়া পড়িলেন যে, দিবা নিশি ঐ ধ্যান ঐ জ্ঞান; গৌর ভিন্ন আর কোন কথা নাই। ভাগবত পাঠ করেন, তাহাতেও মুক্তির স্থানে ভক্তি অর্থ করেন। মুক্তিতে ত্রাস এবং ঘৃণা, ভক্তিতে রুচি এবং উল্লাস জন্মিতে লাগিল। ঘোর মায়াবাদী গম্ভীরপ্রকৃতি পণ্ডিতের মুখে এ প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়া চৈতন্য নিরতিশয় প্রীত হইলেন, তাঁহার ভক্তিপ্রলাপ দর্শনে অপর ভক্তগণও হাসিতে লাগিলেন। তখন কোথায় বা রহিল তাঁহার জ্ঞানগর্ব্ব, কোথায় বা সে বিজ্ঞতা গাম্ভীর্য্য, বালকের ন্যায় নাচিতে গাইতে এবং হাসিতে কাঁদিতে লাগিলেন। কত দূর তাহার মত্ততা জন্মিয়াছিল তাহা এই শ্লোকদ্বারা বিশদ-রূপে পরিস্ফুরিত হইয়াছে। "পরিবদতু জনো যথা তথায়ং নন্নু মুখরো বয়ং ন বিচারয়াম। হরিরসমদিরামদাতিমত্তা ভুবি লুঠামনটাম নির্ব্বিশাম॥" যেখানে সেখানে লোকে পরিবাদ করুক না কেন, মুখর বলিয়া তাহাদিগকে আমরা বিচার করিব না। হরিরসমদিরাপানে মত্ত হইয়া আমরা ভূমিতে লুণ্ঠিত হইব, নৃত্য করিব এবং সম্ভোগ করিব। ভট্টাচার্য্য ভাবে মোহিত হইয়া এই শ্লোকটি দ্বারা চৈতন্যের মহিমা বর্ণন করিয়াছিলেন। "কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ; প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদার-বিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥" বৃহন্নারদীয় পুরাণোক্ত "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" এই বচনদ্বারা চৈতন্য সার্ব্বভৌমকে উপদেশ প্রদান করত সর্ব্বদা তাঁহাকে

সঙ্কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। ক্রমে সেখানেও দুই একটি করিয়া ভক্ত দল বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

কিছু দিন পরে মাধবপুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরী এবং দামোদর নামক এক জন ভক্ত ও প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, প্রেমানন্দ, শঙ্কর পণ্ডিত, ভগবান্ আচার্য্য প্রভৃতি অনেকে সেখানে একত্রিত হইলেন। ভক্তসমাগমে অল্পকালমধ্যে নীলাচলধাম দ্বিতীয় নবদ্বীপ হইয়া উঠিল। তদনন্তর কয়েক দিবস পরে গৌরাঙ্গ প্রভু সমুদ্রতীরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তথায় চন্দ্রের শুভ্র কিরণ, দক্ষিণ মলয়বায়ু, ফেনময় উত্তালতরঙ্গশ্রেণী এবং দিগন্তব্যাপ্ত প্রশান্ত জলরাশির শোভা তাঁহার চিরপ্রমত্ত হৃদয়কে আরও উন্মাদ করিয়া তুলিল। সেই নির্জ্জন সুরম্য প্রদেশে কিছু দিন পর্য্যন্ত বৈষ্ণবগণের সঙ্গে তিনি সৎ-প্রসঙ্গ এবং নামসঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন ছিলেন। ঘননীল বিশালবক্ষ জলনিধির গাম্ভীর্য্য দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর প্রাণ নিরন্তর আনন্দসাগরে ভাসমান থাকিত। গদা-ধর সদা সর্ব্বক্ষণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন ও ভাগবত পড়িয়া শুনাইতেন। সমুদ্র উপকূলে কিছু দিন এইরূপে ভক্তগণসঙ্গে বিহার করিয়া তিনি তীর্থ ভ্রমণোপলক্ষে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে চলিয়া যান।

## তীর্থভ্রমণ ও রামানন্দের সহিত মিলন।

চৈতন্য পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের প্রারম্ভে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া ফাল্গুন মাসে নীলাচলে গমন করেন, ফাল্গুনের দোলযাত্রা দেখিয়া চৈত্র মাসে সার্ব্বভৌমকে ভক্তি প্রদান করিয়া বৈশাখের প্রথমে তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হন। সিন্ধুতটে সাধুসঙ্গে বিহার করিতে করিতে একদা তিনি সকলের নিকট এই ভিক্ষা চাহিলেন যে, তোমরা এক্ষণে আমাকে কিছু দিনের জন্য বিদায় দাও, আমি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বিশ্বরূপের অন্বেষণে যাইব, কাহাকেও সঙ্গে লইব না। যাবৎ আমি প্রত্যা-গমন না করি তাবৎকাল তোমরা আমার জন্য এই স্থানে প্রতীক্ষা করিয়া থাক। এ কথা শুনিয়া তাঁহাদের মুখ ম্লান হইল। নিতাই বলিলেন, এমন কথা তুমি কিরূপে বলিলে যে একাকী যাইব? ইহা কে সহ্য করিতে পারে? যাহাকে ইচ্ছা কর আমরা দুই এক জন সঙ্গে যাই; বিশেষ-

দক্ষিণের তীর্থ স্থান আমি অবগত আছি, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" চৈতন্য বলিলেন, তোমাদের ভালবাসায় আমার ব্রতভঙ্গ হয়। একবারত তুমি আমার দণ্ড ভঙ্গ করিয়া ফেলিলে। জগদানন্দের ইচ্ছা যে আমি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি। তাঁহার কথা যদি না শুনি, তিনি রাগ করিয়া তিন দিন হয়ত কথাই কহিবেন না। আমি সন্ন্যাসী হইয়া প্রতি দিন তিন বার স্নান করি, মাটিতে শুই, মুকুন্দের প্রাণে ইহা সহ্য হয় না; তাঁহার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আমার কষ্ট বোধ হয়। আমিত সন্ন্যাসী, দামোদর আবার আমার উপর ব্রহ্মচারী হইয়া সর্ব্বদা উপদেশের দণ্ড ধরিয়া আছেন। ঈশ্বর-কৃপায় ইনি কোন লোকের মুখাপেক্ষা করেন না, কিন্তু আমি তাহা না করিয়া পারি না। অভিযোগচ্ছলে এইরূপে বন্ধুগণের প্রতি প্রগাঢ় ভাল-বাসা প্রকাশ করিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন, তোমার দুইটী হাতত সর্ব্বদা নাম জপেই বদ্ধ, প্রেমাবেশে কোথায় কখন অচেতন হইয়া পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই, অতএব এই কৃষ্ণদাস নামক সরল হৃদয় ব্রাহ্মণটী তোমার কৌপীন, বহির্ব্বাস, জলপাত্র লইয়া সঙ্গে যাইবেন, কোন কথা বার্ত্তা কহি-বেন না, যাহা তুমি বলিবে তাহাই করিবেন, অতএব তুমি ইহাঁকে সঙ্গে লইয়া যাও।

অনন্তর চৈতন্য সার্ব্বভৌমের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। ভট্টা-চার্য্যের অনুরোধে আরো চারি পাঁচ দিন তাঁহাকে থাকিতে হইল। বিদায়-কালে সার্ব্বভৌম বলিয়া দিলেন, গোদাবরী নদীতীরে পরমজ্ঞানী এবং ভক্ত রামানন্দ রায় আছেন, তাঁহার সঙ্গে অবশ্য অবশ্য দেখা করিয়া যাইবে, বিষয়ী দেখিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিবে না, তাঁহাতে পাণ্ডিত্য এবং ভক্তি-রস উভয়ের সামঞ্জস্য হইয়াছে। রামানন্দের মহত্ত্ব আমি এত দিন না বুঝিয়া তাঁহাকে কত পরিহাস করিয়াছি, এখন তোমার চরণপ্রসাদে তাঁহা-কেও চিনিতে পারিলাম। সার্ব্বভৌমের বচন অঙ্গীকার করিয়া বিদায় লইবার সময় চৈতন্য তাঁহাকে এই উপদেশ দিলেন যে, তুমি ঘরে বসিয়া কৃষ্ণনাম ভজনা করিতে থাক, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার প্রসাদে পুনরায় আমি নীলাচলে ফিরিয়া আসি। এই কথা বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, ভট্টাচার্য্য শোকে মুগ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িলেন; চৈতন্য তাঁহার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। মহাপুরুষদিগের লৌকিক ব্যবহার

অচিন্তনীয়। এক দিকে যেমন তাঁহাদের হৃদয় পুষ্পের ন্যায় সুকোমল, তেমনি অপর দিকে বজ্রের ন্যায় কঠিন। এই জন্য ভবভূতি বলিয়াছেন, "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥" বজ্রতুল্য কঠিন, কুসুমতুল্য কোমল যে মহৎ ব্যক্তিদিগের চরিত্র তাহা কে জানিতে সক্ষম ? গৌরচন্দ্র আলালনাথ নামক স্থানে উপনীত হইলে ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া সে রাত্রি তথায় বাস করিলেন। পর দিন সেই স্থানে নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন হইল, চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিতে লাগিল। এত লোকের সমাগম হইল যে তাঁহারা আহার করিতে অবসর পান না ; পরিশেষে দেবালয়ের দ্বার বদ্ধ করিয়া সকলে আহারাদি করেন। দ্বিতীয় রজনীও এই স্থানে অতিবাহিত হয়। তৎপর দিবস চৈতন্য দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। তাঁহার বিরহে সঙ্গী ভক্ত পঞ্চজন মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিলেন ; সে দিকে প্রভু আর না চাহিয়া একাকী উদাসীনভাবে চলিয়া গেলেন, কৃষ্ণদাস কমণ্ডলু হস্তে লইয়া যোগিবরের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। নিতাই প্রভৃতি কয়েক জন সঙ্গী সে দিন আলালনাথে সমস্ত সময় উপবাসী থাকিয়া পর দিন পুরিতে ফিরিয়া আসেন।

মহাত্মা চৈতন্য উচ্চ নিনাদে হরিনাম গান করিতে করিতে পথে চলিতে লাগিলেন। গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌমের প্রেরিত কয়েকটি ব্রাহ্মণ সঙ্গে গিয়াছিল। গৌর যেখানে সে দিন বাস করিতেন সেখানে বহু লোক একত্রিত হইয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিত এবং বৈষ্ণব হইয়া যাইত। অনেকে আবার তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্যও প্রার্থী হইত। ইহা কেবল তীর্থভ্রমণ নহে, এই উপলক্ষে একাকী দেশে দেশে হরিভক্তিও তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে যাহা করেন নাই, তীর্থে বাহির হইয়া তাহা করিয়াছিলেন। দক্ষিণের শৈব ও রামাইৎ সম্প্রদায়স্থ অনেক লোককে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। কর্ণাটরাজ্যে গিয়াছিলেন, তথাকার লোকেরা তাঁহার অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় ধর্ম্মভাব দর্শনে ভক্তিপথ আশ্রয় করে। ক্রমে বহু দেশ গ্রাম নগর নদী পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তিনি গোদবরী নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। নদীতে স্নান করিয়া তত্তীরবর্ত্তী এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় বহু লোক জন সঙ্গে লইয়া দোলারোহণে রায় রামানন্দ তথায় স্নান করিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে বাদ্য বাজিতেছে, বৈদিক ব্রাহ্মণগণ দলবদ্ধ হইয়া আসিতেছে, ইহা দেখিয়াই চৈতন্য

বুঝিলেন যে ইনিই সেই রামানন্দ। এমনি তাঁহার প্রেমের উত্তেজনা যে, তখন ইচ্ছা হইল দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। অনন্তর বেগ সম্বরণ করিয়া কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, পরে সন্ন্যাসী দেখিয়া রামানন্দ আপনিই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। যোগিবরের প্রদীপ্ত মুখশ্রী, সুকোমল পদ্মাক্ষ দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে রায় তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। পরিচয়ের পূর্ব্বেই উভয় উভয়কে চিনিতে পারিলেন। সঙ্গের লোক জন ইহাঁদের ভাব ভক্তি দেখিযা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তদনন্তর নানাবিধ ইষ্টালাপ এবং সার্ব্বভৌমের বিষয় আলোচনা করিয়া রামানন্দ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার সহিত চৈতন্যের ভক্তির নিগূঢ় তত্ত্বসম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ আলোচনা হয় তাহার সার এখানে বিবৃত হইতেছে। চৈতন্য প্রশ্ন করেন, রামানন্দ রায় তাহার উত্তর দেন।

গৌরাঙ্গ গোসাঞা সন্ধ্যাকালে স্নান করিয়া এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে বসিয়া আছেন, অতি দীনবেশে রামানন্দ তথায় উপনীত হইলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, ভক্তি প্রেম এবং তাহার সাধনসম্বন্ধে কিছু বল আমি শ্রবণ করি।

রায় কহিলেন, বিষ্ণুভক্তিই সার। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, বর্ণাশ্রমাচারী পুরুষ কর্ত্তৃক কেবল সেই পরম পুরুষ বিষ্ণু আরাধিত হন, তাঁহার সন্তোষের অন্য পন্থা নাই। চৈতন্য বলিলেন, ইহা বাহিরের কথা, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় কি বল। ঈশ্বরেতে সর্ব্বস্ব অর্পণ করাই সার। ভাগবতে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আহার পান দান যজ্ঞ তপস্যা যাহা কিছু কর, হে অর্জ্জুন! সে সমস্ত আমাতেই অর্পণ করিবে।" ইহাও বাহ্য, তাহার পর কি বল। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্রিয়া সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিসাধন করাই সার। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, আমার আদিষ্ট ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিয়াও তাহা পরিত্যাগ করত যে ব্যক্তি সর্ব্বান্তঃকরণে আমাকে ভজনা করে সেই ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গীতায় উক্ত হইয়াছে, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেক শরণং ব্রজ। অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ।" ইহাও বাহিরের কথা, তাহার উপরে কি আছে বল। জ্ঞানমিশ্রা যে ভক্তি তাহাই সার সাধন। গীতায় বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং।" সর্ব্বভূতে সমদর্শী নিস্পৃহ প্রসন্নাত্মা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি আমাতে পরাভক্তি লাভ করে। ইহাও বাহ্য, পরে বল। তবে জ্ঞানশূন্য

ভক্তিই সার। ভাগবতে কথিত আছে, "জ্ঞানানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া যাহারা তোমার গুণ কীর্ত্তনকে বহু মনে করে, তাহারা ত্রিলোকজয়ী হয়।" ইহাও বাহ্য, তাহার পর বল। প্রেমভক্তি উত্তম। "ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিলে আহার পানে যেমন সুখবোধ হয় না, হৃদয়ে প্রেম না থাকিলে তেমনি নানা উপচার দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়াও ভক্তের হৃদয় সুখবিগলিত হয় না। ভক্তিরসষিক্ত চিত্ত যদি কোথাও পাওয়া যায় ক্রয় কর, এক মাত্র লোভই উহার মূল্য, কোটি জন্মের পুণ্য দ্বারাও তাহা লাভ করা যায় না।" ইহা সত্য, আরো আগে বল। দাস্যপ্রেম ইহা অপেক্ষা উচ্চ। ভাগবতে দুর্ব্বাসা অম্বরীষকে বলিয়াছেন, "যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র জীবের পরিত্রাণ হয় তাঁহার দাসদিগের আর কি অবশিষ্ট থাকে?" চৈতন্য বলিলেন, ইহা বটে, আর একটু আগে বল। তবে সখ্যপ্রেম। সখ্যপ্রেম সকল সাধনের সার। ইহাও উত্তম বটে, আরো আগে বল। বাৎসল্যপ্রেম। ইহাও উত্তম, তাহার পর বল। কান্তভাব প্রেমসাধনের সার। ইহা মাধুর্য্য রস; শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি রসচতুষ্টয় ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিয়াছেন, "আমার প্রতি ভক্তি জন্মিলে জীবের অমৃতত্ব লাভ হয়, ভাগ্য বশতঃ আমার প্রতি তোমাদের ভক্তি হইয়াছে।" ইহা চরম সাধন, আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, এক্ষণে আর যদি কিছু থাকে তাহা বল। রামানন্দ বলিলেন, ইহার উপরের সাধন জানিতে চায় এমন লোক পৃথিবীতে আছে অগ্রে আমি জানিতাম না। মহাভাব প্রেমের পরাকাষ্ঠা, ইহার উপর আর সাধন নাই।

চৈতন্য প্রভু মহা আহ্লাদিত হইয়া রামানন্দকে বলিলেন, যে জন্য আমার তোমার নিকট আগমন তাহা সফল হইল; এক্ষণে আমি সাধনতত্ত্ব সমুদায় অবগত হইলাম; কিন্তু তোমার মুখে আরো শুনিতে আমার বাসনা হইতেছে; রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ এবং কাহাকে কোন্ রস বলে তাহা সাবশেষ বল, শুনিয়া সুখী হই। রামানন্দ কহিলেন, সৎ, চিৎ, আনন্দ ইহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। তিনি আদিপুরুষ, সর্ব্বরস ও সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ অনন্তশক্তিশালী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। হ্লাদিনী, সন্ধিনী, এবং সংবিৎ এই তিন শক্তি দ্বারা তাঁহার পরমাশক্তিকে বিভাগ করা যায়। ভক্তচিত্ত-সুখপ্রদায়িনী এই হ্লাদিনী শক্তির নাম প্রেম, প্রেমের সার মহাভাব, এই মহাভাবই শ্রীরাধিকার স্বরূপ। সেই মহাভাবরূপা যে রাধিকা তাঁহার প্রতি ভগবানের যে প্রেম তাহা

সুগন্ধি দ্রব্যের ন্যায়, তাহার সুঘ্রাণ রাধিকার অঙ্গকান্তি সদৃশ। এই সুগন্ধ-যুক্ত উজ্জ্বল দেহ ঈশ্বর করুণামৃতে অভিষিক্ত হয়, তাঁহার নিত্য নূতন ভাব-রসে তাহার দ্বিতীয় অভিষেক হয়, পরে হরির লাবণ্যামৃত রস তদুপরি বর্ষিত হইতে থাকে। এইরূপে মহাভাব যখন সেই সচ্চিদানন্দ রূপরসে স্নাত হইল, অর্থাৎ পরস্পরের সঙ্গে যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন লজ্জা আসিয়া মহাভাবকে অধিকার করিল। এই লজ্জা রাধিকার পট্টবসন, অনুরাগ তাঁহার অধরের তাম্বুলরাগ, কুটিল প্রেম নয়নের অঞ্জন, প্রণয়ের অভিমান কাঁচুলি, প্রচ্ছন্ন মান মস্তকের ধর্ম্মিল্ল, হরিপ্রেম মৃগমদ, স্বেদ কম্প পুলক হাস্য ক্রন্দন ক্রোধ অভিমানাদি সাত্বিক ও সঞ্চারী গুণ সকল অঙ্গাভরণ, সৌভাগ্য তিলক। এই সমস্ত প্রেমলক্ষণে ভূষিতা রাধিকা দেবী কৃষ্ণলীলার অনুকূল মনোবৃত্তিরূপা সখীগণের সমভিব্যাহারে বিরাজ করেন। তিনি নিজ-অঙ্গের সৌরভালয়ে প্রেমগর্ব্বের পর্য্যঙ্কে বসিয়া কিরূপে কৃষ্ণসঙ্গ ( হরিপাদপদ্ম লাভ ) হইবে তাহাই সর্ব্বদা ভাবেন। প্রাণসখার যশঃ ও গুণের কথা শ্রবণ কথন ভিন্ন আর তাঁহার কোন কার্য্য নাই। তিনি বিশুদ্ধ প্রেমরত্নাকর অনুপম গুণে ভূষিত সেই জীবিতেশ্বরকে প্রেমরূপ সোমরস পান করাইয়া তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ করেন। রামানন্দের উপদেশে প্রকাশ পাইতেছে, ব্রজগোপীগণ আর কেহ নহেন, কেবল এই মহাভাবরূপা প্রেমপ্রতিমা রাধিকার বিভিন্ন ক্রিয়া মাত্র। এ সমস্ত অবশ্য তত্ত্বপক্ষীয় কথা, বৃন্দাবনের ঐতিহাসিক প্রকৃত ঘটনা এই প্রেমতত্ত্বের দৃশ্যমান্ প্রতিকৃতি বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

চৈতন্য গোসাঞী বলিলেন, রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব বুঝিলাম, এক্ষণে ইহাঁদের বিলাসের মহত্ব বর্ণন কর শুনি। অতঃপর রায় কহিতে লাগিলেন, এবম্ভূত যে রাধাকৃষ্ণ তাঁহারা উভয়ে প্রেমরসে মত্ত হইয়া নিরন্তর কুঞ্জকাননে ক্রীড়া করত কৈশোর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গৌর পুনরায় বলিলেন, ইহা ঠিক বটে, কিন্তু আরো আগে বল। রায় তখন কহিলেন, আরত আমার বুদ্ধি চলে না। আর যে এক প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত আছে তাহা তোমার ভাল লাগিবে কি না জানি না। তদনন্তর তিনি বিরহসূচক একটী গান করিলেন। চৈতন্য তাহার ভাব সহ্য করিতে না পারিয়া রামানন্দের মুখ চাপিয়া ধরিলেন, এবং বলিলেন, সাধনতত্ত্ব সমুদায়ত বুঝিলাম, এক্ষণে সাধনের উপায় কি তাহা বলিয়া দাও। রামানন্দ বিনীতভাবে কুণ্ঠিত মনে

কহিতে লাগিলেন, সখীভাব না হইলে রাধাকৃষ্ণের ভজনা হয় না। সখীদিগের প্রেম নিঃস্বার্থ, তাহারা রাধিকার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসম্মিলন করাইয়া তাঁহাদের উভয়ের সুখে সুখী হইত, নানা ছল কৌশল করিয়া সখীরা এই প্রেমযোগ সম্পাদন করিত। ইহা তাহাদের নিজের ভোগ সুখ অপেক্ষা অধিকতর সুখকর বোধ ছিল। মনোবৃত্তিরূপা সেই সখীগণ এইরূপে প্রেমাধার হৃদয়কে হৃদয়নাথকে সম্ভোগ করিতে দিয়া আপনারা পরস্পরের বিশুদ্ধ প্রেমে পুষ্টিতা লাভ করে, তাহা দেখিয়া সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ আহ্লাদিত হন। গোপীদিগের প্রেম অপ্রাকৃত, তাহা শারীরিক ইন্দ্রিয়বিকারজনিত নহে; প্রাকৃত প্রেমের লক্ষণ সকল তাহাতে বর্ণিত আছে। নিরাকার প্রেমকে মূর্ত্তিমান করা উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন কালের ধর্ম্মবিষয়ক উদাহরণের মধ্যে এই প্রকার রূপক বর্ণনার বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। রামানন্দের কথার আধ্যাত্মিক অর্থ এই, চিত্তবৃন্দাবনে হৃদয়রাধিকা পরমাত্মাতে রমণ করেন, তাহা দেখিয়া বুদ্ধি, দয়া, শ্রদ্ধা, প্রেম অনুরাগ ইত্যাদি মনোবৃত্তিনিচয় সুখী হয় এবং তাহারা রাধাকৃষ্ণ উভয়ের পরিচর্য্যা করে। যদিও তাহাদের সেবা নিঃস্বার্থ, কিন্তু হৃদয় পরিতৃপ্ত হইলে তাহাতে সকলেই তৃপ্ত্যনুভব করে, সুতরাং তদ্দ্বারা সকলেরই যথেষ্ট আনন্দ লাভ হয়। ইহাতে অবিশুদ্ধ কামগন্ধ থাকিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। পরসুখে সুখী হওয়া সখীগণের ধর্ম্ম-বৈধী ভক্তিতে তাহাদের সে ধর্ম্ম লাভ করা যায় না; রাগানুগা ভক্তি অর্থাৎ প্রেমমূলক ভক্তির প্রয়োজন। কোমল স্বভাবা মধুর প্রকৃতি স্ত্রী জাতির সঙ্গে ভক্তির অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য আছে। এই জন্য জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে এই প্রকার রূপক ভাব ব্যক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞান পুরুষ, সে কেবল ঈশ্বরের বাহির মহলের সংবাদ বলিতে পারে; কিন্তু ভক্তি স্ত্রীলোক, সে ঠাকুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তথাকার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হয়; অন্দর মহলে জ্ঞানের প্রবেশ নিষেধ।

রামানন্দ রায়ের মুখে গভীর ভক্তি ও প্রেমতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া চৈতন্য পরমাহ্লাদিত মনে তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন, এবং বিদায় চাহিলেন। রায়ের অনুরোধে তাঁহাকে আরো দশ দিন কাল সেখানে থাকিতে হইল। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় দুই জনে অনেক কথাবার্ত্তা হইত। আর একদিন গৌরাঙ্গ জিজ্ঞাসু হইলে রায় বলিলেন, কৃষ্ণভক্তি বিনা আর কিছু বিদ্যা নাই। প্রেমভক্তিতে খ্যাতি লাভ করাই শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। প্রেমই

অমূল্য সম্পত্তি। ভক্তিবিরহ সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের অবস্থা। প্রেমিক ব্যক্তিই মুক্ত পুরুষ। প্রেমলীলার সঙ্গীতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সঙ্গীত। ভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ কিছু নাই। হরি স্মরণীয়, হরি উপাস্য, মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। এইরূপ অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। তদনন্তর গৌরাঙ্গ সে স্থান হইতে বিদায় হইয়া সেতুবন্ধ প্রভৃতি তীর্থপর্য্যটনে গমন করেন। বিদায়-কালে রামানন্দকে বলিলেন, তুমি বিষয় কার্য্য ত্যাগ করিয়া নীলাচলবাসী হও, আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি, একত্র হরিপ্রসঙ্গে তথায় দুই জনে অবস্থান করিব।

নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদিগকে হরিনাম শুনাইয়া এবং মাতাইয়া মহাপ্রভু ক্রমে মান্দ্রাজ অঞ্চলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পথে স্থানে স্থানে পণ্ডিতদিগের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক হইত। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী ভক্তিপ্রভা অবলোকন করত বহুলোক ভক্তিপথ অবলম্বন করে। দক্ষিণাঞ্চলে রামানুজ ও রামাইৎ বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে সাদরে অভিবাদন করিত। এক স্থানে কতকগুলি বৌদ্ধমতাবলম্বী লোক ছিল। তাহাদের প্রধান আচার্য্য চৈতন্যের সঙ্গে বিচারে পরাস্ত হইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অত্যন্ত অপমানিত হয়। এই কারণে তাহারা প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া এক পাত্র অশুদ্ধান্ন প্রসাদ বলিয়া তাঁহাকে দিতে আইসে। এমন সময় উপর হইতে এক চিল সেই অন্নপাত্র তুলিয়া লইয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিল, এবং বৌদ্ধাচার্য্যের মস্তকের উপর তাহা পড়িয়া গেল। তাহাতে সে ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হইল। তাহার এইরূপ দুরবস্থা দর্শনে আর সকলে শেষে চৈতন্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি বলিলেন, তাহার কর্ণে উচ্চরবে হরিনাম শ্রবণ করাও, তাহা হইলে সে এখনি জাগিয়া উঠিবে।

এইরূপে নানা স্থান দর্শন করিতে করিতে চলিলেন। কত পথই হাঁটিতে পারিতেন! দীন কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ, মুখে কথা নাই, ক্রমাগত ছায়ার ন্যায় গুরুদেবের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে। অতঃপর গৌরচন্দ্র কাবেরী নদী-তটে উপস্থিত হইলেন। নদীতে অবগাহন করিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে দেবালয় দর্শন করিলেন। তথায় বেঙ্কট ভট্ট নামে এক জন ভক্তিপথাবলম্বী বিপ্র থাকিতেন, তিনি যত্নপূর্ব্বক গোসাঞীকে নিজগৃহে রাখিলেন। গোপাল ভট্ট নামক এক জন পণ্ডিত এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ যিনি বৃন্দাবনে রূপসনাতনের সঙ্গে একত্র অবস্থান করিতেন তিনি এই বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। গৌরের

প্রেমের ছায়া যাহার পরিবারে পড়িত তাহার ভাবীবংশগণ পর্য্যন্ত ভক্তিমান্ বৈষ্ণব হইত। সেই স্থানে প্রভু চতুর্মাস্য করেন। শ্রীরঙ্গবাসী ব্রাহ্মণেরা এক একদিন সকলেই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এখানে এক জন জ্ঞানহীন ভক্ত ব্রাহ্মণ প্রতিদিন ভগবদগীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পড়িতেন আর তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা বহিত। তাঁহার ভাষাবোধ নাই, উচ্চারণ শুদ্ধ হয় না, অথচ গীতা পাঠ করেন, জ্ঞানান্ধ পণ্ডিতাভিমানীদিগের ইহা সহ্য হয় না। কিন্তু তাহাদের উপহাস নিন্দা না শুনিয়া ব্রাহ্মণ প্রতিদিন প্রেমাবিষ্ট চিত্তে গীতা পাঠ করিতেন। এক দিন মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ অর্থ পড়িয়া তোমার এত সুখ হয় আমাকে বলিতে পার? বিপ্র বলিল, আমি মূর্খ, শুদ্ধাশুদ্ধ শব্দার্থ কিছু বুঝি না, গুরুর আজ্ঞায় গীতা পাঠ করি। যখন আমি পড়িতে বসি, তখন অর্জ্জুনের রথে বসিয়া ঠাকুর তাঁহাকে হিতোপদেশ দিতেছেন সেই অপরূপ দৃশ্য আমার চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হয়, আর মনের মধ্যে আনন্দরস উথলিয়া উঠে; যতক্ষণ পাঠ করি ততক্ষণ সেই ছবি আমি দেখিতে পাই, এই জন্য আমার মন ইহা ছাড়িতে চায় না। ব্রাহ্মণের বাক্যে ভক্তরাজ গৌরাঙ্গ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তুমিই ইহার সার অর্থ বুঝিয়া থাক। তদনন্তর তিনি ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন দান করিলেন। চৈতন্যের পবিত্র অঙ্গ-সংস্পর্শে ব্রাহ্মণের এক গুণ ভাব ভক্তি দশ গুণ হইল, সে বিনয় প্রেম কৃতজ্ঞতারসে ডুবিয়া গেল। এই স্থানে বাসুদেব নামক এক জন গলিত-কুষ্ঠ রোগীকে গৌরাঙ্গ কোল দিয়াছিলেন। অনন্তর ঋষভ পর্ব্বতে পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কামকোষ্ঠী, দক্ষিণমথুরা, মহেন্দ্র-শৈল, সেতুবন্ধ, পাণ্ডুদেশ, মলয় পর্ব্বত, কন্যাকুমারী ভ্রমণ করিয়া মল্লার দেশে তিনি উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে ভট্টমারি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বাস করিত। তাহারা গৌরের সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে একটি স্ত্রীলোক দ্বারা প্রলোভিত করে, এবং নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণেরও তাহাতে চিত্ত বিচলিত হয়। সে এক দিন প্রাতে উঠিয়া দুর্ম্মতি বশতঃ গুরুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভট্টমারির ঘরে চলিয়া যায়। তাহাকে বাহির করিয়া আনিতে চৈতন্যকে অনেক কষ্ট যন্ত্রণা সহিতে হইয়াছিল। যেখানে কোন ভাল গ্রন্থ কিম্বা গ্রন্থের অংশবিশেষ তিনি পাইতেন তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতেন। পয়স্বিনী নদীতীরে এক দেবালয়ে "ব্রহ্মসংহিতা" পুস্তকের কয়েক অধ্যায়

প্রাপ্ত হন। ইহার শ্লোক সকল তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। ক্রমে মান্দ্রাজ হইতে চৈতন্য প্রভু বোম্বাই দেশস্থ কোলাপুর প্রভৃতি স্থানে পৌঁছিলেন। সেখানে বিঠল নামক বিগ্রহ মূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার যথেষ্ট আনন্দোদয় হয়। তথায় তাঁহার গুরুগোষ্ঠী মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী ছিলেন, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া চৈতন্য অতিশয় সুখী হইলেন। শ্রীরঙ্গপুরী বলিলেন, "আমি নবদ্বীপ দেখিয়াছি, জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শচীর হাতের রন্ধন উপাদেয় মোচার ঘণ্ট খাইয়াছি, তাঁহার এক যোগ্য পুত্র বহু দিন হইল সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন, এই তীর্থে তিনি সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন।" গৌর বলিলেন, পূর্ব্বাশ্রমে তিনি আমার ভ্রাতা এবং জগন্নাথ মিশ্র পিতা ছিলেন। পরে দুই জন পরস্পরের প্রেমে বিগলিত হইয়া দ্বারকাতীর্থ দর্শনে গমন করেন এবং একত্র কয়েক দিবস অবস্থান করেন। তথায় চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণদিগের মুখে বিল্বমঙ্গলকৃত "কৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থের মাধুর্য্যরস আস্বাদন করত মুগ্ধ হইয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। উক্ত দুই খানি পুস্তক পাইয়া তাঁহার মহা আহ্লাদ বোধ হয়। পরে পম্পা সরোবর, তাপী ও নর্ম্মদা নদীতে স্নান করিয়া, ঋষ্যমুখ, দণ্ডকারণ্য হইয়া পঞ্চবটীতে উপনীত হইলেন। নাসিক্,ত্র্যম্বক্, কুশাবর্ত্ত পর্য্যটনান্তর রামানন্দের বাসস্থান বিদ্যানগরে আগমন করিলেন। রামানন্দকে প্রভু বলিলেন, তুমি যে তত্ত্বকথা শুনাইয়াছিলে, এই দুই পুস্তক তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। পুনরায় চৈতন্যকে পাইয়া রামানন্দ প্রেমসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। ইহাঁকে নীলাচলে লইয়া যাইবার জন্যই প্রভুর পুনর্ব্বার এ স্থানে আগমন। কয়েক দিন একত্র বাসের পর রায় বলিলেন, আপনি অগ্রসর হউন, আমার সঙ্গে অনেক লোক জন হস্তী অশ্ব সৈন্য সামন্ত যাইবে, সুতরাং কিছু বিলম্ব হইবে, কিন্তু আমি শীঘ্রই আপনার পশ্চাদগামী হইতেছি। বীরের ন্যায় নির্ভয় ও সদানন্দ মনে শত শত যোজন পথ পর্ব্বত, অরণ্য প্রান্তর পরিভ্রমণ করিয়া আবার সেই পথে নীলাচলাভিমুখে গৌরাঙ্গ যাত্রা করিলেন। পরিচিত পথের পরিচিত হরিভক্তগণেরা তাঁহাকে দেখিয়া হরিধ্বনিসহকারে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রভু আলালনাথে আসিয়া সমভিব্যাহারী কৃষ্ণদাস দ্বারা নিত্যানন্দাদি বন্ধুবর্গের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দেন।

# নীলাচলে প্রত্যাগমন।

তৃষিত চাতকের ন্যায় ভক্তগণ আশাপথ চাহিয়াছিলেন, সংবাদ পাইবা-মাত্র প্রফুল্ল মনে নাচিতে নাচিতে সকলে আলালনাথে আসিয়া গৌরপ্রেম সিন্ধুতে প্রবেশ করিলেন। বহু দিনের অদর্শনের পর মিলন, আনন্দের আর অবধি রহিল না। সকলের নয়নে আনন্দধারা বহিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে সমুদ্রতটে সার্ব্বভৌম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রভুকে সে দিন পথ হইতে অমনি নিজগৃহে লইয়া যান এবং বিধিমতে সেবা শুশ্রূষা করেন। ভক্তপরিবারমধ্যে মিলিত হইয়া গৌরচন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় নৃত্য কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, পুরাতন এবং নূতন বৈষ্ণব সাধুগণের সমাগম হইল, আবার নীলাচলে আনন্দের মেলা বসিল।

সার্ব্বভৌমের মন পরিবর্ত্তনের পর চৈতন্যদেব তীর্থযাত্রায় গমন করিলে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার গুণে নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়েন। কিরূপে তাঁহাকে দেখিবেন, কোন্ উপায়ে তাঁহার প্রসাদ লাভ করিবেন এই কেবল তাঁহার ভাবনা ছিল। এক দিন ভট্টাচার্য্যকে আহ্বান করিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রতা সহকারে তিনি অনুরোধ করেন যে, একবার তুমি আমাকে তাঁহার সঙ্গে দেখা করাও, আমার নয়ন সফল হউক, আমি শুনিয়াছি সেই গৌড়দেশ-বাসী সাধু পরম ভাগবত। সার্ব্বভৌম বলিলেন, তুমি যাহা শুনিয়াছ সকলই সত্য, কিন্তু তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী, সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকেন, অকিঞ্চন প্রেমিকদিগের সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বদা সহবাস, স্বপ্নেও তিনি রাজদর্শন করেন না, তবে তোমার সঙ্গে কিরূপে তাঁহার দেখা হইবে? সম্প্রতি তিনি তীর্থ-যাত্রায় গমন করিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় তীর্থস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রভু অন্য তীর্থে গমন করিলেন কেন, রাজা এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে ভট্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর তীর্থস্থান সকল পাপীদিগের পুনঃ পুনঃ সমাগমে কলঙ্কিত হয়, এই জন্য সাধুরা তীর্থে গিয়া তাহাকে পুনরায় পবিত্র করেন; কেন না, তাঁহাদের অন্তরে ভগবান্ সর্ব্বদা বিরাজিত থাকেন। সামান্য সাধুর পদার্পণেই এইরূপ হয়, চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।" শেষোক্ত বাক্যে রাজা কিছু বিস্ময় প্রকাশ করত মুগ্ধ হইয়া পড়েন, এবং কবে প্রভুর প্রত্যাগমন হইবে এই ভাবনায় দিন যাপন করিতে থাকেন। কর্ণাট রাজার

মন্ত্রী মল্লভট্ট এবং গোদাবরী হইতে প্রত্যাগত ব্রাহ্মণদিগের মুখে তাঁহার তীর্থভ্রমণবৃত্তান্ত অতি আগ্রহের সহিত তিনি শুনিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌমের মন পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া কেবল রাজা নহেন, আরও অনেক বড় বড় লোক চৈতন্যের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তীর্থ হইতে ফিরিয়া প্রভু কাশী মিশ্রের ভবনে বাস করেন। তথায় সার্ব্বভৌম তাঁহার সঙ্গে নবাগত ভক্ত সকলের পরিচয় করিয়া দিলেন। রামানন্দের পিতা ভবানন্দ রায় দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। চৈতন্য তাঁহাকে যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শন করেন। ভবানন্দ বাণীনাথ নামক আপনার আর এক পুত্রকে প্রভুর সেবার্থ সমর্পণ করিয়া বলিলেন, যখন যাহা প্রয়োজন হইবে বলিয়া পাঠাইবেন, আমাকে পর ভাবিবেন না। আলাপ পরিচয়ের পর সকলে বিদায় হইলে চৈতন্য সার্ব্বভৌমকে কৃষ্ণদাসের অধঃপতনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এ ব্যক্তি আমাকে ছাড়িয়া ভট্টমারিদিগের সঙ্গে মিশিয়াছিল, অনেক কষ্টে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি, এক্ষণে আমি আর দায়ী নহি, উহাকে আমি বিদায় করিলাম। ইহা শুনিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া আকুল হইল। কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দের পরিচিত লোক, তিনি গদাধর মুকুন্দ প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, তুমি থাক, নিরাশ হইও না, প্রভুর পৌঁছাসংবাদ দিবার জন্য তোমাকে শান্তিপুর ও নবদ্বীপে যাইতে হইবে। পরে গৌরের মত লইয়া তাহাকে গৌড়দেশে পাঠান হয়।

কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতা এবং ভক্তবৃন্দকে চৈতন্যের নীলাচলপ্রত্যাগমনবার্ত্তা প্রদান করিল, অদ্বৈতের নিকটও সংবাদ প্রেরিত হইল। শ্রীখণ্ড, কুলীনগ্রাম, শান্তিপুর ও নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ আনন্দের সহিত শ্রীক্ষেত্রে যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন, মহা আনন্দধ্বনি উঠিল। চৈতন্য প্রভু নীলাদ্রি গমন করিলে ভক্তগণ তাঁহার বিরহে এবার তাদৃশ খিদ্যমান বা ম্রিয়মাণ হন নাই। কেন না, তিনি বিদায়কালে যে বলিয়াছিলেন, তোমরা হরিকে ভজনা কর, তাহা হইলে আমাকে সর্ব্বদা নিকটে পাইবে, যেখানে হরিভক্তি আমি সেইখানে জানিবে। বাস্তবিক এ কথার অর্থ তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন। হরিভক্তি এবং হরিভক্ত এক স্থানেই অবস্থিতি করেন। তাঁহার উজ্জ্বল ধর্ম্মজীবন বৈষ্ণবদিগের সাধন ভজন কীর্ত্তনকে পোষণ করিয়াছিল। কেহ কেহ সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়াও যান। পুরুষোত্তম, পরে যিনি দামোদর নাম ধারণ করিয়া নীলাচলে ভক্ত-

সমাজে গৌরপ্রিয় হইয়া অবস্থিতি করেন, তিনি গৌরসন্ন্যাসের কিছু কাল পরে কাশীধামে গিয়া দণ্ড গ্রহণ করত তথায় বেদ বেদান্ত পাঠ করিয়া মহা পণ্ডিত হন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য ভক্তিভূমির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। দামোদর সময় বিশেষে চৈতন্যকেও উপদেশ দিতেন, এই জন্য তিনি স্পষ্ট-বক্তা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। সন্ন্যাসী পরমানন্দপুরী নবদ্বীপ হইতে অগ্রে আসিয়া চৈতন্যকে গৌড়ভক্তগণের আগমনবার্ত্তা অবগত করেন।

এক দিন ভক্তগণ সঙ্গে চৈতন্য বসিয়া আছেন, এমন সময় গোবিন্দ নামক ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিল, পুরী গোসাঞী সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনি আপনার চরণ সেবার জন্য আমাকে পাঠাইলেন, তাই আমি আসিয়াছি। সার্ব্বভৌম প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরী গোসাঞী শূদ্র ভৃত্য কেমন করিয়া রাখিতেন? শচীনন্দন বলিলেন, ঈশ্বরের কৃপা বেদের অধীন নয়, তাঁহার কৃপায় ভক্ত জাত কুল মানে না, সম্ভ্রমাকাঙ্ক্ষা হইতে স্নেহদান কোটি গুণে সুখকর; এই বলিয়া তিনি সসম্ভ্রমে গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। গুরুদেবের ভৃত্য বলিয়া প্রথমে তাহাকে সেবায় নিযুক্ত করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন, পরে গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। গোবিন্দ এক জন ভক্তভৃত্য। ব্রহ্মানন্দ ভারতী নামক জনৈক নিরাকারবাদী ব্রহ্মচারী এই স্থানে আসিয়া চৈতন্যপ্রভাবে ভক্তিপথ অবলম্বন করেন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কৌপীন বহির্ব্বাস পরেন। তাঁহার ভক্তি দেখিয়া প্রভু এক দিন বলিলেন, তুমি হরিকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাও। সার্ব্বভৌম চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া ভারতীকে কহিলেন, "ইহাঁর কৃপাতে ইহাঁর দর্শন হয়।" চৈতন্য বিষ্ণু! বিষ্ণু! করিয়া উঠিলেন এবং ভট্টাচার্য্যকে স্পষ্টই বলিলেন, "অতিস্তুতি নিন্দায় পরিণত হয়।" প্রবল বন্যার কালে যেমন উচ্চ ভূমিতে শত শত নদী বহিয়া যায়, গৌরপ্রেমবন্যায় তেমনি শত শত ভক্ত সে সময় চারিদিকে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশেষ আশা ও আহ্লাদের বিষয় এই ছিল যে, সকলে মনে করিতেন, আমরা স্বয়ং ভগবান্‌কে লইয়া বিহার করিতেছি। মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করাতে যেকত সুখ শান্তি আনন্দ তাহা বৈষ্ণবভক্তেরা বেশ বুঝিতে পারিতেন। স্বর্গের ঈশ্বরকে হাতে পাইলে কে আর তাহা পরিত্যাগ করে? অতি সহজে ধরিতে এবং স্পর্শ করিতে পারা যায়, চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়, হৃদয়ের আশা ব্যাকুলতার নিবৃত্তি হয়, এমন সুবিধা ত্যাগ করিয়া যোগ

তপস্যা লোকে কেনই বা করিবে? এই জন্য চৈতন্যের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ সত্ত্বেও অদ্বৈত সার্ব্বভৌম প্রভৃতি বিজ্ঞভক্তগণও তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; সুতরাং অনিচ্ছার সহিত দশচক্রে পতিত হইয়া তাঁহাকে ভগবান্ হইতে হইয়াছিল। ভক্ত বৈষ্ণবগণ পরস্পরসম্বন্ধেও অতি উচ্চ ভাব পোষণ করিতেন। কারণ, তাঁহাদের সংস্কার ছিল যে প্রত্যেকেই নিত্যসিদ্ধ জীবের অবতার। এই বিশ্বাস হেতু বহু লোক ভক্তিপথ আশ্রয় করে।

এক দিন সার্ব্বভৌম অতি সঙ্কুচিতভাবে সভয় অন্তঃকরণে চৈতন্যকে নিবেদন করিলেন, প্রতাপরুদ্র রাজা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। এ কথায় তিনি কাণে হাত দিয়া নারায়ণ স্মরণপূর্ব্বক কহিলেন, সার্ব্বভৌম! কেন এরূপ অযোগ্য কথা তুমি বলিতেছ? আমি সন্ন্যাসী, আমার পক্ষে রাজদর্শন স্ত্রী দর্শন তুল্য বিষ ভক্ষণ। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, তিনি জগন্নাথের সেবক এবং ভক্তোত্তম। চৈতন্য বলিলেন, তথাপি রাজা কালসর্প সদৃশ। দারু পুত্তলিকার সংস্পর্শেও চিত্তবিকার উপস্থিত হয়। এরূপ কথা পুনরায় বলিলে আর আমাকে তুমি এখানে দেখিতে পাইবে না। সার্ব্বভৌম ভয় পাইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং কি করিবেন তদ্বিষয়ে চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। এই সময় রামানন্দের সঙ্গে প্রতাপরুদ্র জগন্নাথদর্শনে নীলাচলে আগমন করেন। চৈতন্য রামানন্দের নিকটেও রাজার ভক্তি অনুরাগ বৈরাগ্যের কথা সমস্ত শুনিলেন। ও দিকে রাজা সার্ব্বভৌমের মুখে গৌরচন্দ্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া বহু খেদ করত বলিতে লাগিলেন, তাঁহার দেখা না পাইলে আমি এ প্রাণ আর রাখিব না, রাজ্য ধন মানে আমার কি প্রয়োজন? ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, রথযাত্রার দিনে সঙ্কীর্ত্তনের পর প্রভু যখন একাকী বিশ্রাম করিবেন তখন তুমি দীনবেশে তাঁহার চরণ ধারণ করিও, প্রভু তোমাকে বৈষ্ণবজ্ঞানে প্রেমাবেশে আলিঙ্গন দান করিবেন। তচ্ছ্রবণে রাজা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন এবং সেই দিনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

চৈতন্য ভক্তসঙ্গে বিহার করিতে করিতে বিরহজ্বালায় অস্থির হইয়া এই সময় এক দিন আলালনাথে পলাইয়া যান। পরে গৌড়ের বৈষ্ণবগণ শ্রীক্ষেত্রে আসিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া সার্ব্বভৌম তাঁহাকে পুরীতে আনয়ন করিলেন। বঙ্গদেশের দুই শত ভক্ত বৈষ্ণব বহুলোক জন সঙ্গে লইয়া

ক্রমে সমুদ্রতটে গিয়া উপনীত হইলেন। একে ভক্তির উচ্ছ্বাস, তাহার উপর গৌরদর্শনস্পৃহা বলবতী, উৎসাহে অগ্নিময় হইয়া ভক্তগণ নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে পুরীর অভিমুখে চলিলেন। মৃদঙ্গ করতাল এবং হরিধ্বনির গভীর নিনাদে সাগরতট প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তৎকালে প্রতাপরুদ্র গৃহে থাকিয়া অট্টালিকার ছাদে উপবেশন করত অদূরবর্ত্তী সেই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতেছিলেন, এবং গোপীনাথ তাঁহাকে এক এক করিয়া প্রতি জনের পরিচয় দিয়া দিতেছিলেন। যাত্রিদল জগন্নাথ না দেখিয়া অগ্রে চৈতন্যের আশ্রমের দিকে চলিলেন। তাঁহাদের আগমন সংবাদ পাইয়া মহাপ্রভুও ভক্তসহ প্রত্যুদ্গমনার্থ পথে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে যে স্থানে উভয়ের মিলন হইল, সে স্থান উভয় পক্ষের গাত্র সংঘর্ষণে এবং পদদলনে আলোড়িত হইয়া গেল। প্রতি জনকে গৌরচন্দ্র আলিঙ্গন দিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বহস্তে প্রত্যেককে মালা ও প্রসাদ বিতরণ করিলেন। কে কেমন আছেন, কি বৃত্তান্ত, সমস্ত বিশেষ করিয়া প্রতিজনকে জিজ্ঞাসা করা হইল। অপরিচিত নবাগত ব্যক্তিদিগের সহিতও আলাপ পরিচয় হইল। বাসুদেব দত্তকে তীর্থ হইতে আনীত সেই পুস্তক দুই খানি প্রভু দেখাইলেন, পরে হাতে হাতে অনুলিপি দ্বারা ক্রমে তাহা বৃদ্ধি হইয়া যায়। দলের মধ্যে হরিদাসকে না দেখিয়া চৈতন্য কিছু দুঃখিত হইলেন। বৃদ্ধ হরিদাস দীনভাবে পথপ্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছেন, অস্পৃশ্য যবনজাতি, কেমন করিয়া সাধুস্পর্শ করিবে, এই কেবল তাঁহার আশঙ্কা। অপর সকলের স্নানা-হারের আয়োজন করিয়া দিয়া গোসাঞী নিজেই হরিদাসকে আনিতে গেলেন। তখন রাজা প্রতাপরুদ্রের ধন জন ঐশ্বর্য্য সমস্ত যেন তাঁহার করতলস্থ। রাজার আদেশ আছে, ইঙ্গিতমাত্র যাবতীয় বস্তুর আয়োজন করিয়া দিবে। সেই বনচারী দণ্ডধারী পথের ভিখারী গৌরাঙ্গ এখানে রাজার রাজা হইয়া বসিয়া আছেন। বৈরাগ্যের যে কি মহোচ্চ অধিকার তাহা আমরা এই স্থলে স্পষ্ট দেখিতে পাই। অনন্ত ঐশ্বর্য্যের স্বামী ভগবানের চরণাশ্রয় করিলে পৃথিবীর যাবতীয় ধন সম্পদ্ তাহার পদচুম্বনের জন্য আপনা হইতে গিয়া উপস্থিত হয়। মহাপ্রতাপান্বিত রাজন্যবর্গ সর্ব্বত্যাগী বৈরাগীর কৃপা কটাক্ষ লাভ করিতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ বোধ করে। চৈতন্যদেব হরিদাসের জন্য রাজকর্ম্মচারীর নিকট হইতে স্বীয় বাসস্থানের নিকটে একটি ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান এবং তন্মধ্যস্থিত এক কুটীর চাহিয়া লইলেন।

গরিব হরিদাস তৃণগুচ্ছ দন্তে করিয়া ভূতলে পড়িয়া আছেন, কিছুতেই আর প্রভুর নিকট আসিতে চাহেন না। আমি নরাধম অস্পর্শীয়, এই বলিয়া বার বার কৃতাঞ্জলিপুটে মিনতি করিতে লাগিলন। গৌরাঙ্গ বলিলেন, তোমার স্পর্শে আমি পবিত্র হইব, তুমি পরম পবিত্র যোগী, বেদ এবং তপস্যা। অতঃপর তাঁহাকে ঐ কুটীরে বাসা দিয়া প্রভু নিজভৃত্য গোবিন্দের দ্বারা প্রতি দিন প্রসাদ পাঠাইতেন। হরিগতপ্রাণ ভক্তের অপাঙ্গভঙ্গিতেই সন্তপ্তচিত্ত দীনজনের প্রাণ শীতল হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমবিগলিত কমলনয়ন বাস্তবিকই পাপদগ্ধ ভগ্নাত্মাদিগের পরম শান্তির আলয় ছিল। যাঁহার দৃষ্টি হরিপদারবিন্দে সদাকাল নিবদ্ধ তাঁহার একবারের সস্নেহ প্রেমদৃষ্টি পাপীর পক্ষে পরম প্রার্থনীয়। কে না সেই পুণ্যদৃষ্টির ভিখারী হইবে? পরে সকলে সমুদ্রে স্নান করিয়া ভোজনে বসিলেন, মহাপ্রভু নিজহস্তে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এক এক পাতে তিন তিন জনের ভোজ্য সামগ্রী দিলেন। হৃদয় যেমন প্রশস্ত, হস্তও তেমনি দরাজ। তাঁহার হাতের গুণে জগন্নাথের প্রসাদ ভক্তগণের পক্ষে অতীব তৃপ্তিকর বোধ হইয়াছিল। সকলে হাত তুলিয়া বসিয়া রহিলেন, গুরুদেবের সেবা না হইলে কেহ বসিতে পারেন না; প্রভু তাহা বুঝিয়া আপনিও তৎসঙ্গে ভোজন করিলেন। আহারের সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহকর হরিধ্বনি আকাশ ভেদ করিতে লাগিল। গৌরভক্ত জনেরা যে সময় পুরীতে গিয়া পৌঁছিলেন, তাহার পূর্ব্বেই চৈতন্যের সঙ্গে আরও কয়েক জন দণ্ডী সন্ন্যাসী একত্রিত হইয়া জাতিবিনাশের কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর করিয়া রাখিয়াছিলেন। হরিদাস কেবল নিজের বিনয়গুণে পংক্তিভোজনে সে দিন বসেন নাই, নতুবা মহাপ্রভুর তাহাতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ইহাঁর জাতিনাশচেষ্টা ম্লেচ্ছাচার, কিম্বা অসার সামাজিক ব্যবহার নহে, ভ্রাতৃভাবমূলক এবং সম্পূর্ণ ধর্ম্মানুগত। গৌরচন্দ্র, এখানে ছত্রিশ জাতির মধ্যে অন্ন প্রচলিত করেন, এ কথা আরও কোন কোন স্থলে শুনা গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহাঁর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের সময় এই প্রথা প্রচলিত হয়। কিন্তু তাহা হইলে কেবল পুরীর সীমায় কেন ইহা বদ্ধ থাকিবে? চৈতন্যের সময় হইতে শ্রীক্ষেত্র বিশেষরূপে বাঙ্গালীদিগের নিকট পরিচিত হইয়াছে। এবং যথেষ্ট সম্ভব যে তাঁহারই প্রেমভক্তির তরঙ্গাঘাতে জাত্যভিমানের বন্ধুরতা সমতল হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধদিগের বিচার তর্ক এ পক্ষে অনুকূল বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা এককালে সাধারণ জাতীয় প্রথার

উচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নহে। গৌরের প্রেমমত্ততার ধর্ম্ম যে জাতিনাশের এক প্রধান কারণ হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়।

অনন্তর সন্ধ্যাকালে আরতির সময় মহাসমারোহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। তাহা দেখিয়া রাজা এবং উৎকলবাসিগণ মোহিত হইয়া গেলেন। সে দেশে ইহার পূর্ব্বে কেহ আর এ প্রকার প্রণালীতে কীর্ত্তন করে নাই। প্রতি সন্ধ্যাতে কীর্ত্তনানন্দ হইত, আর তাহার মধ্যে মিশিবার জন্য রাজার মন হাকুলি বিকুলি করিয়া উঠিত। ভক্তদলে প্রবেশের জন্য তিনি কত সাধ্য সাধনা করিলেন, কিছুতেই গৌরাঙ্গের অভিমত হইল না। রাজার আর্ত্তনাদ ও বিলাপপূর্ণ দুই তিন খানি পত্র নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ দেখিয়া তদ্বিষয়ে প্রভুকে অনুরোধ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু হঠাৎ সে কথা সাহস করিয়া কেহ তাঁহাকে বলিতে পারিলেন না। আভাসে তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া চৈতন্য বলিলেন,—"দামোদর এ বিষয়ে কি বলেন?" তিনি বলিলেন,—"উভয়েরই যখন প্রেমাকর্ষণ হইয়াছে তখন আপনিই শেষে তুমি গিয়া মিলিবে, আমি আর কি বিধান দিব?" নিতাইয়ের অনেক অনুরোধে রাজাকে এক খণ্ড বহির্ব্বাস দেওয়া হইল। রাজা তাহাতেই অতুল আনন্দ লাভ করিলেন। অবশেষে রামানন্দ অনেক উপরোধ অনুরোধ করাতে এই পর্য্যন্ত হইল যে, রাজার পুত্রকে তিনি দেখা দিবেন, এই অঙ্গীকার করিলেন। যদিও রাজা অতি সৎলোক এবং একজন হরিভক্ত, তথাপি রাজা নাম থাকাতেই সাধুদর্শনে তাঁহাকে বঞ্চিত থাকিতে হইল। চৈতন্য বলিলেন,—"শুভ্র বস্ত্রে এক বিন্দু মসী,এক কলসী দুগ্ধে এক বিন্দু সুরা পড়িলে যেমন হয়, সন্ন্যাসীর পক্ষে এ সব তেমনি জানিবে; অল্প ছিদ্র পাইলে লোকে তাহাই অগ্রে ঘোষণা করে। অতএব "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ রাজপুত্রকে আমার নিকট আসিতে বল।" কিশোরবয়স্ক সুন্দর রাজতনয়কে দেখিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবোদয় হইল। তাহাকে আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। ইহাতে রাজাও কতক পরিমাণে সন্তুষ্ট হন।

চৈতন্য পুরীধামে এক এক দিন এক একটি নূতন উৎসব আরম্ভ করিলেন। এক্ষণে জগন্নাথের সেবা উৎসব সমস্ত তাঁহার ইচ্ছামত হইতে লাগিল। এক দিন সশিষ্য শত শত সম্মার্জ্জনী ও জলপূর্ণ ঘট লইয়া জগন্নাথের মন্দির পরিষ্কার করিয়াছিলেন। কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মন্দিরমধ্যে সেই ব্যস্ততার ভিতর তাঁহার পায়ে জল ঢালিয়া দেয়, তাহাতে তিনি মহা

বিরক্ত হন। মন্দির ধৌত করিয়া হরিদাসের আশ্রমে সে দিন সকলে ভোজন করিলেন। একত্র ভোজন করিবার জন্য হরিদাসকে প্রভু বার বার ডাকিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না; নিতান্ত কাতর এবং কুণ্ঠিত দেখিয়া শেষে আর তাঁহাকে সে জন্য অনুরোধ করা হইল না। আহারের সময় গৌরের পাতে জগদানন্দ নানা কৌশল করিয়া ভাল ভাল দ্রব্য ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে প্রভুর মনে ভারি লজ্জা ও রাগ হইয়াছিল। পাঁছে জগদানন্দ অভিমানে উপবাস করে সেই ভয়ে তিনি শেষ কিছু কিছু খাইতে বাধ্য হন। ভালবাসার নানা অবস্থা, বিচিত্র ক্রিয়া ইহাঁদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইত। এ বৎসর রথযাত্রার দিনে অতিশয় সমারোহ হইয়াছিল। চৈতন্য ভক্তসঙ্গে দলে দলে বিভক্ত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়া লোকদিগকে মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। রথের অগ্রে রাজা প্রতাপরুদ্র স্বর্ণসম্মার্জ্জনী এবং সচন্দন সলিল দ্বারা পথ পরিষ্কার করিতেছেন, তাহা দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি চৈতন্যের প্রেম সঞ্চারিত হইল। তখন উৎকলবাসীরা কীর্ত্তন করিতে জানিত না, পরে বাঙ্গালাদের নিকট শিক্ষা করিয়াছে। বঙ্গদেশের এক এক স্থানের বৈষ্ণবেরা এক একটী স্বতন্ত্র দল বাঁধিয়া সাত দল গায়ক চতুর্দ্দশ মৃদঙ্গসহ হারসঙ্কীর্ত্তন করেন, গৌর সকল দলেই এক এক বার যোগ দিয়া গান ও নৃত্য করিয়াছিলেন। এমনি তাঁহার প্রেমের উজ্জ্বল প্রভাব, বোধ হইতে লাগিল যে তিনি এক সময়েই সাত দলে নাচিতেছেন। অবশেষে সাত দল একত্রিত করিয়া মহা উদ্যমের সহিত গৌরাঙ্গ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মহাভাবময়ী ভক্তির অত্যদ্ভুত অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার তাঁহার শ্রীঅঙ্গে দর্শন করিয়া লোকসকল মোহিত ও বিস্মিত হইয়া গেল। ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া তিনি বারম্বার ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন, যেন সোণার পর্ব্বত ধূলায় লুটাইতে লাগিল। তাঁহাকে ধরিয়া তুলিবার জন্য নিতাই ক্রমাগত হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিলেন। এত উন্মত্ততা, তথাপি রাজা একবার যাই তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া ধরিয়া তুলিতে গিয়াছেন, অমনি চৈতন্যোদয় হইয়াছে। রাজাকে নিকটে দেখিয়া আর কিছু বলিলেন না, কিন্তু "ছি ছি! বিষয়ীর অঙ্গস্পর্শ হইল!" এই মনে করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তাহা শুনিয়া রাজার মনে ভয় হইল, পরে সার্ব্বভৌমের প্রবোধ বাক্যে তিনি সান্ত্বনা লাভ করিলেন। রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য এবং কীর্ত্তন একটি অদ্ভুত ব্যাপার। তাঁহার রোমহর্ষণ, ফেনউদ্গীরণ, দন্তঘর্ষণ, অশ্রুবর্ষণ, হৃৎকম্প

সঞ্চালন ইত্যাদি একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য। বহুক্ষণ নৃত্য গীতের পর শ্রান্ত গল-দ্ঘর্ম্ম হইয়া সমীপস্থ এক পুষ্পোদ্যানে বিশ্রামার্থ তিনি গমন করেন। উপবনের প্রত্যেক বৃক্ষমূলে ভক্তগণ উপবেশন করিলেন। কুসমিত সুরম্য পাদপশ্রেণীর মধ্যে ভক্তকুসুম বিকসিত হইয়া উদ্যানের রমণীয়তা পরিবর্দ্ধিত করিল। এই স্থানে রাজা প্রতাপরুদ্র দীন ভক্তবেশে যাবতীয় ভক্তগণের ইঙ্গিতক্রমে চৈতন্যের পদযুগল আলিঙ্গন করেন। ঠাকুর ভাবে প্রেমে বিভোর হইয়া মুদ্রিত নয়নে বসিয়া আছেন, চতুর্দ্দিকে ভক্তমণ্ডলী, এমন সময় নরপতি প্রতাপরুদ্র তথায় উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণব জ্ঞানে রাজাকে তৎক্ষণাৎ তিনি আলিঙ্গন দান করিলেন। নৃপতির অমৃতায়মান প্রীতিপদ বচনাবলী শ্রবণে গৌরের মন উল্লসিত হইল। পরে এই উপবনমধ্যে বসিয়া সে দিন সকলে নানা রসযুক্ত প্রসাদান্ন ভক্ষণ করেন। হরিসঙ্কীর্ত্তনের যে কি ভয়ানক পরিশ্রম তাহা কেবল গৌররায়ই জানিতেন, তথাপি তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত ভক্ত-দিগকে নিজহস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন।

স্বরূপ দামোদরের মুখে চৈতন্যপ্রভু ভাগবতব্যাখ্যা শুনিতে বড় ভাল-বাসিতেন। একদা তিনি বৃন্দাবনের বিশুদ্ধ প্রেমলীলা বিষয়ে এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করেন। "এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ, সসত্যকা-মোঽনুরতাবলাগণঃ। সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথা রসাশ্রয়াঃ॥" এইরূপে সত্যকাম ভগবান্ এবং অনুরক্তা অবলাগণ ইন্দ্রিয় বিকার নিরোধ করিয়া শরৎকালীয় কাব্যরসাশ্রিত কথা সেবনে শশাঙ্কবিরা-জিতা নিশা যাপন করিলেন। এইটী রাসলীলার শেষ এবং সারকথা। স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায় জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃত রসশাস্ত্র এবং ভাগবতের রাসলীলার বিবিধ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া চৈতন্যকে শুনাই-তেন। তিনি যত শুনিতেন ততই আরো শুনিবার জন্য মহা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, সখীগণসঙ্গে কৃষ্ণের বিহার, এ সমস্তই আদিরসে পরিপূর্ণ, অথচ সর্ব্বত্যাগী পরমবৈরাগী সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গ তাহার মাধুর্য্যরসে মত্ত হইতেন। রূপ সনাতন শ্রীজীব রঘুনাথ ইহাঁরা সকলেই মহাবৈরাগী ছিলেন, কিন্তু ইহাঁদের রচিত ভক্তিশাস্ত্রের কথাসকলে কেবল আদিরসেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ইহা পড়িয়া ইহাঁরা আপনাদের মধ্যে সচরাচর আমোদ আহ্লাদ হাস্য পরিহাস নৃত্য গীত করিতেন। এই প্রেমলীলার ব্যাখ্যা সমস্তই প্রাকৃত প্রেমের লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থ

এ বিষয়ে চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। তারি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে গৌরাঙ্গ বলিতেন, "দারুনির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিলেও আমার বিকার উপস্থিত হয়। স্ত্রীস্পর্শ হইলে প্রাণত্যাগ করিব;—" কার্য্যতঃও তিনি সেই রূপ কঠিন নিয়মে চলিতেন;—সেই গৌরাঙ্গ আবার ভক্তসঙ্গে রাসলীলা, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি শুনিয়া কি ভাবে আমোদিত হইতেন, আমরা বুঝিতে পারি না। কি স্বর্গীয় আধ্যাত্মিক প্রেমরসই তিনি ইহার ভিতরে পাইয়াছিলেন!

প্রায় এক বৎসর কাল এইরূপে গৌড়ীয় ভক্তগণসঙ্গে নানা লীলা করিয়া এক দিন গৌরচন্দ্র অদ্বৈত এবং নিতাইকে বলিলেন,—"তোমরা বঙ্গদেশে গিয়া আচণ্ডালে হরিভক্তি বিতরণ কর, মধ্যে মধ্যে আমিও তথায় যাইব।" শ্রীবাসের হাতে একখানি বস্ত্র এবং মহাপ্রসাদ দিয়া বলিলেন, "জননীকে এই সকল দিয়া আমার প্রণাম জানাইবে এবং বলিবে যেন তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করেন, পাগল সন্তানের দোষ মায়ে গ্রহণ করেন না।" বন্ধুগণকে বিদায় দিবার কালে তিনি ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কাঁচড়াপাড়াবাসী শিবানন্দ সেনকে বলিলেন, তুমি এই উদারচরিত্র বৈরাগী বাসুদেব দত্তের পরিবারের প্রতি দৃষ্টি রাখিও। কারণ, ইনি পর দিবসের জন্য কিছু সঞ্চয় করেন না। আর তুমি বর্ষে বর্ষে দেশের যাত্রী লইয়া রথযাত্রায় এখানে আসিবে।" কুলীনগ্রামের রামানন্দ ও সত্যরাজ খাঁ প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রভো! গৃহী বিষয়ী লোক আমরা, আমাদিগকে কিরূপে সাধন ভজন করিতে হইবে?" গৌর অনুমতি করিলেন, "তোমরা সাধুসেবা এবং হরিসঙ্কীর্ত্তন করিও, ইহাই পরম সাধন।" সত্যরাজ বলিলেন, "বৈষ্ণব চিনিব কিরূপে?" "যাহার মুখে একবার হরিনাম শুনিবে তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিও" তিনি এই আদেশ করিলেন। মুরারি গুপ্ত বলিলেন, "জীবগণের দুর্গতি দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সকলের পাপভার আমাকে দিয়া তাহাদিগকে আপনি উদ্ধার করুন।" চৈতন্য এই কথায় বিগলিতহৃদয় হইয়া বলিলেন, কৃষ্ণের ইচ্ছায় সকলেই মুক্ত হইবে, কাহারো জন্য তোমাকে নরকভোগ করিতে হইবে না, তিনিই সকলকে উদ্ধার করিবেন।" গৌর প্রত্যেকের গুণগরিমা সাধুতা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়া বহুবিধ রূপে ভক্তগণের প্রশংসা করিলেন। তাঁহার মুখে ভালবাসা এবং প্রশংসার কথা শুনিয়া তাঁহারা একবারে দাস হইয়া যাইতেন। এমন উদার প্রেম, ভ্রাতৃবাৎসল্য আর দেখা যায় না। এইরূপে একে একে বিদায় লইয়া

সকলে দেশে চলিয়া গেলেন। হরিদাস ঠাকুর, গদাধর, জগদানন্দ প্রভৃতি কয়েক জন কেবল প্রভুর সঙ্গে তথায় রহিয়া গেলেন।

বঙ্গদেশের বৈষ্ণবগণ বিদায় হইলে সার্ব্বভৌম অবসর পাইয়া গোসাঞীকে পাঁচ দিন ঘটা করিয়া নিজবাটীতে নিমন্ত্রণ খাওয়ান। অমোঘ নামক তাঁহার এক গৃহপালিত কুলীন জামাতা ছিল, কন্যার নাম শাঠী। জামাইটী বড় নিন্দুক স্বভাবের লোক। ভোজনের সময় পাছে প্রভুকে সে কোন মন্দ কথা বলে এই জন্য ভট্টাচার্য্য স্বয়ং লাঠি হাতে করিয়া অতি সাবধানে দ্বারে বসিয়া রহিলেন। উহারই মধ্যে ভট্টের অমনোযোগ জন্য যাই একটু সুযোগ পাইয়াছে, অমনি সে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "দশ জনের খাদ্য এক জন সন্ন্যাসী খাইতেছে?" ভট্টাচার্য্য তৎক্ষণাৎ তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করিলেন, তাঁহার গৃহিণী শাঠীর মাতা বক্ষে করাঘাত করতঃ স্বীয় কন্যা শাঠীকে রাঁড়ী বলিয়া বার বার গালি পাড়িতে লাগলেন। গৃহজামাতার মান্য সকল কালেই সমান। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ক্রোধাস্ফালন, তাঁহার ব্রাহ্মণীর আর্ত্তনাদ ক্রন্দন, জামাই বাবুর ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান, এ সমস্ত অতিশয় কৌতুকজনক। প্রেমিক সন্ন্যাসী গোরারায় এ সকল দেখিয়া শুনিয়া আর হাসি সংবরণ করিতে সক্ষম হইলেন না। অনন্তর চৈতন্য মিষ্ট বাক্যে উভয়কে সান্ত্বনা প্রদান করেন, তবে সে বিবাদ মীমাংসা হয়। ভট্টাচার্য্যের অত্যন্ত রাগ হইয়াছিল, কিছুতেই আর তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইল না। তিনি ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "শাঠীকে বল, তাহার স্বামী পতিত হইয়াছে, তাহাকে যেন সে আর গ্রহণ না করে। চৈতন্যকে যে নিন্দা করে, আমি তার মুখ দেখিব না। তাহাকে বধ করিলে তবে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। কিম্বা আমারই প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়ঃস্কর।" সেই রাত্রেই অমোঘকে ওলাউঠা রোগে ধরে, তাহাতে সে মর মর হয়। ভট্টাচার্য্য গৃহিণীর সহিত দুই দিন উপবাস করিয়া থাকেন। গৌরচন্দ্র যখন ইহা শুনিলেন, তখন তিনি অমোঘের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার বক্ষে হস্ত রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, "সহজেই এই ব্রাহ্মণহৃদয় তোমার নির্ম্মল, ইহা কৃষ্ণের বসিবার যোগ্য স্থান, কেন তুমি ইহাতে মাৎসর্য্য রূপ চণ্ডালকে বসাইলে? এক্ষণে উঠ, তোমার পাপ দূর হইয়াছে, কৃষ্ণের নাম লও।" জামাই বাবুটী তখন অনুতপ্ত হইয়া গালে মুখে চড়াইতে লাগিলেন। তাহাতে গাল ফুলিয়া উঠিল। অনন্তর প্রভু তাহাকে প্রবোধ দিয়া ভট্টাচার্য্যকে তাহার জন্য অনেক অনুরোধ

করিলেন, তাঁহাদের স্বামী স্ত্রী উভয়কে আহার করাইলেন। অমোঘ পরে এক জন গৌরভক্ত প্রেমিক বৈষ্ণব হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে আবার বৎসর ঘুরিয়া আসিল, নিতাই অদ্বৈত সকলে রথ দেখিতে আসিলেন। পুনরায় তাঁহাদের সঙ্গে পূর্ব্ববৎ নৃত্য কীর্ত্তন হইল। এবার শিবানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাসাদির পরিবারেরাও আসিয়াছিলেন। ভক্তসহবাসে কয়েক মাস পান ভোজন নৃত্য কীর্ত্তন মহোৎসব ইত্যাদি আমোদে পরম সুখে সকলে অবস্থান করিতেন। চৈতন্য এ অবস্থাতেও মধ্যে মধ্যে বন্ধুবর্গের সঙ্গে জলে সাঁতার খেলিতেন। জলকেলী ভক্তিপথের অনুরূপ ক্রীড়া। প্রেম ভক্তিরসে সন্তরণ এবং জলক্রীড়া উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। দেশে বিদায় দিবার সময় প্রভু নিত্যানন্দের হাতে ধরিয়া বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, "প্রতি বৎসর তোমার এখানে আসিলে চলিবে না, দেশে থাকিয়া আমার ইচ্ছা সফল করিবে, তুমি ভিন্ন আমার কার্য্য করে সেখানে এমন কেহ নাই। কুলীনগ্রামবাসীরা পূর্ব্বের ন্যায় বৈষ্ণবের লক্ষণ কিরূপ জানিতে ইচ্ছুক হওয়ায় পুনরায় গৌর হাসিয়া বলিলেন, "যাহার দর্শনে মুখে হরিনাম আইসে তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জান।" এ বড় সহজ লক্ষণ নয়। এইরূপে চারি বৎসর কাল গৌরচন্দ্র এখানে থাকেন, তীর্থ ভ্রমণে দুই বৎসর গত হয়, তদনন্তর বৃন্দাবন গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

## বৃন্দাবনযাত্রা এবং গৌড়দর্শন।

গৌরচন্দ্র পুরীধাম ছাড়িয়া যে অন্যত্র যাইবেন, তাহা আর ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু তাঁহার বৃন্দাবন দর্শন একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল। যাইবার কথা শুনিলেই দামোদর গদাধর রামানন্দ প্রভৃতি নানা বিঘ্ন উত্থাপন করেন। রথযাত্রা শেষ হইলে বলেন, কার্ত্তিক মাসে যাওয়া হইবে; কার্ত্তিক আসিলে বলেন শীত কালটা যাক, দোলের পর হবে। দোল শেষ হইলে আবার গ্রীষ্মের ভয় দেখান, অর্থাৎ তাঁহাকে ছাড়িতে আর কেহ চাহেন না। পরিশেষে সকলে অনুমতি দিতে বাধ্য হইলেন। গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন

মনে করিয়া পুরীধাম পরিত্যাগ করত চৈতন্য প্রভু প্রথমে কটকে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় রাজা প্রতাপরুদ্র মহিষীগণসহ তাঁহার চরণ বন্দনা করেন এবং বিশেষরূপে তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। ভক্তগণসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ দল বাঁধিয়া যখন পদব্রজে পথে বাহির হইতেন তৎকালকার শোভা দেখিয়া ঘোর পাষণ্ড বিষয়ীর মনও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। বড় বড় বিজ্ঞ পণ্ডিত প্রবীণ সব লোক;—কেহ দণ্ডী সন্ন্যাসী, কেহ গৃহস্থ বৈরাগী, কেহ রাজা, কেহ রাজকর্ম্মচারী। গৌর আপনি নাচিয়া দলশুদ্ধ লোককে নাচাইতেন। পথে প্রান্তরে গ্রামে বৃক্ষতলে দেবালয়ে সরোবরে এবং নদীতটে যেখানে সেখানে দিবানিশি কৃষ্ণপ্রেমানন্দে সকলে মাতিয়াই আছেন; নৃত্য গীত হাস্য ক্রন্দন আনন্দ আহ্লাদের আর বিচ্ছেদ থাকিত না। লক্ষ লক্ষ সৈন্যে যাহা না করিতে পারে, দশ জন দলবদ্ধ ভক্তে তাহা পারে। তাঁহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শকবৃন্দ হতবুদ্ধি হইয়া যাইত। রাজা প্রতাপরুদ্র স্বীয় মহিষীগণকে পটমণ্ডিত হস্তীর উপরে চড়াইয়া কটক পর্য্যন্ত আনিয়াছিলেন। তাঁহারা যবনিকার ভিতর হইতে ভক্ত গৌর-চন্দ্রের নবীন সন্ন্যাস-বেশ ভক্তিনেত্রে দর্শন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সাঙ্গোপাঙ্গপরিবেষ্টিত গৌররূপ এক স্বর্গীয় দৃশ্য।

কথিত আছে, জনৈক যবন ভূপতি ঐ দেশে তৎকালে ছিল। সে ব্যক্তি অতি দুর্জ্জন, সেই সময় উড়িষ্যা নৃপতির সঙ্গে তাহার সন্ধি স্থাপনের কথা চলিতেছিল। তাহার কোন এক ছদ্মবেশী অনুচর গৌরের ঐ মনোহর শোভা দেখিয়া তাহার মনিবকে গিয়া সংবাদ দেয়। যবন ভূপতি তাহা শুনিয়া মোহিত হইয়া গৌরের শরণ গ্রহণ করে এবং পরম বৈষ্ণব হইয়া যায়। নরপতি প্রতাপরুদ্র ভক্তবৃন্দের জন্য পথের অতি সুন্দর ব্যবস্থা করেন। নানা স্থানে লোক রাখিয়া, নূতন ঘর বাঁধিয়া পান ভোজনের অতি সুচারু বন্দোবস্ত করেন। ডাকে প্রতিদিন পুরী হইতে প্রসাদ আসিত। পথে লোকের সংঘট্ট যথেষ্ট। বিষয়ী রাজারা পরস্পর লড়াই বিবাদ করিয়া মরিতেছে। তাহার মধ্যে ভক্তেরা সদলে হরিপ্রেমানন্দে মাতিয়া এবং মাতইয়া হরিগুণ গাইতে গাইতে চলিতেছেন। রামানন্দ রায় রাজার একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন; রাজা বহু সমাদরে তাঁহাকে এবং অন্য লোক জন সঙ্গে দিয়া গোসাঞীকে বৃন্দাবন পাঠাইয়া দিলেন। কয়েক জন ভক্তসহচর সঙ্গে আসিলেন, কেহ কেহ পুরীতে রহিলেন। গদাধরের ইচ্ছা

সঙ্গে যান। গৌর বলিলেন,গোপীনাথের সেবা ছাড়িয়া তুমি যদি যাও তাহাতে অধর্ম্ম হবে। গদাধর বলিলেন, তা হয় হবে, তোমার চরণসেবাই আমার সার কার্য্য। না যদি সঙ্গে যাইতে দাও, আমি একা স্বতন্ত্র ভাবে শচীমাতাকে দেখিতে যাইব। এই বলিয়া বন জঙ্গল অপথে চলিলেন। গৌর শেষ হাসিয়া আলিঙ্গন দিয়া অনুনয় বিনয় সহকারে বলিলেন, তুমি ফিরিয়া যাও,নতুবা আমার অপরাধ হইবে। গোপীনাথের সেবা বন্দ করিয়া আমার সঙ্গী হইও না। অগত্যা তখন গদাধর পুরীক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে প্রভুর ইঙ্গিত ক্রমে ফিরাইলেন।

প্রভু কিছু দূর গিয়া রাজার লোক জন সমস্ত বিদায় দিলেন, কেবল রাজকর্ম্মচারী একজন মহাপাত্র সঙ্গে রহিল। পথের মধ্যে এক স্থানে সেই যবনের অধিকার ছিল। তাহার সীমায় পৌছিয়া উক্ত মহাপাত্র তাহাকে আহ্বান করিলেন। সে ব্যক্তি গৌরাঙ্গের ঐশ্বর্য্য বীর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হওত নৌকা সংগ্রহপূর্ব্বক নিজের লোক সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিল। আপনিও কতক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়াছিল।

প্রথমে মহাপ্রভু প্রাণিহাটী গ্রামে সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। মনে ইচ্ছা ছিল এই খানে কয়েক দিন নির্জ্জনে থাকিয়া গঙ্গাস্নান করিবেন, কিন্তু লোক পরম্পরায় তাঁহার স্বদেশপুনরাগমনবার্ত্তা অল্পকাল মধ্যে চারিদিকে এমনি বিস্তার হইয়া পড়িল যে নির্জ্জনতা আর রহিল না। নবদ্বীপ শান্তিপুর সকল স্থানেই সংবাদ গেল। গৌরদর্শনের জন্য আপামর সাধারণ স্ত্রী পুরুষ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল, মহা হরিধ্বনিতে গ্রাম পরিপূর্ণ হইল। লোকের ব্যাকুলতা আর্ত্তি দেখিয়া বাচস্পতি কি করিবেন ঠিক করিতে পারিলেন না। পাণিহাটী গ্রাম লোকে লোকারণ্য হইল। লোকদিগের জনতা দেখিয়া দীনের বন্ধু গৌরচন্দ্র আর ঘরে লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না। যাত্রিগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া আর ঘরে ফিরিয়া যাইতে চাহে না, বিষম সমারোহ হইয়া উঠিল, ইহা দেখিয়া তিনি তথা হইতে রাত্রিযোগে প্রস্থান করিলেন এবং কুমারহট্টে (হালিসহর) আসিলেন। লোকের আর বিশ্রাম নাই, এক দল যাইতেছে আবার দলে দলে আসিতেছে। চৈতন্য সেই গোলযোগের মধ্যে প্রস্থান করিয়াছেন, বাচস্পতি তাঁহাকে না দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, লোকেরা নিরাশ হইয়া পড়িল। তাহারা বাচস্পতিকে বলিতে লাগিল, "ঐ ব্রাহ্মণ প্রভুকে কোথায় লুকাইয়া

রাখিয়া ভান্ করিতেছে। উনি আপনি উদ্ধার হইবেন কেবল এই চেষ্টা!" সে ব্রাহ্মণ একে নিজের দুঃখে কাঁদিতেছে, তাহার উপর আবার ঐ সকল বাক্য-যন্ত্রণা। এমন সময় এক জন লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে ঠাকুর কুলিয়া গ্রামে গিয়াছেন। শুনিবামাত্র সকলে তথায় দৌড়িল। এ দিকে চৈতন্য কুমারহট্ট হইতে কাঁচড়াপাড়ার শিবানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এবং বাসুদেব দত্তের বাড়ী হইয়া কুলিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় মাধব দাসের গৃহে সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করেন। এই স্থানে এখনও একটি বার্ষিক মেলা হইয়া থাকে। গৌরকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপ অঞ্চলের অনেক লোক কুলিয়া গ্রামে আসিয়াছিল। ন্যায়শাস্ত্রের টীকাকার বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে চৈতন্য ভক্তিপথে আনিয়াছেন ইহা শুনিয়া নবদ্বীপের অধ্যাপক ছাত্র পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং কুলিয়া গ্রামে তাঁহাকে দেখিতে আইসেন। যত দিন নবদ্বীপে তিনি ছিলেন তত দিন তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, এক্ষণে বড়লোকের নামে চৈতন্যোদয় হইল। যেথানে গৌরচন্দ্র সেই থানেই মহা জনকোলাহল। কুলিয়া গ্রামে বহুলোক সমবেত হইয়া চারিদিকে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিল; তাহারা মাধব দাসের ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। প্রত্যেক দলের সঙ্গে গৌর এক বার করিয়া নাচিলেন। নানা স্থানে হাট বাজার বসিল, অদ্বৈত নিতাই প্রভৃতি শান্তিপুর ও নবদ্বীপের ভক্তগণ তথায় আসিলেন; লোকের সমারোহ, হরিনামের কোলাহল, ধর্ম্মের আন্দোলন দেখিয়া শুনিয়া চৈতন্যের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

এক ব্রাহ্মণ অনুতপ্ত হইয়া বলিল, ঠাকুর! আমি বৈষ্ণবের অনেক নিন্দা করিয়াছি, ইহার প্রায়শ্চিত্তবিধান কি হইবে? ঠাকুর বলিলেন, সেই পাপ ছাড়িয়া বিষ্ণুপূজা এবং ভক্তদিগের গুণ গান কর, ইহাই শ্রেষ্ঠ বিধি। পরে নবদ্বীপস্থ সেই ভাগবতপাঠক দেবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে ভাগবত পাঠ করিতে হয় তাহা আমাকে বলিয়া দিউন। প্রভু বলিলেন, ভক্তি সর্ব্বোপরি, ইহাই কেবল ব্যাখ্যা করিও। তদনন্তর তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে শচীদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হন।

গঙ্গার দুই ধারের লোকেরা স্রোতের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। কোন সময় যে তিনি নির্জ্জনে বসিয়া একাকী আপনার হৃদয়স্থ দেবতার সহবাস সুখসম্ভোগ করিবেন এমন অবসর ছিল না। যেথনে যান সেই থানেই সহস্র সহস্র লোক একত্রিত হয়। তাহা দর্শনে অবশ্য গৌরের

মনে উল্লাস জন্মিত, কিন্তু সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত উৎসাহাগ্নির মধ্যে বাস করিতে হইত, বিশ্রামের সময় পাইতেন না। এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মবিধানস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশ যেন তৎকালে ভাসিতেছিল; তাহার উপর নিতাই অদ্বৈত হরিনাম প্রচার দ্বারা ঐ সকল স্থানকে উজ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; সুতরাং চৈতন্যের পুনরাগমনে লোকের আনন্দোৎসব আরও পরিবর্দ্ধিত হইল। এই সময় পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও ধর্ম্মসংস্কার আরম্ভ হয়। ইয়োরোপে মার্টিন লুথার খ্রীষ্টধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপন করেন, এবং পঞ্জাবে গুরু নানক হরিভক্তির স্রোত খুলিয়া দেন। বাবা নানকের ভক্তিপ্রভাব অদ্যাপি সমরকুশল পরাক্রমশালী শিখ জাতির মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়।

অতঃপর চৈতন্যদেব ভাগীরথীর স্রোতের প্রতিকূলে তরণীযোগে বহুদূর-ব্যাপী জনস্রোতকে পশ্চাতে এবং পার্শ্বে লইয়া রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই স্থান পুরাতন রাজধানী গৌড় নগরের নামান্তর মাত্র। এখানে অদ্যাপি বর্ষে বর্ষে বৈষ্ণবদিগের একটি প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে। তৎকালে রামকেলী অতীব সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। সৈয়দ্ হুসেন্ সাহা যাঁহার কথা ইতিপূর্ব্বে কয়েক বার উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি এখানকার সিংহাসনে তখন রাজত্ব করেন। হুসেন্ সাহা এক জন উপযুক্ত কার্য্যদক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত ন্যায়বান্ রাজা ছিলেন; প্রায় চব্বিশ বৎসর কাল মহা গৌরবের সহিত স্বাধীনভাবে তিনি বঙ্গ বেহার উড়িষ্যা আসাম দেশকে আপনার অধীনে রাখেন। মিসর দেশীয় ঘোর অত্যাচারী কাফ্রিদিগকে তিনিই ডেকান্ অঞ্চলে বিদায় করিয়া দেন, তথায় তাহারা সিদ্ধি নামে খ্যাত হয়। পুরাতন দুষ্ট পাইকদিগকেও কর্ম্মচ্যুত করিয়া তিনি রাজকার্য্যের উন্নতি বিধান করেন। গৌরাঙ্গের সমাগমে নগরমধ্যে ভয়ানক আন্দোলন সমুপস্থিত হইল; এবং নগররক্ষকপ্রমুখাৎ সন্ন্যাসীর অলৌকিক মহিমার কথা শুনিয়া হুসেনের চিত্ত একবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি শুনিলেন যে সন্ন্যাসী কাহারো নিকট কিছু গ্রহণ করেন না, হরিনাম ভিন্ন আর তাঁহার মুখে অন্য কথা নাই; এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য নগরমধ্যে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। ফলতঃ এ যাত্রা গৌরচন্দ্র যে কয় দিন বঙ্গদেশে ছিলেন ধর্ম্ম প্রচার ভিন্ন তাঁহার আর অন্য কার্য্য কিছুই ছিল না। অবিশ্রান্ত লোকের জনতা এবং তাহাদের আগ্রহ দেখিয়া কেমন করিয়াই বা নিশ্চিন্ত মনে তিনি বিশ্রাম করিবেন? দূতমুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া রাজার হৃদয়

গৌরপ্রেমে মজিয়া গেল। তিনি কেশব বসু নামক জনৈক কর্ম্মচারীকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ব্যক্তি ভয়ে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! কে বলে এ ব্যক্তি বৃক্ষতলবাসী গরিব সন্ন্যাসী?" চৈতন্য যে এক জন দৈববলধারী মহাপুরুষ, হুসেনের তাহাতে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তিনি বলিলেন, সন্ন্যাসী আপনার রাজ্যে থাকিয়াও আমার আজ্ঞা পালন করেন, তাঁহার আদেশ সকল রাজ্যের শিরোধার্য্য। দেখ, আমার এই নিজরাজ্যের মধ্যেই কত লোক এমন আছে যাহারা আমার মন্দ কামনা করে; বিনা বেতনে আমি এত লোক এক জায়গায় কখনই করিতে পারি না; আমি যদি বেতন দিতে বিলম্ব করি, তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভৃত্যগণ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে। আর দেখ, ইহাঁর কথা সর্ব্বদেশের লোক কেমন কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করে, আপনার ঘরের খাইয়া ইহাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকে, তাহাও ভালরূপে করিতে পায় না বলিয়া তাহাদের কত আক্ষেপ! অতএব তাঁহাকে আর গরিব বলিও না। এখানে তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় করুন, তদ্বিষয়ে কেহ প্রতিরোধ করিলে আমি তাহার মস্তক লইব। এই হুসেন্ সাহা ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে উড়িষ্যা রাজার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সে দেশের অনেক হিন্দুকীর্ত্তি দেবমন্দির চূর্ণ করিয়া আসিয়াছেন, এখন দেখ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!

লোকের অত্যন্ত সমারোহ দর্শনে তত্রত্য গৌরভক্তগণ যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন, রাজারত মতি স্থির নাই, কাহার কুমন্ত্রণার বশীভূত হইয়া কোন্ সময় আবার কি বিপদ ঘটাইবে, অতএব ঠাকুরকে রাজধানী পরিত্যাগ করিতে বলা যাউক। এক ব্রাহ্মণ দ্বারা তাঁহারা এই বিষয় চৈতন্যকে বলিয়া পাঠাইলেন। বিপ্র বলিবে কি, ভাবে মত্ত গৌরচন্দ্রের নিকট সে অগ্রসর হইতেই পারিল না। লোকের ভয়ানক জনতা দর্শনে ব্রাহ্মণ নিকটে যাইতে অসমর্থ হইয়া শেষে তাঁহার সঙ্গিগণকে ঐ সংবাদ দিয়া আসিল। তাঁহারা ইহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। গোসাঞীজীও আভাসে বুঝিতে পারিলেন যে ইহাদের ভয় হইয়াছে; তিনি সে দিকে আর কর্ণপাত না করিয়া প্রভূত উদ্যমের সহিত নির্ভয়ে নাচিতে গাইতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ তখন প্রেমরস পান করাইয়া সকলকে এমনি প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, তিনিত তিনি, অন্য সাধারণ লোকেরও লজ্জা ভয় চিন্তা বিনষ্ট হইয়াছিল। মহাপ্রভু বৈষ্ণবদিগকে বলিলেন, "কেন তোমরা ভয়

পাও? রাজা যদি ডাকে আমি আগে যাইব। এ যুগে স্ত্রী শূদ্র যবন চণ্ডাল রাখাল সকলেই হরিভক্তিতে কাঁদিবে, কেবল জাতি কুল বিদ্যা ধন তপস্যাভিমানী ভক্তদ্বেষীরাই বঞ্চিত থাকিবে। রাজা আমাকে ডাকিবে, আমিও ত তাহাই চাই!" তাঁহার জীবন্ত আশাবাক্য শ্রবণে সকলে নির্ভয়চিত্ত হইলেন।

রূপ সনাতনের সঙ্গে এই স্থানে প্রথমে গৌরাঙ্গের মিলন হয়। এই বিখ্যাত প্রেমিক বৈরাগী ভ্রাতৃদ্বয়কে তৎকালে চৈতন্য এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যে, তোমরা যেমন উত্তম হইয়া আপনাদিগকে হীন করিয়া মানিতেছ, তেমনি অচিরে হরি তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন; বিষয় ত্যাজিয়া নিশ্চিন্ত মানস হও, পশ্চাতে আমি সমুদায় বিশেষ করিয়া বলিব। ভ্রাতৃদ্বয় গৌরকে নানামতে স্তব স্তুতি করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা পরম বৈষ্ণব দুই ভাই ধন্য, কিন্তু আমাকে এরূপে স্তব করিও না; আমি জীব, তোমরা আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার বৃন্দাবন দর্শন হয়, যেন আমার অন্তরে কৃষ্ণভক্তি স্ফূর্ত্তি পায়। তদনন্তর বহুলোকসমারোহ দেখিয়া সনাতন বলিলেন, এত লোক যাহার সঙ্গে তাঁহার কি কখন বৃন্দাবনযাত্রা সম্ভব? তথাপি চৈতন্য কানাইয়ের নাটশালা পর্য্যন্ত গমন করিলেন, কিন্তু লোক আর কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে না। শেষ সনাতনের কথানুসারে তাঁহাকে পুনরায় শান্তিপুর হইয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিতে হইল।

শান্তিপুর নগরে প্রভুর পুনরাগমন হইলে তৎক্ষণাৎ সচীদেবীকে আনিবার জন্য অদ্বৈত গোস্বামী লোক পাঠাইলেন। কতিপয় ভক্তসঙ্গে সচীমাতা যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন, চৈতন্য তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ এবং স্তব করিলেন। সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহার মাতৃভক্তির বিন্দুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। বহু দিনান্তে আবার সচীদেবী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া বিবিধ ব্যঞ্জনের সহিত পুত্রকে ভোজন করাইলেন। জননীর পবিত্র হস্তের অন্ন ব্যঞ্জন দর্শনে গৌরের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। অন্ন প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আহারে বসিয়া শাকের গুণ ও মহিমা বর্ণনা করিলেন। বেতোর শাক তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁহার মুখে শ্রীশাকের মহিমা শুনিলে কঠোর চিত্তও ভাবুকতায় পূর্ণ হয়। সামান্য উদ্ভিদ্ ভোজনে তাঁহার এত অনুরাগ হইত। গুরুদেবের প্রসাদ পাইবার জন্য ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলে মহা গণ্ডগোল আমোদ পরিহাস করিতেন। পত্রাবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া অনেক প্রেমবিবাদ উপস্থিত হইত।

গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি পূজা করিতেন, হিন্দু আচার ব্যবহার সমস্তই প্রায় মানিতেন। কিন্তু তাঁহার বাহ্য পূজা ভক্তির অদ্বৈতবাদানুযায়ী ছিল। তুলসী মুঞ্জরী-শোভিত উৎকৃষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাকে প্রণাম করা ইহা সংকীর্ণ পৌত্তলিকতা নহে। তাঁহার চক্ষে সমস্ত বিশ্ব হরিময় হইয়া গিয়াছিল। বিশেষ বিশেষ পদার্থ আবার বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিতেন। ভক্তির অদ্বৈতবাদ মতে এই দৃশ্যমান জগৎ মায়া নহে, কিন্তু ইহার জড় জীব স্থাবর জঙ্গম সমস্তই সচ্চিদানন্দের শরীর বিশেষ।

ভক্তদলের মধ্যে সে সময় প্রাচীন মহাপুরুষদিগের স্মরণার্থ পূজা মহোৎসবের জন্য একটি দিন নির্দ্ধারিত ছিল। "আবির্ভূ্য মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তি তৎস্বরূপতাং" ইত্যাদি শ্লোক হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। মহাপুরুষদিগকে ভক্তির সহিত ভাবনা ও অর্চ্চনা করিলে মনুষ্য তৎস্বরূপ লাভ করে। নবদ্বীপে শ্রীবাসগৃহে ব্যাসপূজার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। চৈতন্য শান্তিপুরে থাকিতে থাকিতে প্রাচীন ভক্ত মাধবেন্দ্র পুরীর উৎসবতিথি উপস্থিত হয়। মাধবেন্দ্র অদ্বৈতের গুরু ছিলেন। অদ্বৈতেরও পূর্ব্ববাস শ্রীহট্টের নিকট নবগ্রামে ছিল। ইহাঁর পিতার নাম কুবের, তিনি শান্তিপুরে বাস করেন। যখন এ দেশে ভক্তির কিছুমাত্র লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইত না, তখন মাধবপুরী একা ভক্তিরসে মাতিয়া বেড়াইতেন। তিনি অদ্বৈতকে দীক্ষিত করেন। এই মহোৎসব উপলক্ষে মহা ধুমধামের সহিত আহারাদি ও নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন হয়। এইরূপ এক একটি ক্রিয়া কর্ম্মে মহোৎসবে যথেষ্ট আমোদ হইত। এক জন অপরকে সেবা করিবার জন্য কত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কেহ বা সমাগত বৈষ্ণবগণের চরণ ধৌতকর্ম্মেই নিযুক্ত থাকিতেন। দ্রব্যাদি আহরণ রন্ধন পরিবেশন ইত্যাদি গুরুতর পরিশ্রমের কার্য্যে সকলেরই বিশেষ অনুরাগ ছিল। চাপাল গোপাল নামক নবদ্বীপের সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ কিছু দিন পরে কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। সে এই স্থানে আসিয়া অনেক আর্ত্তনাদ করায় চৈতন্য তাহাকে শ্রীবাসের নিকট ক্ষমা চাহিতে বলেন।

এই শান্তিপুর নগরে রঘুনাথ দাসের সঙ্গে চৈতন্যের পূর্ব্বে একবার পরিচয় হইয়াছিল। রঘুনাথ সপ্তগ্রামবাসী প্রসিদ্ধ ধনী ও বদান্য গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র। গোবর্দ্ধন বার লক্ষ মুদ্রার অধিস্বামী ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত ভূমি এবং অর্থ দ্বারা নবদ্বীপস্থ অনেক ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহ

হইত। চৈতন্যের মাতামহ এবং পিতাকে তিনি যথেষ্ট সম্মান করিতেন, সেই কারণে প্রভু ইহাদিগকে ভালরূপে জানিতেন। রঘুনাথ বালক কাল হইতেই ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। গৌর যখন সন্ন্যাসী হইয়া শান্তিপুরে আসেন, তখন অদ্বৈতভবনে বহুলোক সমাগত হয়, রঘুনাথও তন্মধ্যে ছিলেন, সেই সময় বৃদ্ধ আচার্য্যের সহায়তায় তিনি চৈতন্যের প্রসাদ লাভ করেন। তাহার পর রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া প্রেমে উন্মাদপ্রায় হইয়া অবস্থিতি করিতেন। বার বার নীলাচলে যাইবার জন্য পলায়ন করিতেন এবং বার বার তাঁহার পিতা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতেন। দশ বার জন লোক নিয়ত তাঁহার নিকট প্রহরী নিযুক্ত থাকিত। কত ধন রত্ন ভোগ বিলাসের সামগ্রী দেখাইয়া গোবর্দ্ধন তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই সন্তানের মন ফিরাইতে পারেন নাই। পরে এই যাত্রায় গৌরচন্দ্র শান্তিপুরে আসিলে রঘুনাথ তাঁহার পিতাকে বলিলেন, আমি গৌরচরণ দর্শনে যাইব বিদায় দাও, অন্যথা আমি প্রাণত্যাগ করিব। গোবর্দ্ধন স্নেহপরবশ হইয়া বহু লোক জন সামগ্রী সম্ভার সঙ্গে দিয়া সন্তানকে পাঠাইয়া দেন। রঘুনাথ কিরূপে বন্ধনমুক্ত হইয়া উদাসীন বেশে গৌরাঙ্গের সঙ্গে নীলাচলে চিরদিন বাস করিবেন এই কেবল সর্ব্বদা ভাবিতেন। প্রভু তাঁহার আন্তরিক ভাব অবগত হইয়া বলিলেন, তুমি স্থির হইয়া গৃহে অবস্থিতি কর, বাতুল হইও না, ক্রমে ক্রমে লোকে ভবসিন্ধু পার হয়। লোক দেখাইবার জন্য মর্কট বৈরাগ্যের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ কর, বাহিরে লৌকিক ব্যবহার রক্ষা করিয়া অন্তরে নিষ্ঠাযুক্ত হও, অচিরে সেই ভগবান হরি তোমাকে উদ্ধার করিবেন। আমি বৃন্দাবন হইতে পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাগত হইলে তুমি তথায় যাইবে। কোন্ সময় কি ভাবে যাইবে, হরি তাহা তোমাকে বলিয়া দিবেন। তাঁহার কৃপা যাহার উপর হইয়াছে তাহাকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে? দৈবাদেশের প্রতি মহাপুরুষদিগের বিশ্বাস কেমন স্বাভাবিক এবং দৃঢ়! তখন রঘুনাথ এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার পিতা মাতার মন সন্তুষ্ট হইল।

শান্তিপুর হইতে চৈতন্য গোসাঞী কুমারহট্টে আসেন, তথায় শিবানন্দ বাসুদেব দত্ত, শ্রীবাসাদি তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন। শ্রীবাস ভ্রাতৃগণ সহ তখন এই স্থানে থাকিতেন। ঠাকুর এক দিন তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীবাস! তুমি কোথাও যাও না, ভিক্ষাও কর না, এত পরিবার তোমার, কিরূপে দিন চলে? তিনি বলিলেন, কোথাও যাইতে আমার ইচ্ছা হয় না। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, কোন রূপে দিন চলিয়া যাইবে।—তবে তুমি সন্ন্যাস কর না কেন? না, তাহা আমি পারিব না।—সন্ন্যাসীও হইবে না, ভিক্ষাও করিবে না, তবে কিরূপে পরিবার পালন করিবে? তোমার কথার ভাবত আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না! একালে কোথাও না গেলে এক কপর্দ্দক পাওয়া যায় না। যদি আপনা হইতে দ্বারে কিছু উপস্থিত না হয়, তবে সে দিন তুমি কি করিবে? শ্রীবাস এক, দুই, তিন বার হাততালি দিয়া বলিলেন, এই আমার প্রতিজ্ঞা, তিন উপবাসের পর যদি আহার না মিলে, তবে গলায় কলসী বাঁধিয়া গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিব। তখন গৌরচন্দ্র যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া ভগবদ্গীতার এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন;—"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং।" যে সকল নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি অনন্য ভাবে চিন্তা করত আমার উপাসনা করে, তাহাদিগের অভাবের বস্তু আমি বহন করিয়া আনি এবং তাহা নিজেই রক্ষণাবেক্ষণ করি।

অনন্তর গৌরচন্দ্র কুমারহট্ট হইতে পাণিহাটী গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় কয়েক দিন অবস্থিতির পর এক দিন রাঘবকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, এই যে নিত্যানন্দকে দেখিতেছ, ইহাঁর দ্বারা সমস্ত কার্য্য হইবে, ইহাঁকে আমা হইতে অভেদ জ্ঞান করিও। পরে নিত্যানন্দের ধর্ম্ম প্রচারের প্রধান স্থান এইটিকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া তিনি বরাহনগরে উপস্থিত হন। এখানে এক ব্রাহ্মণ অতি মিষ্ট স্বরে ভাগবত পড়িতেন; তাঁহার পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া চৈতন্য প্রভু ভাগবত আচার্য্য এই নাম তাঁহাকে প্রদান করেন। এইরূপে গঙ্গার উভয় কূলবাসী গ্রাম সমস্ত প্রেম ভক্তিতে প্লাবিত করিয়া তিনি পুনর্ব্বার নীলাদ্রি চলিলেন। শান্তিপুর পরিত্যাগকালে মাতাকে প্রণাম করিয়া আর সকলকে বলিয়া আসেন যে, এ বৎসর তোমরা কেহ শ্রীক্ষেত্রে যাইবে না, আমি বৃন্দাবন গমন করিব, তোমরা অনুমতি দাও যেন তথা হইতে নীলাচলে পুনরায় নির্ব্বিঘ্নে আমি ফিরিয়া আসিতে পারি। বলা বাহুল্য যে প্রত্যেক স্থানে ভক্তসম্মিলন ও বিচ্ছেদের সময় হর্ষ বিষাদ প্রীতি অনুরাগ ইত্যাদি ভাবের ভীষণ তরঙ্গ উত্থিত হইত।

পুনরুক্তির ভয়ে তাহার বিস্তারিত বিবরণ আমরা লিখিলাম না। আমাদের লেখা কেবল ঘটনা লিপিবদ্ধ করা মাত্র, কিন্তু কোন ঘটনায় তাঁহাদের ভাবের বিরাম ছিল না; ভাদ্রমাসের গঙ্গানদীর ন্যায় ভক্তবৃন্দের প্রেমের প্রবাহ অবিশ্রান্ত প্রধাবিত হইত। ভাবময় জীবন, নিরন্তর সেই স্রোতেই সকলে ভাসিতেন। হ্রাস না হইয়া বরং উত্তোরোত্তর আরও ঘনীভূত এবং প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। এক বিষয় বারংবার শুনিতে শুনিতে হয়ত অনেকের নিকট ইহা পুরাতন হইয়া আসিল, কিন্তু তাঁহাদের ভাবভক্তি প্রেম স্থান কাল অবস্থা বিশেষে বিচিত্র এবং নবীনরূপে প্রকাশিত হইত। সকল রসেরই জোয়ার ভাঁটা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু গৌরভক্তবৃন্দের প্রেমোন্মত্ততা একমাত্র জীবিকা ছিল, শুষ্কতা নির্জ্জীবতা রসহীনতা তাঁহাদের পক্ষে মৃত্যু বলিয়া বোধ হইত। গৌরের আবার ষোল আনার উপর আঠার আনা না হইলে কুলাইত না। প্রবল বন্যাহত পদ্মানদীর ন্যায় তাঁহার জীবনপ্রবাহ ভাবভরে সর্ব্বদাই টল্‌মল করিত। তাঁহার জীবন আর ভক্তি প্রমত্ততা এক অখণ্ড জিনিষ, একটি হইতে অপরটিকে নিমেষের জন্যও পৃথক করা যায় না। হয় ভক্তিভাবের বিষম উত্তেজনা; আনন্দোল্লাসের প্রবল উচ্ছ্বাস, না হয় পাষাণভেদী ক্রন্দন ব্যাকুলতা, বিরহ যন্ত্রণা, দুঃসহ ক্লেশানুভূতি; পর্য্যায়ক্রমে প্রধানতঃ এই দুইটি ভাব গতায়াত করিত। আমাদের মত লোকের এক দিন একটু উৎসাহ প্রমত্ততা হইলে, দশ দিন উপবাস শুষ্কতা নির্জ্জীবতায় গত হয়। প্রেমসাগর গৌরচন্দ্র যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ছিলেন এক দিনের জন্য, এক ঘণ্টার জন্যও তাঁহার মত্ততার বিরাম দেখা যায় নাই। যাহার চক্ষের সম্মুখে তাঁহার ভাবময়ী শ্রীমূর্ত্তি এক বার আবির্ভূত হইয়াছে, যে দেশ, যে গ্রাম দিয়া তিনি একবার চলিয়া গিয়াছেন, সে সকল স্থান এবং মনুষ্যের অন্তস্তল পর্য্যন্ত একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। জীবন্ত মনুষ্যের কোন ক্রিয়া উদ্যমশূন্য নীরস হয় না।

# নিত্যানন্দের ধর্ম্মপ্রচার।

চৈতন্য কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া নিতাই পাণিহাটী গ্রামে প্রথম প্রচারক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন। গৌরের ভক্তিভাব তাঁহাতে বিশেষরূপে সংক্রামিত হইয়াছিল। ভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগকে লইয়া মহা উৎসাহের সহিত প্রচারকার্য্যে ব্রতী হওত তিনি নানা জাতীয় লোকদিগকে ভক্তিপথে আনিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সঙ্গিগণও এক এক জন গুরুতুল্য উন্নত চরিত্রের লোক, অনেক বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন। তিন মাস কাল প্রভূত উৎসাহ সহকারে হরিনাম প্রচার করিয়া গঙ্গার উভয় পার্শ্বের গ্রামসকলকে ইহাঁরা প্রমত্ত করিয়া তুলিলেন। অবধূত এ সময় প্রেমাবিষ্ট হইয়া আর এক অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। পূর্ব্বেব যোগীবেশ পরিত্যাগ করিয়া পট্টবস্ত্র এবং স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদি রত্ন খচিত নানা অলঙ্কারে ভূষিত থাকিতেন। অল্পকালমধ্যে বঙ্গদেশে তাঁহার এক প্রকাণ্ড ভক্ত এবং প্রচারক দল প্রস্তুত হইল। গঙ্গার উভয় কূলে যত যত গ্রাম ছিল, সমস্ত গ্রামে তাঁহারা সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পাণিহাটিতে ক্রমাগত কিছু দিন ধরিয়া নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসব হইয়াছিল এবং বহু শত লোক বৈষ্ণবপথ আশ্রয় করিয়াছিল। কয়েক মাস পরে শচীমাতাকে দেখিবার জন্য নিতাই ক্রমে উত্তরাভিমুখে চলিলেন। কয়েক দিন খড়দহে থাকিয়া সপ্তগ্রামে উপনীত হইলেন। সপ্তগ্রাম তৎকালে এ দেশের মধ্যে প্রধান বাণিজ্য স্থান এবং অতিশয় বিখ্যাত নগর ছিল। ত্রিবেণীর ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া ঐ নগরে উদ্ধরণ দত্ত নামক এক জন সম্ভ্রান্ত ধনবান্ সুবর্ণবণিগ্‌গৃহে তিনি উপস্থিত হন। এই উদ্ধরণ দত্ত হইতে সুবর্ণবণিগ্‌সমাজে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশেষরূপে বিস্তারিত হইয়াছে। ঐ স্থানে এখনও উদ্ধরণ দত্তের স্থাপিত এক আখড়া আছে। ত্রিশবিঘা নামক ষ্টেসনের নিকট এই সপ্তগ্রাম। এখানে প্রাচীন কালের গৃহাদির ভগ্নাবশিষ্ট চিহ্ন অদ্যাপি কিছু কিছু নয়নগোচর হয়। চৈতন্যের অবস্থান কালে নবদ্বীপের মধ্যে যেমন হরিনাম পরিঘোষিত হয়, তেমনি সপ্তগ্রামের প্রত্যেক বণিকের ঘরে নিতাই সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করেন। সে সময় স্বর্ণবণিক্‌গণ ব্রাহ্মণদিগের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, এই জন্য তাঁহাদের উন্নতসম্বন্ধে লোকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া

বলিত যে নিত্যানন্দের কৃপায় ইহারা তরিয়া গেল। ফলে নিতাই সপ্তগ্রামে হবিনাম প্রচাব কবিয়া বহু লোককে স্বদলভুক্ত করেন। তদনন্তর তিনি শান্তিপুবে অদ্বৈতেব সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নবদ্বীপধামে চলিয়া যান। শচীদেবী ইহাঁকে পাইয়া অতুল আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইদানীন্তন কেবল ধর্ম্মকর্ম্মেতে নিযুক্ত থাকিতেন। নিত্যানন্দের সঙ্গে অপরাপর ভক্তগণ মিলিত হইয়া নবদ্বীপকে পুনরায হরিনামরসে সঞ্জীবিত কবিয়া তুলিলেন। ইহার নিকটবর্ত্তী বড়গাছি, দোগাছিয়া প্রভৃতি গণ্ডগ্রাম সকলেও সে সময় হবিভক্তি প্রচারিত হয়। নিতাইয়ের নূতনবিধ বেশ ভূষা আচার ব্যবহার দর্শনে সন্দিহান হইয়া এক ব্রাহ্মণ শ্রীক্ষেত্রে গিয়া চৈতন্যকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তিনি তাহাতে এই রূপ উত্তর দেন যে, পদ্মপত্রেব জলের ন্যায় তাঁহার চরিত্র নির্লিপ্ত, তাঁহাতে হরি সর্ব্বদা বিরাজ করেন, নিকৃষ্ট অধিকারীব পক্ষে যাহা পাপ তাহা নিত্যানন্দে সম্ভবে না। রুদ্র হলাহল পান করিতে পাবেন, অন্যে করিতে গেলে প্রাণে বিনষ্ট হয়। তাঁহার জীবন বিধিনিষেধের অতীত জানিবে। তাঁহাকে আদর করিলে পরিত্রাণ হয়।

নিত্যানন্দ প্রথম বয়সে সন্ন্যাসীব বেশে তীর্থ পর্য্যটন করেন এবং তদবস্থায় বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত পাণ্ডারপুব নামক তীর্থ স্থানে মাধবাচার্য্য সম্প্রদায়াশ্রিত লক্ষ্মীপতির নিকট মন্ত্র গ্রহণ কবেন। এই লক্ষ্মীপতি মাধবেন্দ্র পুবীবও মন্ত্রদাতা গুরু। অবধূত নিতাই বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া কিছু কাল বৃন্দাবনে থাকিয়া পবে নবদ্বীপে চৈতন্যেব সঙ্গে মিলিত হন। গৌর সন্ন্যাসী হইলে ইনি পূর্ব্ব আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করত নানাবিধ বসন ভূষণ পবিধান করিতেন। সুবর্ণবণিগ্ সমাজ ইহাঁব শিষ্য। গোবর্দ্ধন নামক এক ব্যক্তির ইচ্ছায় নিত্যানন্দ গোসাঞী নববিধ বেশ ভূষা ধারণ করিয়াছিলেন এইরূপ শুনা যায়। এই অবস্থায তিনি বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া শত শত নর নারীকে দলভুক্ত করিলেন। নবদ্বীপে তখন শ্রীবাসাদি ভক্তগণ অনেকে ছিলেন, অদ্বৈত গোসাঞী আসিয়া তথায় মিলিলেন, সকলের সহিত একত্রিত হইয়া নিত্যানন্দ নবদ্বীপ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের মধ্যে হরিভক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে অবধূত নবদ্বীপ ধামে কিছু দিন অবস্থিতি করেন, এবং এই সময় তাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা হয়। গৃহস্থভক্ত গৌরাঙ্গ দণ্ডধারী সন্ন্যাসী

হইয়া পুরীধামে অবস্থানপূর্ব্বক প্রগল্‌ভা ভক্তি এবং ত্যাগস্বীকার বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত দেখাইতে লাগিলেন, এ দিকে অবধূত নিতাই পূর্ব্বকার সন্ন্যাসবেশ ছাড়িয়া দারপরিগ্রহপূর্ব্বক সংসারের মধ্যে থাকিয়া গৃহস্থ লোকদিগকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার জন্য প্রবৃত্ত রহিলেন, উভয়েরই পূর্ব্ব ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বিবাহের ইচ্ছা শুনিয়া অদ্বৈত শ্রীবাস সকলেই মহা আহ্লাদিত হইলেন এবং তদ্বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন। বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলে নিতাই মৃদু মৃদু হাস্য করিতেন। তাঁহার অচিন্ত্য প্রভাব দর্শনে ভক্তগোষ্ঠী সকলে মুগ্ধ হইতেন। এক দিন সকলে শ্রীবাসের ভবনে সভা করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া পণ্ডিতকে ইঙ্গিতে জানাইল, বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পরে উভয়ে নিভৃতে কথাবার্ত্তা কহিয়া দিন স্থির করিলেন। "নবদ্বীপের উত্তর বড়গাছি গ্রাম, তাহার নিকট সালি-গ্রামে পণ্ডিত সূর্য্যদাস সরখেল নামে এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আছেন, তাঁহার বসু ও জাহ্নবা নাম্নী দুই পরমা সুন্দরী কন্যা আছে, সূর্য্যদাস উক্ত কন্যাদ্বয় নিতাইকে অর্পণ করিতে চাহে।"—শ্রীবাস এই প্রস্তাব শুনিয়া মহা আহ্লাদ প্রকাশ করত সভামধ্যে তাহা ব্যক্ত করিলেন, তাহা শ্রবণে সকলেরই আনন্দ বৃদ্ধি হইল, নিতাইও হাস্য করিলেন। পর দিন প্রাতে সকলে দলবদ্ধ হইয়া সালিগ্রামে যাত্রা করেন এবং যথাসময়ে উক্ত কন্যাদ্বয়ের সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ প্রদান করিয়া পুনরায় নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন। শচীদেবী নব বধূদ্বয়কে পাইয়া যথোচিত সমাদর করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ঠাকুরের বীরভদ্র নামে এক পুত্র এবং গঙ্গা নামে এক কন্যা জন্মে।

# নীলাদ্রি হইয়া চৈতন্যের বৃন্দাবন গমন।

কতিপয় দিবসান্তে পুনরায় গৌরচন্দ্র নীলাচলে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সমাগমে উৎকলবাসিগণের মধ্যে মহোৎসব আরম্ভ হইল, রাজা গজপতি আহ্লাদে পুলকিত হইলেন। এ যাত্রা চারি মাস কালমাত্র তিনি এখানে ছিলেন। তত্রত্য ভক্তদলে প্রবেশ করিয়া গৌড়দেশের অদ্ভুত ব্যাপার সমস্ত বলিলেন। রূপ সনাতনের পরিচয় দিলেন। তাঁহারা এত লোক জন

সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন যাইতে নিষেধ করেন তাহা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কোথায় আমি ভাবিলাম মাতার সঙ্গে দেখা করিয়া গৌড়ভক্তগণসঙ্গে বৃন্দাবনে যাইব, দেখি যে লোকের জনতায় পথে চলিতে পারি না। নির্জ্জনে বৃন্দাবন সম্ভোগ করিব, তাহা না হইয়া বহু সহস্র সৈন্যসঙ্গে যেন ঢাক বাজাইয়া চলিলাম। ইহাতে মনে ধিক্কার উপস্থিত হইল, তাই আবার এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। মাধবপুরী যেমন একাকী বৃন্দাবন গিয়াছিলেন, আমি তেমনি করিয়া যাইব, নিতান্ত পক্ষে এক জনমাত্র লোক না হয় সঙ্গে যাইবে। দামোদর এবং রামানন্দ রায়সমীপে এই কথা বলিয়া প্রভু বিদায় চাহিলেন এবং তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন, কেহ যদি আমার সঙ্গে যায় তাহাকে তোমরা নিষেধ করিও। তোমরা প্রসন্ন হইয়া বিদায় দাও, তোমাদের সুখেই আমার সুখ। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া চৈতন্য গোসাঞী বনপথে গোপনভাবে বৃন্দাবনযাত্রা করেন।

বিহঙ্গকূজিত, শ্বাপদবন্য-জন্তুসঙ্কুল বিস্তীর্ণ অরণ্যানী নদী নির্ঝর পর্ব্বতরাজি অতিক্রম করিয়া হরিগুণ গাইতে গাইতে গৌর চলিতে লাগিলেন। প্রেমের আবেশে কত পথই পরিভ্রমণ করিতেন! ভয়ও নাই, শ্রান্তিও নাই, মধুর স্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন। যেখানে নির্ম্মল জলপ্রবাহ, গিরিচূড়া, এবং সুরম্য কাননকুঞ্জ অবলোকন করেন সেই স্থানকেই বৃন্দাবন বলিয়া মনে হয়। এমনি তাঁহার গাঢ় প্রেমানুরাগ, বোধ হইতেছিল যেন মৃগ পক্ষী, বৃক্ষলতা, শৈলকন্দর, তটিনী নির্ঝর, হিংস্র জন্তুনিচয় সকলেই তদীয় মুখারবিন্দবিগলিত হরিনামামৃত পানে প্রমত্ত হইয়া সেই নাম প্রতিধ্বনিত করিতেছে। বৃক্ষশাখায় বিচিত্র দৃশ্য ময়ূরগণ বসিয়া কেকারব করিতেছে, মৃগকুল ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে, কুলকুল শব্দে জলস্রোতঃ বহিতেছে; এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার মন নিরতিশয় সুখানুভব করিতে লাগিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন, পথে বাঘ শুইয়া আছে; গৌরাঙ্গের অঙ্গস্পর্শে সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে লাগিল। বন্য হস্তীযূথ নির্ঝরের জলপান করিতেছিল; গৌর যাই তাদের গায়ে জলের ছিটা দিলেন অমনি তাহারা হরি হরি বলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। বাঘ হরিণ হাতী সব এক সঙ্গে সখ্যভাবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মৃগ এবং ব্যাঘ্র পরস্পরে মুখচুম্বন করিতে লাগিল। বৃক্ষ লতা বনরাজী পশু পক্ষী গৌরমুখবিনিঃসৃত সুধামাখা হরিনাম শ্রবণে যেন সজীব হইয়া উঠিল। নির্জ্জনে নিরাপদে হরিকে

সম্ভোগ করিবার জন্যই বৃন্দাবন গমন। ছোট নাগপুরের পুরাতন বনপথ সে পক্ষে নিতান্ত অনুকূল বোধ হইয়াছিল। এ পথে বসতি অতি অল্প, ব্রাহ্মণ ভদ্র প্রায় কেহ নাই, বলভদ্র তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া পথে বনের মধ্যে নির্ঝর তীরে বনের শাক তুলিয়া তাই রাধিতেন। পর্ব্বতকন্দরে অরণ্য-মাঝে সেই শাকান্ন ভোজন করিয়া গৌর কি পরমানন্দই ভোগ করিতে লাগিলেন! যে দিকে দৃষ্টি করেন সব যেন মধুময়। হৃদয়ে যার বৃন্দাবন, তাহার আর সুখের অন্ত কোথায়! এক দিন আহ্লাদিত হইয়া সঙ্গী ব্রাহ্মণকে বলিলেন, আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এমন আনন্দ কোথাও পাই নাই। দয়াময় কৃষ্ণ আমাকে বনপথে আনিয়া বড় সুখ দিলেন। সনাতন দ্বারা তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়া গৌড়ের পথ হইতে ফিরাইয়া এই পথে আনিলেন, তিনি কৃপাসাগর, দীনবন্ধু, তাঁহার দয়া ব্যতীত কোন সুখ হয় না। এই বলিয়া কৃতজ্ঞতাভরে ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন। যদিও গৌর এক্ষণে নির্জ্জনবাসী সন্ন্যাসী, কিন্তু তাঁহার ভ্রমণ দ্বারা আপনা-পনি ধর্ম্ম প্রচার হইতে লাগিল। মহাপুরুষদিগের অস্তিত্বই প্রচারের কার্য্য করিয়া থাকে। তিনি যে ভাবে যে দেশ দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সেই ভাব দেখিয়া সে দেশের লোক ভক্তি শিক্ষা করিয়াছে। বিজ্ঞাপন ঘোষণাও নাই, বক্তৃতা করাও নাই, সহজে বিচার তর্ক করাও নাই, তথাপি তাঁহার দর্শনমাত্র লোকের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইত। গৌরপ্রেমের এক বিন্দু অশ্রুজল সহস্র প্রচারকের কার্য্য করিতে পারিত। পথে ঝারিখণ্ড নামক স্থানে অসভ্য ভিল্‌দিগের উপরেও তাঁহার কৃপাবারি বর্ষিত হইয়াছিল। এইরূপে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি কাশীধামে আসিয়া উপনীত হন।

কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিয়া প্রভু বসিয়া আছেন এমন সময় সেই শ্রীহট্টের পূর্ব্বপরিচিত তপন মিশ্র আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গেল। চন্দ্রশেখর আচার্য্য তখন এখানে পুঁথিলেখার কাজ করিয়া দিন নির্ব্বাহ করিতেন। সহসা ইহাঁরা প্রভুর দর্শন পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। কাশীধামে মায়াবাদী সন্ন্যাসী পণ্ডিতদিগের বিষম প্রাদুর্ভাব, নির্গুণ ব্রহ্ম, মায়া, অবিদ্যা ষড়দর্শন ভিন্ন আর অন্য কথা নাই। পুরাতন ধর্ম্মবন্ধুদ্বয়ের আগ্রহে তাঁহাকে দশ দিন কাল তথায় থাকিতে হইয়াছিল। এক দিন মহারাষ্ট্রীয় কোন ব্রাহ্মণ ইহাঁর তেজোময় দিব্য রূপলাবণ্য ও ভক্তির অলৌকিক ভাব সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তত্রত্য প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক

পণ্ডিত প্রকাশানন্দকে এই সংবাদ জানাইলেন। পণ্ডিত ইহা শুনিয়া গর্ব্বিতভাবে হাস্য করিলেন এবং উপহাসপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হাঁ শুনিয়াছি, কেশব ভারতীর শিষ্য গৌড় দেশীয় চৈতন্য নামক ভাবুক সন্ন্যাসী দেশে দেশে লোক নাচাইয়া বেড়ায়, তাহার ঐন্দ্রজালিক মোহে পতিত হইয়া তাহাকে সকলে ঈশ্বর বলে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাহার সঙ্গে পাগল হইয়াছে; সে সন্ন্যাসী কেবল নামমাত্র, এখানে তাহার ভাবুকালী বিক্রয় হইবে না, তুমি বেদান্ত শ্রবণ কর, এরূপ উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র লোকের সঙ্গে মিশিলে ইহ পরকাল বিনষ্ট হয়। পণ্ডিতের কঠোর শ্লেষ বচনে সে ব্রাহ্মণ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সে কথা চৈতন্যকে বিদিত করিল, এবং বলিল, প্রকাশানন্দ একবারও কৃষ্ণনাম না লইয়া তিন বার চৈতন্য নাম উচ্চারণ করিল। ঠাকুর বলিলেন, মায়াবাদীর মুখে ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য ব্যতীত কৃষ্ণনাম আসে না। কৃষ্ণের নাম স্বরূপ এ দুই অভেদ্য। নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিনি একই বিষয়, তিনই অভেদ্য চিদানন্দময়। জীবের ধর্ম্ম, নাম, দেহ, স্বরূপ সকল ভিন্ন ভিন্ন। কৃষ্ণের নাম, গুণ, লীলা, সমস্তই চিদানন্দময়, স্বপ্রকাশ; তিনি প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। আমি ভাবুকালী বিক্রয় করিতে আসিয়াছি বটে! বড় ভারি বোঝা! অল্প সল্প যাহা পাই এই খানে বিক্রয় করিয়া যাইব!

তদনন্তর ভক্তনিধি গৌরাঙ্গ প্রয়াগে তিন দিবস থাকিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। পথে যেখানে যমুনা দেখিতেন সেই খানেই জলে গিয়া পড়িতেন। যাইবার সময় স্থানে স্থানে অনেক লোক তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে। বৃন্দাবনে গিয়া তিনি সকলই কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার ভক্তি প্রমত্ততা, দেখিয়া লোকসকল মুগ্ধ হইয়া গেল। এখানে মাধবপুরীর শিষ্য এক সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে প্রভুর প্রথমে আলাপ হয়, তাহাকে সঙ্গে করিয়া তিনি বৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। গৌরের অনির্ব্বচনীয় ভক্তি উন্মত্ততা দর্শনে ব্রজবাসিগণ বলিতে লাগিল, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রাগুক্ত বিপ্রের নৃত্য কীর্ত্তন দর্শনে চৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, এ প্রেমমহাধন তুমি কোথায় পাইলে? শেষ কথায় কথায় প্রকাশ হইয়া পড়িল, মাধবেন্দ্র পুরী হইতে উভয়েতেই ভক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে; তখন আধ্যাত্মিক প্রেমের আত্মীয়তা তাঁহারা অনুভব করিলেন। এবং বিপ্রের চরণে গৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই বিপ্রের সঙ্গে তথায় রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

প্রভৃতি যত যত প্রসিদ্ধ স্থান আছে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন। রাধাকুণ্ড তখন ছিল না। এক ধান্য ক্ষেত্রের জলে গৌর স্নান করিয়া নৃত্য কীর্ত্তন করেন। এক একটী স্থানে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আবির্ভাব হয়। যেখানে যে লীলা পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহার সহিত তিনি একাত্মতা অনুভব করেন।

বৃন্দাবনধাম চৌরাশি ক্রোশ বিস্তৃত। এখন যে স্থান বৃন্দাবনতীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে শুনা যায়, চৈতন্যের সময় হইতে ইহার আরম্ভ, তৎপূর্ব্বে লোকে নানা স্থান ভ্রমণ করিত। যথায় গোবিন্দজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সে স্থান তাঁহারই আবিষ্কৃত বলিয়া প্রতীত হয়। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তির ধর্ম্মকে চৈতন্যই বিশেষরূপে পুনর্জ্জীবন দান করিয়া তাহা প্রচার করেন, এই জন্য তাঁহার আগমনের সময় হইতে বৃন্দাবন একটী বিখ্যাত তীর্থ হইয়াছে। অনেক বাঙ্গালী বৈষ্ণব বৈষ্ণবী এই স্থানকে এখন পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। কথিত আছে, চৈতন্য প্রভুর বৃন্দাবনভ্রমণকালে তথাকার গাভীগণ আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক হাম্বা রবে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হয়, মৃগীগণ অঙ্গলেহন করে, বিহঙ্গগণ বিচিত্র মধুরস্বরে গান করিতে থাকে, শিখীকুল তাহার অগ্রে অগ্রে নাচিতে নাচিতে যায়, এবং বৃক্ষলতা ফল ফুল বর্ষণ করে। তাঁহাকে দেখিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণের অন্তঃকরণে কৃষ্ণলীলার ভাব পুনরুদিত হইয়াছিল। কোন কোন ব্যক্তি চৈতন্যকে কৃষ্ণ বলিয়া প্রশংসা করাতে তিনি বিষ্ণুঃ! বিষ্ণুঃ! বলিয়া কর্ণে হস্তার্পণ করেন এবং তাহাদিগকে বলেন, এমন কথা তোমরা কহিও না, জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কখন করিও না, ঈশ্বরের সহিত জীবের তুলনা, জলদগ্নিরাশির সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিসদৃশ। এখানে কৃষ্ণদাস নামক এক জন রাজপুত গৌরপ্রেমে মজিয়া তাঁহার সঙ্গে বৈরাগ্যপথ অবলম্বন করে এবং তাঁহার সেবায় সে নিযুক্ত থাকে। বৃন্দাবনে ক্রমশঃ এত জনতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইতেও সকলে অবসর পাইল না। লোকের কোলাহল, নিমন্ত্রণের আতিশয্য, গুরুদেবের নিরন্তর ভাবাবেশ উন্মাদ লক্ষণ দেখিয়া, কৃষ্ণদাস এবং বলভদ্র তাঁহাকে প্রয়াগে যাইতে পরামর্শ দিলেন। তিনি কৃষ্ণদাসকে বলিলেন, তোমার অনুগ্রহে আমি বৃন্দাবন দেখিলাম, তুমি যেখানে লইয়া যাইতে চাও যাইব। পরে তিন জনে প্রয়াগে প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে এক বৃক্ষতলে গৌরচন্দ্র ভাবাবিষ্ট হইয়া অচেতনপ্রায় পড়িয়া

আছেন, মুখে ফেন উদ্গীরিত হইতেছে, ইত্যবসরে দশ জন পাঠান জাতীয় অশ্বারোহী সৈন্য বিশ্রামার্থ তথায় অবতরণ করিল। গৌরের অদ্ভুত প্রেম-বিকার দর্শনে তাহারা মনে করিল, সঙ্গের এই দুই ব্যক্তি সন্ন্যাসীর ধন বহু হরণ করিয়া কোন মাদক সেবন দ্বারা ইহাঁকে অজ্ঞান করিয়াছে। এই সন্দেহে তাহারা উহাদিগকে বাঁধিয়া মারিতে উদ্যত হইল। কৃষ্ণদাস রাজপুত, তাহার সাহস ছিল, স্বরূপ কথা সে প্রকাশ করিয়া বলিল। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বচসা চলিতেছে, বঙ্গবাসী বিপ্র বলভদ্র ভয়ে কাঁপিতেছেন, এমন সময় গৌরসিংহ হরি হরি বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার প্রেমময় রূপ দেখিয়া পাঠানদল মোহিত হইয়া গেল। তন্মধ্যে এক জন যে সর্ব্বপ্রধান, সে বৈষ্ণব হইল; চৈতন্য তাহার নাম রামদাস রাখিলেন। বিজুলি খাঁ তাহাদের যে মনিব, সেও মহাপ্রভুর শরণাগত হয়, ইহাদিগকে পাঠান বৈরাগী বলিয়া সকলে জানিত। চৈতন্য প্রয়াগে উপস্থিত হইলে কিছু দিন পর শ্রীরূপ গোস্বামী তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমকে সঙ্গে লইয়া তথায় আসিয়া মিলিত হইলেন।

## রূপসনাতনের বৈরাগ্য।

শ্রীজীব গোস্বামীকৃত লঘুতোষিণী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যজুর্ব্বেদীয় বিপ্র কুলোদ্ভব ধর্ম্মাত্মা কর্ণাটরাজ সর্ব্বজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধের রূপেশ্বর ও হরিহর নামে দুই পুত্র ছিল। রূপেশ্বর রাজ্যচ্যুত হইলে তাঁহার তনয় পদ্মনাভ নবহট্ট (নৈহাটী) নামক গ্রামে গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। পদ্মনাভের পুত্র মুকুন্দ, তাঁহার পুত্র কুমার, তাঁহারই পুত্র সনাতন, রূপ, বল্লভ,—(চৈতন্য ইহাঁকে অনুপম বলিয়া ডাকিতেন) এই তিন ভাই। সনাতন এবং রূপ বৈষ্ণব হওয়ার পূর্ব্বে গৌড়রাজধানীতে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই অবস্থায় "হংসদূত" এবং "পদ্যাবলী" গ্রন্থ রচনা করেন, ইহাঁরা রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন, পণ্ডিতদিগের সঙ্গে বিবি হইয়া আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর ধন দান করিতেন। দাঃ তখন প্রদেশের ভট্ট উপাধিধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ইহাঁরা আনয়ন করে বিপ্রের রামকেলী গ্রামের নিকট স্থাপন করেন, সে স্থানের নাম ভট্টগ্রাম পার্শ্বে

সনাতন উচ্চকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণতনয়, যবন রাজার গৃহে বিষয় কার্য্য করিয়া আপনাদিগকে ম্লেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোষে দোষী মনে করিতেন। পূর্ব্ব হইতেই ভ্রাতৃদ্বয় বিদ্যা বিনয়সম্পন্ন ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। রূপের দবির-খাস, এবং সনাতনের সাকরমল্লিক এই দুই যাবনিক উপাধি ছিল। চৈতন্য-দেবের অনুগ্রহে ইহাঁরা ধন সম্ভ্রম উজিরি পদ ত্যাগ করিয়া এমন বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে তাহা শুনিলে ঘোর বিষয়ী লোকেরও চিত্ত চমকিত হয়। এই দুই জন কানাইনাটশাল হইতে প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করত কিছু দিবসের পর তাঁহার অনুসন্ধানার্থ নীলাচলে লোক পাঠাইয়া দেন। যখন শুনিলেন গৌরাঙ্গ বৃন্দাবনে গিয়াছেন, তখন শ্রীরূপ সমস্ত ধন সম্পত্তি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কুটুম্বগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া অনুপম সমভিব্যাহারে প্রয়াগে চলিয়া আসিলেন, এবং সনাতনকে তদ্বৃত্তান্ত লিখিলেন। সনাতনের বিষয়বন্ধন তখনও বিমুক্ত হয় নাই। তিনি ভাবিলেন রাজা যদি আমার প্রতি বিরক্ত হন তাহা হইলেই এ যাত্রা আমি অব্যাহতি পাই। এই মনে করিয়া আপন ভবনে পণ্ডিতগণের সঙ্গে ভাগবত আলোচনায় প্রবৃত্ত রহিলেন। রাজার লোক আসিলে বলেন শরীর অসুস্থ হইয়াছে। রাজবৈদ্য পরীক্ষা করিয়া জানিলেন সর্ব্বৈব মিথ্যা। ও দিকে মন্ত্রী অভাবে রাজকর্ম্ম অচল হইয়া উঠিল, বিশেষতঃ তখন উড়িষ্যা-দেশে যুদ্ধ উপস্থিত, রাজাকে তথায় যাইতে হইবে। এক দিন গৌড়েশ্বর নিজেই সনাতনের গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমাকে লইয়াই আমার সমস্ত কার্য্য, এক ভাইত তোমার ফকীর হইয়া গেল, তুমি ঘরে বসিয়া থাকিলে আমার সর্ব্বনাশ হয়, অতএব চল আমার সঙ্গে তোমাকে যাইতে হইবে। সনাতন বলিলেন, অন্য লোক দ্বারা তুমি কার্য্য সমাধা কর, আমার দ্বারা আর চলিবে না। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া সনাতনকে কারাবদ্ধ করিয়া উড়িষ্যায় চলিয়া গেলেন।

প্রয়াগতীর্থে কোন দেবালয়ে গৌরসুন্দর ভাবরসে মত্ত হইয়া দক্ষিণ-
দোথয়া কোন ব্রাহ্মণের গৃহে নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, বহু সংখ্যক লোক
তিনি হইয়া তাঁহার রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় রূপ এবং
তুমি তৃণগুচ্ছ দন্তে করিয়া দূর হইতে তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।
কারিলে তাঁহাদিগকে আদরপূর্ব্বক নিকটে বসাইয়া সনাতনের কথা জিজ্ঞাসা
পদিন। সনাতন বন্দীর অবস্থায় আছেন শুনিয়া প্রভু বলিলেন, আমার

সঙ্গে তাঁহার অচিরে সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। তদনন্তর ধর্ম্মপ্রসঙ্গে উভয়ের চিত্ত প্রেমরসে পরিপ্লাবিত হইল। নিকটে আয়ুলী নামক গ্রামে বল্লভ ভট্ট নামক জনৈক জ্ঞানী ভক্ত ছিলেন, তিনি এই সময় চৈতন্য এবং রূপকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া নিজালয়ে লইয়া যান। তথায় অনেকে আগ্রহ সহকারে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিল দেখিয়া বল্লভ ভট্ট শীঘ্র তাঁহাকে বিদায় করিলেন। যমুনার তীরে তাঁহার আশ্রম, কোন্ সময় গৌরচন্দ্র জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িবেন এই তাঁহার ভয় হইয়াছিল। রামানন্দের নিকট প্রভু যে সমস্ত ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ করেন, প্রয়াগে বসিয়া সেই সমুদায় তিনি রূপকে শিক্ষা দেন, এবং তাঁহাতে ভক্তি সঞ্চার করেন।

গৌর রূপকে বলিলেন ভক্তিরসসিন্ধু অসীম এবং গভীর। কেশাগ্রের শত ভাগের এক ভাগকে পুনঃ শত ভাগ করিলে যাহা হয়, জীবের স্বরূপ তত সূক্ষ্ম। এই জল স্থল স্থাবর জঙ্গমময় ভূমণ্ডলে মনুষ্যের সংখ্যা অতি অল্প; তন্মধ্যে ম্লেচ্ছ চণ্ডাল বৌদ্ধ অনেক। বেদনিষ্ঠদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক লোক কেবল মৌখিক। ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে অধিকাংশ কর্ম্মনিষ্ঠ। কোটি কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে এক জন জ্ঞানী। কোটি জ্ঞানীর মধ্যে এক জন মুক্ত। কোটি মুক্ত পুরুষের মধ্যে এক জন হরিভক্ত সুদুর্ল্লভ। ভক্তিতেই শান্তি; মুক্ত, সিদ্ধ, ফলকামী ইহারা অশান্ত। ভাগবতে এই জন্য লিখিত হইয়াছে:—"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।" ভক্তি বীজকে শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ জলসেচন দ্বারা অঙ্কুরিত করিলে তাহা হইতে যে এক লতা উৎপন্ন হয় সেই লতা বৃন্দাবনধামে হরিচরণকল্পবৃক্ষ আরোহণ করত প্রেমফল প্রসব করে। বৈষ্ণবাপরাধরূপ হস্তী যদি মস্তক উত্তোলন করে, তবে তাহা ছিন্ন হইয়া যাইবে। লোভ, পূজা, স্বর্গকামনা, মুক্তিবাঞ্ছা প্রভৃতি উপশাখাগণকে ছেদন না করিলে মূলশাখা বৃদ্ধি হয় না। মালী হইয়া এই লতা অবলম্বনপূর্ব্বক জীব প্রেমফল আস্বাদন করে। ইক্ষুরস ঘনীভূত হইলে যেমন তাহা হইতে ক্রমে মৎসণ্ডি (মিছরি) উৎপন্ন হয়, তেমনি সাধনভক্তি হইতে রতি, রতি গাঢ় হইলে প্রেম, প্রেম হইতে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক মাধুর্য্যরসে সকল রস সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই উপদেশ দিয়া মহাপ্রভু রূপকে বৃন্দাবন যাইতে অনুমতি করিলেন এবং আপনি কাশীধামে চলিয়া আসিলেন।

চৈতন্য যে সময় কাশীতে চন্দ্রশেখরের ভবনে থাকেন, সেই কালে রূপের পত্র সনাতনের হস্তগত হয়। তিনি বন্দীব অবস্থায় তাহা পাইয়া কারারক্ষককে অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন, "দেখ মিঞা সাহেব! আমি তোমার অনেক উপকার করিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, ইহাতে তোমার পুণ্যও হইবে, আর পাঁচ সহস্র টাকাও তুমি পাইবে। রাজা যদি তোমাকে ধরেন তুমি বলিও সে বহির্দেশে গিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া কোথায় চলিয়া গেল, আর দেখিতে পাইলাম না। আমি দরবেশ হইয়া চলিয়া যাইব, দেশে আসিব না, সুতরাং তোমার আর ভয়ের বিষয় কিছু থাকিল না।" এইরূপে তাহাকে সম্মত করিয়া সাত সহস্র মুদ্রা দিয়া ভৃত্য ঈশানের সঙ্গে রজনীযোগে তিনি প্রস্থান করিলেন। ঈশানের সঙ্গে কয়েকটী স্বর্ণমুদ্রা ছিল, পথিমধ্যে পাতড় পর্ব্বতে পৌঁছিলে এক দস্যু তাহা লইবার চেষ্টায় থাকে। সনাতন ভাব গতি বুঝিয়া মুদ্রাগুলি তাহাকে দিয়া ঈশানকে বিদায় করিয়া একাকী উদাসীনবেশে বৃন্দাবনাভিমুখে চলিলেন। এক দিন রাত্রিকালে পাটনার নিকট হাজিপুরের এক উদ্যানমধ্যে বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি নাম কীর্ত্তন করিতেছেন, ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত হঠাৎ তাহা শুনিতে পাইলেন। শ্রীকান্ত এক জন রাজকর্ম্মচারী, গোড়েশ্বরের জন্য তিন লক্ষ টাকার অশ্ব ক্রয় করিবার নিমিত্ত তিনি ঐ স্থানে বাসা করিয়াছিলেন; সনাতনকে তাদৃশ হীনবেশে দর্শন করিয়া তাঁহার মন অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। পরে মলিন বস্ত্র পরিত্যাগের জন্য বৈরাগীকে তিনি অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; সনাতন কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় শেষ তিনি এক ভোটকম্বল তাঁহাকে দিলেন। সেই কম্বল গায়ে দিয়া সনাতন বৈরাগী ক্রমে কাশীধামে গিয়া উপনীত হন। তৎকালে গৌরচন্দ্র তথায় উপস্থিত ছিলেন। সনাতন বহির্দ্বারে বসিয়া দুই হস্তে দুই গুচ্ছ তৃণ এবং দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতেছেন, আর নয়নজলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। ভক্তপ্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গ এই সংবাদ পাইয়া সমীপাগত হইলেন এবং প্রগাঢ় আলিঙ্গনদানে সুস্থ করত সনাতনের অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা, বিলাপ, অনুশোচনা দেখিয়া চৈতন্যের প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। শিষ্যবৎসল প্রেমার্দ্র চিত্ত মহাপুরুষেরা আশ্রিত দুঃখীদিগের প্রতি যে প্রকার স্নেহ মমতা প্রদর্শন করেন তাহা মাতৃস্নেহ অপেক্ষাও সুমিষ্ট। মহাপ্রভুর অকৃত্রিম ভালবাসা পাইয়া সে সময় অনেক সন্তপ্ত হৃদয় ব্যক্তি

শোকতাপ ভবযন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়াছিল। তদনন্তর সনাতনের কারামুক্তি ও পথ-ভ্রমণের বিবরণ সমস্ত তিনি শুনিলেন। গৌরচন্দ্র আপনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া এইরূপে অনেকানেক সম্ভ্রান্ত ধনী পণ্ডিত এবং ভদ্রসন্তানকে পথের ভিখারী, করঙ্গ কন্থাধারী তরুতলবাসী করেন। কিন্তু এই সকল পবিত্র চিত্ত ভাগবতগণ অবশেষে বিপুলবিভবশালী ধনী ও নরপতিগণের উপরেও কর্ত্তৃত্ব করিয়া সকলের পূজিত হইয়া গিয়াছেন। শচীতনয় সনাতনকে কহিলেন, পতিতপাবন কৃষ্ণ বড় দয়াময়, তিনি অপার করুণার সিন্ধু, তাঁহার অনুগ্রহে-তেই তুমি পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে। সনাতন গদ্গদ স্বরে বলিলেন, আমি কৃষ্ণকে জানি না, তোমার কৃপাই আমার উদ্ধারের হেতু হইয়াছিল। রূপ এবং অনুপম বৃন্দাবন গিয়াছেন সে সংবাদ সনাতন এই খানে প্রাপ্ত হন। অতঃপর গৌরের আদেশানুসারে চন্দ্রশেখর তাঁহাকে ক্ষৌরী এবং স্নান করাইয়া নূতন বসন পরিধান করিতে অনুরোধ করিলেন। সনাতন তাহা না শুনিয়া এক পুরাতন ছিন্ন বসন চাহিয়া লইলেন। ভোটকম্বল খানি তখনও তাঁহার গায়ে ছিল। প্রভু বার বার সে দিকে দৃষ্টিপাত করাতে সনা-তন তাঁহার ভাব বুঝিতে পারিয়া এক জন বঙ্গবাসীর কাঁথার সঙ্গে তাহার বিনিময় করিলেন। এই সমস্ত ঐকান্তিক অকপট বৈরাগ্য চিহ্ন সন্দর্শনে চৈতন্য অত্যন্ত প্রীত হন। তিনি বলিলেন, উত্তম বৈদ্য কি কখন রোগের শেষ রাখে? তিন মুদ্রার ভোট গায়ে দিয়া মাধুকরী ভিক্ষা করিলে ধর্ম্ম-হানি হয়, লোকে উপহাস করে। যাঁহার ইচ্ছায় তোমার বিষয়ভোগ খণ্ডন হইয়াছে তিনিই ইহা দূর করিলেন। অনন্তর উভয়ে বিবিধ তত্ত্বা-লাপ হইতে লাগিল।

কৃষ্ণই এক মাত্র সর্ব্বোপরি আদি কারণ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিস্বামী, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তাঁহার এক একটী শক্তি। যোগধর্ম্ম, কর্ম্মকাণ্ড পরি-হারপূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্তি করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই কৃষ্ণের শত সহস্র অবতার;—কেহ অংশাবতার, কেহ ভাবাবতার, কেহ শক্ত্যবতার, বৃন্দা-বনের কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার। জ্ঞানের সঙ্গে যাহার ভক্তি হয় সেই সর্ব্বো-ত্তম; শাস্ত্র যুক্তি অবগত নহে, অথচ ভক্তি আছে তাহাকে মধ্যম বলা যায়; যাহার শ্রদ্ধা অতি কোমল সে কনিষ্ঠ; কিন্তু শেষোক্ত দুই জন ক্রমে উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ভক্তির তারতম্যানুসারে রতির তারতম্য হয়। কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্য, সার, সম, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকি-

ঞ্চন, সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ, মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মান, অমানী ইত্যাদি বিবিধ গুণ ভক্তেতে অবস্থিতি করে। সনাতনকে প্রভু ভক্তি ও প্রেমতত্ত্বের সাধন এবং লক্ষণ আদ্যোপান্ত সমস্ত এইরূপে শিক্ষা দিয়া বলিলেন, তুমি বিবিধ গ্রন্থ রচনা দ্বারা জগতে ভক্তিতত্ত্ব প্রচার কর এবং বিলুপ্ত প্রায় মথুরা তীর্থকে পুনরুদ্ধার করিয়া লও। শুষ্ক বৈরাগ্যবিষয়ে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। সনাতন বলিলেন, আমি নীচ জাতি, চিরদিন বিষয়ভোগে কাল ক্ষয় করিয়াছি, আশীর্ব্বাদ করুন যে, যাহা শিক্ষা করিলাম তাহা যেন ভুলিয়া না যাই, এবং ঐ সকল যেন আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পায়। তদনন্তর আবও নিবেদন কবিলেন, সার্ব্বভৌমের নিকট আপনি যে "আত্মারামশ্চ মুনয়ো" শ্লোকের আঠার প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আমি শুনিতে অভিলাষ করি। গৌর বলিলেন, তখন কি প্রলাপ বলিয়াছি, আমি বাতুল মানুষ, সার্ব্বভৌম আবার তাহা সত্য মনে করিয়াছেন, সে কথা কি এখন আর মনে আছে? তবে তোমার ন্যায় ব্যক্তির সঙ্গগুণে যাহা কিছু প্রকাশ পায়, নতুবা সহজে আমার অর্থ বোধগম্য হয় না। এই বলিয়া শেষে এমনি তাঁহার উৎসাহ বাড়িয়া গেল যে উক্ত শ্লোকের একষট্টি প্রকার অর্থ করিলেন। কিরূপে বৈষ্ণবস্মৃতি লিখিতে হইবে তাহাও সনাতনকে বলিয়া দিলেন। দুই মাস কাল তিনি ক্রমাগত তাঁহাকে ভক্তি শিক্ষা দেন। পরে কাশির দণ্ডীদিগকে বিচারে এবং ভক্তিপ্রভাবে পরাস্ত করিয়া নীলাদ্রি প্রস্থান করেন। গমনকালে সনাতনকে বলিয়া গেলেন, তুমি বৃন্দাবনে যাও, সেখানে তোমার ভ্রাতৃদ্বয় আছেন তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া দেখা কর। কন্থা করোয়াধারী আমার কাঙ্গাল ভক্তগণ তথায় গেলে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিও। কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া তোমাকে শুভবুদ্ধি প্রদান করিবেন।

সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন রূপ অন্য পথ দিয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ কাশীযাত্রা করিয়াছেন। সুবুদ্ধি রায় নামক এক ব্যক্তি এখানে থাকিতেন তিনি সনাতনকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে, এই সুবুদ্ধি রায় এক সময় গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন, সৈয়দ্ হুসেন খাঁ ইহাঁর কর্ম্মচারী ছিল। এক দীঘিখননকার্য্যে ব্রতী হইয়া কিছু দোষ করাতে হুসেন সুবুদ্ধি কর্ত্তৃক কশাঘাত প্রাপ্ত হয়। পরে সৈয়দ্ হুসেন স্বয়ং রাজা হইল এবং রাজা হইয়াও কিছু দিন পর্য্যন্ত পুরাতন প্রভুর প্রতি সমুচিত

শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার স্ত্রী পূর্ব্বের কথা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। সেই কশাঘাতের চিহ্ন দেখাইয়া এক দিন সে বলিল, তুমি সুবুদ্ধির প্রাণদণ্ড কর। হুসেন কিছুতেই সম্মত না হওয়াতে সে নারী বলিল, তবে উহার জাতি মারিয়া দাও, অন্যথা আমি প্রাণ ত্যাগ করিব। শেষ স্ত্রীর অনুরোধে হুসেন সুবুদ্ধির মুখে জল ছিটাইয়া দিলেন। সুতরাং জাতিভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক সুবুদ্ধিকে বারানসী আসিতে হইল। তথায় পণ্ডিতদিগের নিকট প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা বলিলেন, তোমাকে তপ্ত ঘৃত খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে, অতি গুরুতর পাপ তোমার ঘটিয়াছে। সুবুদ্ধি স্বীয় নামের গুণে তাহা না করিয়া চৈতন্যের নিকট ব্যবস্থা চাহিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন কর; এক নামে পাপক্ষয় হইবে, দ্বিতীয় নামে কৃষ্ণপদ লাভ করিবে, তৃতীয় নামে তাঁহার সহবাসে স্থান পাইবে, ইহাই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তাবধি। অনন্তর সুবুদ্ধি অযোধ্যা নৈমিষারণ্য পর্য্যটন করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া প্রতি দিন ছয় পয়সার কাষ্ঠ বিক্রয় করত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ শুষ্ক চণক্ চর্ব্বণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেন, বাকি মুদির দোকানে গচ্ছিত রাখিয়া তদ্দ্বারা দুঃখী বৈষ্ণবগণের সেবা করিতেন, এবং বাঙ্গালী পাইলে তাহাদিগকে দধি ভাত খাওয়াইয়া তৈল মাখাইতেন। কিছু দিবস পরে ইহাঁর সঙ্গে শ্রীরূপের মিলন হয়। তার পর তিনি সনাতনকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। সনাতন পরম বৈরাগী, সুবুদ্ধির স্নেহ মমতা ছিন্ন করিয়া তিনি বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। প্রতি দিন এক এক বৃক্ষতলে এবং নব নব কুঞ্জে অবস্থান করিতেন। মথুরা মাহাত্ম্যগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া প্রথমে সেই লুপ্ত তীর্থ তিনিই প্রকাশিত করেন।

এ দিকে শ্রীরূপ অনুপম দুই ভাই বারাণসীতে সনাতনকে না পাইয়া দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বৃন্দাবনলীলা নাটক লিখিতে লাগিলেন। শেষাবস্থায় উভয়ে একত্র বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেন। বনে বনে ভ্রমণ, নিত্য নূতন বৃক্ষমূলে শয়ন, ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, আর গ্রন্থপ্রণয়ন এই মাত্র ইহাঁদের কার্য্য ছিল। শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মন্ত্রাশিষ্য জীবগোস্বামী এই সঙ্গে থাকিয়া ষট্‌সন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভাদি বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাঁরা ভক্তির সূক্ষ্মতম তত্ত্ব সকল যথারীতি শ্রেণী বিভাগ করিয়া তদ্বিষয়ে বিজ্ঞান শাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় তিন জনেরই বিশেষ

ব্যুৎপত্তি ছিল। রূপ সনাতন জীব গোস্বামীকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেদব্যাস স্বরূপ বলা যাইতে পারে। গৌরপ্রচারিত ভক্তিবিধানের উচ্চগৃহের যে কয়েকটি প্রধান স্তম্ভ ছিল তন্মধ্যে ইহাঁরা তিন জনেও প্রধানত্ব লাভ করিয়াছিলেন। চৈতন্যের শিষ্যগণের মধ্যে ইহাঁরা ভক্তিতত্ত্বের বিদ্যাতে বিশেষ ক্ষমতাশালী। সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী রঘুনাথ ভট্ট পরে এই সঙ্গে মিলিত হন। এইরূপ শুনা গিয়াছে যে, বৃন্দাবন অবস্থান কালে সনাতন একটি মূল্যবান রত্ন প্রাপ্ত হন এবং মানকরবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তাহা দান করেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার জ্বলন্ত বৈরাগ্যভাব দর্শনে শেষে আপনিও বৈরাগী হইয়া যায়। একদা কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপ সনাতনকে বিচারার্থ আহ্বান করিলেন, তাঁহারা তাহাতে অসম্মত হইয়া পণ্ডিতকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। তৎপরে দিগ্বিজয়ী সেই পত্রে জীবকে স্বাক্ষর করিতে বলায় তিনি গুরুর অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, আমি বিচার করিব। বিচারে দিগ্বিজয়ী পরাভূত হইলেন। এ কথা রূপ শুনিয়া জীবকে বহু ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি জয় পরাজয় মান অপমান ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছ, জয়াভিলাষী সেই পণ্ডিতের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া, আপনি অমানী হইয়া কেন তাহাকে দীনতার সহিত মান দান করিলে না? জীব নিরভিমানী, কেবল গুরুনিন্দা সহিতে না পারিয়া পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার করিয়াছেন, ইহা জানিয়াও রূপ তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য বলিলেন, অদ্য হইতে আমি তোমার মুখাবলোকন করিব না। তাহা শুনিয়া জীবের অঙ্গ কম্পিত হইল, অনেক স্তুতি মিনতি করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না, শেষ যমুনাতটে এক গোফার মধ্যে তিনি বহু কষ্টসাধ্য তপস্যায় নিযুক্ত রহিলেন। গুরুবিরহশোকে এবং কৃচ্ছ্র সাধনে তাঁহার শরীর ক্রমে শীর্ণ হইয়া গেল। সনাতন জীবের এ প্রকার কষ্ট আর দেখিতে না পারিয়া এক দিন রূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সদাচারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? রূপ বলিলেন, জীবে দয়া। সনাতন বলিলেন, তবে তাহা হয় না কেন? তখন রূপ তাঁহার কথার তাৎপর্য্য বুঝিয়া জীবকে স্নেহ সহকারে পুনর্গ্রহণ করেন। সে সময় আক্‌বর পাতসা আগরায় থাকিতেন। তিনি রূপ সনাতনের বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে আসেন। সাধুদিগের কিছু উপকার করিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল; কিন্তু যখন সেই তেজস্বী নিঃসঙ্গ প্রেমিক বৈরাগীদিগের অসাধারণ মহত্ব তিনি

বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহার সকল অভিমান দূর হইয়া গেল। বিদ্যা, পদ ও ধনেতে গৌরবান্বিত হইয়া কিরূপে নিরভিমানী, নির্লোভী, প্রেমিক এবং বৈরাগী হইতে হয় রূপ সনাতন তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। এই সকল দেব-তুল্য মহাত্মাগণই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার মাধুর্য্য রস আস্বাদন ও বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, কি পবিত্রতম মধুর ভাবেই তাঁহারা এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ইহার গভীরার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুখী হইতেন।

বৃন্দাবন হইতে কোন যাত্রী আসিলে গৌর অগ্রে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, আমার রূপ সনাতন কেমন আছেন? কিরূপে তাঁহাদের দিন গত হয়? তাহারা বলিত, নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহারা দুই জন তরুতলে শয়ন করেন, ভিক্ষালব্ধ শুষ্ক রুটী ও চণক ভক্ষণ করেন, ছিন্ন বহির্ব্বাস, কন্থা এবং করোয়া মাত্র তাঁহাদের সঙ্গে থাকে, অষ্ট প্রহরের মধ্যে চারি দণ্ড কাল নিদ্রা যান, অবশিষ্ট সময় নাম সঙ্কীর্ত্তন, ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন, আর তোমার বিষযে চিন্তা এবং আলাপ ইহাই তাঁহাদের কার্য্য। এ সকল কথা শুনিয়া চৈতন্যের হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য করিত। পশ্চিমাঞ্চলে রূপসনাতনই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন।

## কাশীধামে দণ্ডীদিগের সঙ্গে বিচার।

কাশীতীর্থ কালেতে যেমন পুরাতন, পাপ অধর্ম্মেতেও তেমনি পরিপূর্ণ। ধর্ম্মের নামে এত আড়ম্বরও আর কোথাও দেখা যায় না, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এত ভ্রষ্টাচার দুর্ব্যবহারও আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। সেখানে দলে দলে দণ্ডী সন্ন্যাসী পরমহংস সকল ভ্রমণ করে, মায়াবাদ মতানুসারে তাহারা পার্থিব পদার্থ সমস্তকে মিথ্যা বলে, অথচ কার্য্যে তাহার ঠিক বিপরীত আচরণ করে। ফলতঃ কাশী অতি নীরস স্থান, তথায় ভক্তির নাম গন্ধ নাই, কেবল জ্ঞানকাণ্ড আর অসার কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বরে মত্ত হইয়া লোকসকল ধর্ম্মাভিমান প্রদর্শন করিয়া থাকে। এ সকল লোকের রীতি প্রকৃতি চৈতন্য পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন, এই জন্য তিনি কোন স্থানে নিমন্ত্রণ লইতেন না, অল্প যে কয়েক জন বৈষ্ণবকে পাইয়াছিলেন তাহাদিগকে লইয়া গোপনে অবস্থিতি করিতেন, আর সনা-

জনকে ভক্তি শিক্ষা দিতেন। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণটি তাঁহার প্রতি বড় অনুরক্ত ছিল। দণ্ডী সন্ন্যাসী পণ্ডিত-মণ্ডলীর সঙ্গে একবার তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাহারা চৈতন্যের মহত্ত্ব কিছু বুঝিতে পারে এই অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে এবং কাশীর সমস্ত দণ্ডীদিগকে নিজালয়ে এক দিন নিমন্ত্রণ করিল। বিপ্রের আগ্রহ দেখিয়া নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করত গৌরাঙ্গ যথাসময়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক অতি দীনভাবে সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন। প্রকাশানন্দ স্বামীও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন; গৌরের তপ্তকাঞ্চনতুল্য তেজোময় রূপলাবণ্য অবলোকন করত সচকিত ভাবে সসম্ভ্রমে সকলের সহিত তিনি গাত্রোত্থান করিলেন এবং বলিলেন, শ্রীপাদ! অপবিত্র স্থানে কেন, এই দিকে আসিয়া আসন পরিগ্রহ করুন। চৈতন্য কহিলেন, আমি হীন সম্প্রদায়ের লোক, সকলের মধ্যে উপবেশন করা আমার ভাল দেখায় না। তাঁহার সেই উজ্জ্বল মুখকান্তি দর্শন এবং বিনীত মধুর বচন শ্রবণ করিয়া দণ্ডীগণের চিত্ত অলৌকিক ভাবরসে বিগলিত হইয়া গেল। প্রকাশানন্দ স্বামী হাত ধরিয়া তাঁহাকে সভার মধ্যস্থলে বসাইলেন এবং সম্মানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন; "তুমি কেশব ভারতীর শিষ্য হইয়া কেন আমাদের সঙ্গে দেখা কর না? সন্ন্যাসী হইয়া ভাবুকদিগের সঙ্গে নৃত্য কীর্ত্তন কর, কিন্তু বেদান্ত পাঠ এবং ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, তাহা ছাড়িয়া ভাবুকের মত তুমি কেন থাক? সাক্ষাৎ নারায়ণের ন্যায় তোমার প্রভা দেখিতেছি, এরূপ হীনাচার উচিত হয় না।"

চৈতন্য বলিলেন, "শ্রীপাদ! আমার গুরু আমাকে মূর্খ জানিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন যে, তোমার বেদান্তে অধিকার নাই, তুমি কেবল কৃষ্ণনাম জপ কর, কলিতে নামই সার ধন। অতঃপর তিনি আমাকে বৃহন্নারদীয় পুরাণের এই শ্লোক শিক্ষা দেন;—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" এই নামে আমার মন পাগল হইয়া গেল, বুদ্ধিভ্রংশ হইল। তদনন্তর আমি গুরুকে এই কথা জানাইলাম যে হরিনামে আমাকে হাসায় কাঁদায় নাচায় এ কি হইল?" গুরুদেব বলিলেন, "হরিনামের এইরূপই স্বভাব, তোমাতে প্রেমোদয় হইয়াছে, ইহা সৌভাগ্যের বিষয়, আমিও কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে তুমি ভক্তসঙ্গে এই নাম কীর্ত্তন করিয়া জীব উদ্ধার কর।" এই বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক তিনি শিক্ষা দিলেনঃ—"এবং ব্রত স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগোদ্রুত

চিত্ত উচ্চৈঃ হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।”
“মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।”
(ভাগবত একাদশ স্কন্ধ)।

গৌরসুন্দরের শ্রীমুখবিনিঃসৃত অমৃতায়মান বচনাবলী শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার সুকোমল ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া সন্ন্যাসিগণ বলিয়া উঠিল, যাহা কিছু তুমি ব্যক্ত করিলে সকলই সত্য, তোমার বচনে আমাদের প্রাণ শীতল হইল, অদ্য আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম, কৃষ্ণভক্তি সকলেরই আদরের ধন, কিন্তু বেদান্ত শ্রবণে দোষ কি? চৈতন্য বলিলেন, “তোমরা দুঃখিত হইও না। বেদ সূত্রের মুখ্যার্থ ভাষ্যকারদিগের গৌণার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থ চিদৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, তাঁহার বিভূতি সমস্তই চিদাকার। তাঁহার দেহ, স্থান, পরিবার সকলই চিন্ময়; এই চিদ্বিভূতি আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে নিরাকার বলা অথবা তাঁহার রূপকে প্রাকৃত কলেবর রূপে ব্যাখ্যা করা, ইহার তুল্য বিষ্ণুনিন্দা আর কি হইতে পারে?” বেদের সূত্রার্থ সম্প্রদায়ের অনুরোধে কল্পিত অর্থ দ্বারা আবৃত করা হইয়াছে ইহা সত্য, এক্ষণে মুখ্যার্থ কি তাহা শুনিতে অভিলাষ করি” সন্ন্যাসিগণ এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করাতে চৈতন্য পুনরায় বলিলেন, “ব্রহ্ম অর্থে বৃহদ্বস্তু, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, তাঁহাকে সত্তামাত্র নির্ব্বিশেষ বলিলে চিচ্ছক্তি স্বীকার করা হয় না। সেই বেদপ্রতিপাদিত কৃষ্ণকে ভক্তি ও নাম সাধনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার চরণে ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মিলে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফলের অতীত পঞ্চম পুরুষার্থ যে প্রেম মহাধন তাহার মাধুর্য্য রস আস্বাদন করা যাইতে পারে।” তখন পণ্ডিতমণ্ডলী চৈতন্য প্রভুর এই সমুদায় সুধাময় বচন শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “আপনি সাক্ষাৎ বেদময়মূর্ত্তি, আমরা যে আপনাকে নিন্দা করিয়াছি আমাদের সে সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করুন।” অনন্তর তাঁহাকে আদরপূর্ব্বক বসাইয়া সকলে ভিক্ষা দিলেন, অর্থাৎ ভোজন করাইলেন।

কাশীর দণ্ডী ও শাস্ত্রীদিগের মধ্যে কয়েক দিন এই বিষয়ে মহা আন্দোলন চলিয়াছিল। চৈতন্যের ব্যাখ্যা সার এবং তাহাই হৃদয়গ্রাহী, অনেকে এই কথা বলিতে লাগিল, কেহ কেহ ভক্তিরসের আস্বাদন পাইল। অন্য এক দিন গৌরচন্দ্র প্রেমাবেশে মত্ত হইয়া সনাতন, চন্দ্রশেখর প্রভৃতির সঙ্গে নৃত্য ও

সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া কাশীবাসী লোকদিগের চিত্ত এক-বারে দ্রবীভূত হইয়া যায়। প্রকাশানন্দ বলিলেন, ভাষ্যকার অদ্বৈত মত সংস্থাপনের জন্য অন্যরূপে অর্থ করিয়াছেন এই জন্য তিনি ভগবত্তা স্বীকার করেন নাই। নানা জনের নানা মত;—মীমাংসক বলেন ঈশ্বর কর্ম্মের অঙ্গ, সাঙ্খ্যের মতে প্রকৃতি কারণ, নৈয়ায়িক বলেন পরমাণু হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, মায়াবাদীর ব্রহ্ম নির্গুণ, পাতঞ্জল মতে ঈশ্বরই স্বয়ং গুরু; পরম কারণ ঈশ্বরকে না মানিয়া সকলে অন্যের মত খণ্ডন করত আপনাদের মত স্থাপন করে, অতএব 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।' প্রেম-রসে মগ্ন গৌরকে দেখিয়া শেষে প্রকাশানন্দ স্বামীও শিষ্যগণের সহিত হরি হরি বলিতে লাগিলেন। শচীনন্দন তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন, তিনিও গৌরের চরণ ধরিলেন, এবং ক্ষমা চাহিলেন। এইরূপে মরুভূমি তুল্য কাশী-ধাম ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইল। স্বামীজী বিষ্ণুর সঙ্গে সমান করিয়া চৈত-ন্যকে প্রশংসা করাতে তিনি কুণ্ঠিত হইয়া বিষ্ণু স্মরণপূর্ব্বক বলিলেন, "আমি হীন জীব, আপনাকে যে জীব বিষ্ণু করিয়া মানে সে পাষণ্ড সদৃশ।" প্রকা-শানন্দ বলিলেন, মায়াবাদের দোষ ও ব্যাসসূত্রের কল্পিত ব্যাখ্যার কথা তুমি যাহা ঘোষণা করিলে তাহাতে সকলের মন মুগ্ধ হইল, এক্ষণে সূত্রের যথার্থ অর্থ আমাকে বুঝাইয়া দাও। স্বামী অনুরোধ করাতে গৌরচন্দ্র বলি-লেন, "ব্যাস নিজে বুঝাইলেও তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। বেদোপনিষ-দের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, ইহা দ্বারা সূত্রের অর্থ বুঝিতে হইবে। সূর্য্যকে যেমন সূর্য্যালোক ভিন্ন অন্যালোক দ্বারা দেখা যায় না, তেমনি ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত তাঁহাকে জানা যায় না। কৃষ্ণই বেদসূত্র এবং তিনিই ভাষ্য ভাগবত, সূত্র ভাষ্য উভয়ই স্বয়ং ভগবান্।" দেবাদিদেব ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব তাঁহার প্রদত্ত দিব্যজ্ঞানালোক ব্যতীত কোন গুরু বা গ্রন্থ দ্বারা তাহা কেহ বুঝিতে সক্ষম হয় না, ঈশ্বরের শাস্ত্র ঈশ্বর স্বয়ং বুঝাইয়া না দিলে কোন সত্য কেহ কাহাকে বুঝাইতে পারে না, এই জন্যই দৈববাণী এবং মহাজন-বাক্য ধর্ম্ম ও উচ্চনীতির শেষ মীমাংসার স্থল হইয়া আছে। বৌদ্ধ জ্ঞানিগণ দৈববাণী শ্রবণেও বধির, অহঙ্কার বশতঃ ভক্তের কথাও তাহারা গ্রাহ্য করে না; সুতরাং তাহাদিগকে দুই কূল হারাইয়া তর্কপরায়ণ অধিকাংশের মত-সমষ্টির স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে পরিণামে নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। শাস্ত্রব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রভু যে বলিয়াছেন, "সূর্য্যালোক ভিন্ন অন্যালোকে সূর্য্য

নয়নগোচর হয় না” ইহা অতি সারবান্ কথা। ভগবদ্দর্শনের পন্থাও এই-রূপ। তাঁহার কথা হয় তিনি স্বয়ং বলিলেন, না হয় বিশ্বাসী পবিত্রাত্মা ভক্ত দ্বারা তিনি বলাইবেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে যাহারা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করে তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত এবং ধর্ম্মাভিমানী। অনন্তর ভাগবত গ্রন্থের বহুল জ্ঞানগর্ভ এবং ভক্তিরসাত্মক বচন প্রমাণ দ্বারা হরিভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি সকলের হৃদয় অধিকার করিলেন। শেষে এমনি হইল যে তাঁহাকে দেখিলেই যেখানে সেখানে লোকে হরিধ্বনি করিত। বিশ্বেশ্বর দর্শনে কিংবা গঙ্গাস্নানে যেখানে তিনি গমন করেন, সর্ব্বত্রই লোকের ভয়ানক জনতা হইতে লাগিল। এইরূপে মায়াবাদাচ্ছন্ন কাশী-ধামে হরিভক্তির জয়ধ্বজা উড্ডীন করিয়া চৈতন্য গোসাঞী পুনরায় নীলাদ্রি প্রস্থান করেন। রজনীযোগে বহির্গত হইয়া চলিলেন, তপন মিশ্র প্রভৃতি তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। প্রভু বলিলেন, আমি ঝারিখণ্ড পথে একাকী যাইব, যদি কাহারো ইচ্ছা হয় পরে আসিতে পার। তদনন্তর বিদায় হইয়া সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া তিনি সেই অরণ্যময় বিজন পথে নীলা-চলে প্রত্যাগত হইলেন।

## নীলাচলে প্রভুর শেষাবস্থান।

তীর্থপর্য্যটনোপলক্ষে ভারতের নানা স্থানের প্রাকৃতিক শোভা দর্শনান্তর হরিনাম বিতরণ ও প্রেমভক্তি প্রচার করিয়া ভক্তবর শ্রীচৈতন্য পুনরায় নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া তাহার পর ছয় বৎসর কাল তাঁহার তীর্থ পর্য্যটনে অতিবাহিত হয়, পরিশেষে আঠার বৎসর কাল একাদিক্রমে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করেন। সর্ব্বশুদ্ধ আটচল্লিশ বৎসর তিনি ইহলোকে জীবিত ছিলেন। এই আঠার বৎসরের মধ্যে যে সকল মনোহর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তদ্বিবরণ বর্ণনে এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

পুরীক্ষেত্রে গৌরের পুনরাগমন প্রত্যাশায় ভক্তবৃন্দ নিরন্তর আশাপথ চাহিয়া আছেন, এমন সময় তিনি বৃন্দাবন বারাণসী প্রয়াগ ভ্রমণ করিয়া

তত্রত্য সাধুমণ্ডলীমধ্যে উপস্থিত হইলেন। ভক্তসমাজে আনন্দকোলাহল উঠিল, পুনরায় প্রেমভক্তির হিল্লোলে সকলের হৃদয়সিন্ধু উদ্বেলিত হইল। কাশীশ্বর মিশ্রের ভবনে তাঁহার চিরবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, অবশিষ্ট জীবন সেই খানেই তিনি কাটাইয়া গিয়াছেন। তীর্থের বৃত্তান্ত গৌরচন্দ্র নিজমুখে বর্ণন করিয়া সকলের চিত্ত বিনোদন করিলেন। প্রভু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন এ সংবাদ গৌড়দেশেও প্রেরিত হইল। তথাকার ভক্তবৃন্দ ইহা শ্রবণে উৎসাহী হইয়া পথের সজ্জা করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে প্রতি বৎসর দলে দলে এ দেশের বৈষ্ণবগণ শ্রীক্ষেত্রে যাতায়াত করিতেন। বঙ্গদেশ হইতে শ্রীক্ষেত্র প্রায় দশ বার দিবসের পথ, এই সুদীর্ঘ দুর্গম পথে প্রতি বৎসর ইহাঁরা গতায়াত করিতেন। ইহা দ্বারা সকলে বুঝিতে পারিবেন, কেমন তাঁহাদের অটল উৎসাহ ছিল। এমন শুভ দিন শুভ সংযোগ পৃথিবীতে কদাচিৎ হয়। দেবাত্মা মহাপুরুষের সহিত সাধু ভক্তের সম্মিলন যে কি গুরুতর ব্যাপার তৎকালকার ভগবদ্ভক্তজনেরা তাহা বুঝিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহাদের মনে আমোদ উৎসাহ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইত। গৌরের প্রধান প্রধান শিষ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া বর্ষে বর্ষে তথায় যাইতেন, কেবল প্রচারকার্য্যে বিব্রত থাকায় নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত সকল বৎসর যাইতে পারিতেন না। কাঁচড়াপাড়াবাসী শিবানন্দ সেন গৌরভক্তগণের পথদর্শক ছিলেন, সকলকে যত্নপূর্ব্বক বর্ষে বর্ষে তথায় লইয়া যাওয়া তাঁহার একটি আনন্দজনক কার্য্য ছিল। রথোৎসবের সময় গিয়া চারি মাস কাল তাঁহারা পুরীতে গুরুসহবাসে থাকিতেন, বহুবিধ লীলা করিতেন, এই হেতু বন্ধুবিচ্ছেদের জন্য কাহাকেও আর অসুখ অনুভব করিতে হইত না। এই চারি মাস কাল ক্রমাগত আমোদ আহ্লাদে আনন্দ উৎসবে কাটিয়া যাইত। কতকগুলি উন্নত চরিত্র সাধু এবং সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী গৌরের সঙ্গে এই খানে প্রায় বার মাস থাকিতেন। ব্রহ্মচারী দণ্ডী হইয়াও মায়াবাদ জ্ঞানগর্ব্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক শেষে তাঁহারা ভক্তিরস পানে প্রমত্ত হন।

### রূপের শ্রীক্ষেত্র দর্শন।

রূপ গোস্বামী কাশীধামে সনাতনের দেখা না পাইয়া বিষয় সম্পত্তি যথাযোগ্য পাত্রে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য স্বদেশে গিয়া কিছু দিন ছিলেন, তদনন্তর কনিষ্ঠ অনুপমের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া

সমাপনান্তর তিনিও নীলাদ্রি গমন করেন। হরিদাস যথায় থাকিতেন রূপ তথায় অবস্থিতি করেন। ইদানীং তাঁহার মন কৃষ্ণলীলা নাটক রচনার জন্য সর্ব্বদা মগ্ন থাকিত। এখানে তিনি পৌছিলে গৌর আহ্লাদের সহিত আর আর সকলের সঙ্গে রূপগোস্বামীর পরিচয় করিয়া দিলেন। কিছু দিন পরে রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণ তথায় উপস্থিত হন। রূপ তাঁহাদের সঙ্গে একত্র চারি মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। এক দিন মহাপ্রভু হরিদাসের কুটীরপ্রাঙ্গণে বসিয়া তাঁহার রচিত নূতন নাটক শ্রবণ করেন। অতি দীন হীন মলিন বেশ, বিনয়ে সর্ব্বদা অবনত, লজ্জায় আর তিনি পড়িতে পারেন না; তথাপি গুরুর আদেশে নিজের রচনা সকল কিছু কিছু ভক্তদিগকে শুনাইলেন। বিদগ্ধমাধব গ্রন্থের এই শ্লোকটি প্রথমে পাঠ করা হইল। "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে, কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্য স্পৃহাং। চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং নোজানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।" "কৃষ্ণ" এই বর্ণ-দ্বয় কত পরিমাণ অমৃতে যে রচিত হইয়াছে তাহা জানি না। ইহা যখন রসনায় নৃত্য করে তখন আরো বহু রসনা লাভের জন্য রতি উৎপাদন করে, এবং যখন কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয় তখন অর্ব্বুদ সংখ্যক কর্ণ পাইবার জন্য স্পৃহা জন্মে, আবার চিত্তপ্রাঙ্গণে মিলিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে বলাধান করে। কৃষ্ণনামের সুমধুর মাহাত্ম্য শ্রবণ এবং এই শ্লোকের কবিত্বরস আস্বাদন করিয়া রামানন্দ, সার্ব্বভৌম, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরে রামানন্দ তাঁহাকে ভক্তিরসের বিবিধ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য কবিত্ব এই চারিটি রূপেতে একত্র সন্নিবেশিত ছিল, তজ্জন্য গৌর বড় সুখ ও গৌরব অনুভব করিতেন। প্রধান ভক্তদিগের নিকট রূপের এই সকল গুণের কথা বলিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ হইত। তদনন্তর রূপ গোস্বামী অল্প দিনের মধ্যে তত্রত্য সাধুগণের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠেন। কোন্ রসের কিরূপ শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, সমস্ত তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। চৈতন্যের অনুরোধে সর্ব্ব ভক্তগণ আরো অধিকতর প্রসন্ন হইয়া রূপকে বিস্তর আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রূপ সনাতনের চমৎকার বিবরণ পূর্ব্বেই সকলে কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রত্যক্ষ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। চারি মাস পরে গৌড়ের ভক্তগণ স্বদেশে প্রস্থান করিল। রূপ গোস্বামী তাহার

পর আর কিছু দিন থাকিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান। বিদায়কালে চৈতন্য বলিয়া দিলেন, ব্রজপুরবাসী হইয়া রসশাস্ত্র প্রচার কর, সনাতনকে একবার পাঠাইয়া দিও, আমিও সেখানে আর একবার যাইব।

ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন।

ভগবান্ আচার্য্য নামক এক জন সাধু চৈতন্যের শিষ্য ছিলেন। তিনি এক দিন গুরুদেবকে নিজ আশ্রমে ভোজন করাইবার জন্য গায়ক ছোট হরিদাসকে বলেন, শিখি মাহিতির ভগ্নী মাধবীদেবীর নিকট উৎকৃষ্ট তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আন। তদনুসারে হরিদাস ভিক্ষা করিয়া আনেন। মাধবী তপস্বিনী প্রাচীনা বৈষ্ণবী, তথাপি এই কথা শুনিয়া চৈতন্য আর হরিদাসের মুখ দেখিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। ভৃত্য গোবিন্দকে আজ্ঞা করিলেন, ছোট হরিদাসকে পুনরায় আমার আশ্রমে আসিতে দিবে না। দামোদর ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি বলিলেন, বৈরাগী হইয়া সে প্রকৃতি (স্ত্রীলোক) সম্ভাষণ করে? দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়বিষয়ের নিকট গমন করিলে মুনিদিগেরও চিত্ত বিচলিত হয়। ক্ষুদ্র জীব সকল মর্কট বৈরাগ্য করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থে রত থাকে। এই সকল হৃদয়ভেদী বাক্য শ্রবণে পারিষদ্‌গণ নির্ব্বাক হইলেন। পুনরায় আর এক দিন সকলে মিলিয়া হরিদাসের জন্য অনেক অনুরোধ করত তাহার এই সামান্য অপরাধ মার্জ্জনা করিতে বলেন, কিন্তু সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যায়। চৈতন্য কহিলেন, আমারই মন আমার বশীভূত নহে, বৈরাগী হইয়া প্রকৃতিস্পর্শ এবং সম্ভাষণ কি উচিত? যাও তোমরা আপনার কার্য্যে চলিয়া যাও! পুনরায় এরূপ যদি বল, তবে আর আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না। তখন কর্ণে হস্ত দিয়া ভয়ে সকলে দূরে প্রস্থান করিলেন। পরমানন্দপুরী এ জন্য আর একবার অনুরোধ করেন, তাহাতে গৌর মহা বিরক্ত হইয়া গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, চল আমার সঙ্গে, এখানে আর আমার থাকা হইল না, আলালনাথে গিয়া আমি একাকী বাস করিব। মহা বিভ্রাট্ দেখিয়া তখন সকলে মিলিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করেন, তবে প্রভুর চিত্ত স্থির হয়। সে গৌরাঙ্গ এখন থাকিলে বর্ত্তমান নিকৃষ্ট বৈরাগীদল তাঁহাকে হয়ত প্রহার করিত। কি উচ্চ পবিত্রতা বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার তাঁহার সময়ে ছিল, আর এক্ষণে কি হইয়াছে! হরিদাসকে যে তিনি সামান্য লঘুপাপে এরূপ গুরু দণ্ড দিলেন তাহা নহে; অন্তর্দৃষ্টিতে তাহার ভিতরে অবশ্য তিনি

আরও কিছু দেখিয়া থাকিবেন। পবিত্রাত্মা ভক্তদিগের স্বভাবে লোকচরিত্র পরীক্ষা করিবার এক প্রকার কষ্টি পাথর থাকে, অপবিত্র দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তির জীবন তদ্দ্বারা সহজে পরীক্ষিত হয়। তাঁহারা পুণ্যসংস্কারগুণে পাপের দুর্গন্ধ বুঝিতে পারেন, গূঢ় কলঙ্কের দাগ তাঁহাদের বিবেকদর্পণের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ে, যোগবলে তাঁহারা পাপ পুণ্যের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন। গৌরাঙ্গ স্ত্রীলোকসম্বন্ধে পবিত্রতা রক্ষার এই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। পরে সেই হরিদাস অনুতাপে দগ্ধ হইয়া প্রয়াগের ত্রিবেণীর জলে প্রাণত্যাগ করেন। নবদ্বীপের কোন বৈরাগী তথা হইতে গিয়া শ্রীবাসকে প্রথমে এই সংবাদ দেয়, পরে তাঁহার মুখে চৈতন্য সে কথা শ্রবণ করেন। শ্রীবাস পুরীতে আসিয়া হরিদাসের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় প্রভু বলিয়াছিলেন, "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্।"

### প্রভুর প্রতি দামোদরের ভর্ৎসনা।

একটী পিতৃহীন উড়িয়া ব্রাহ্মণবালক চৈতন্যের নিকট সদা সর্ব্বদা আসিয়া প্রণাম করিত এবং কথা বার্ত্তা কহিত। সুকুমার মতি সুন্দর বালকের মৃদু ব্যবহার দেখিয়া তিনি তাহাকে বড় ভাল বাসিতে লাগিলেন। কিন্তু বিরক্ত সন্ন্যাসী স্পষ্টবাদী দামোদরের পক্ষে ইহা নিতান্ত অসহ্য হইয়া পড়িল। নিষেধ করেন তত্রাপি সে মানে না; বালক স্বভাব যেখানে প্রীতি পায় সেই খানে যায়, তাঁহার নিষেধ কার্য্যকর হইল না। শেষে দামোদর আর থাকিতে না পারিয়া এক দিন বলিয়া ফেলিলেন "এইবার তুমি কেমন গোঁসাঞী তাহা পুরুষোত্তমের সকলে জানিবে। গোস্বামীর গুণ এবার বাহির হইবে।" চৈতন্য বলিলেন, দামোদর তুমি কি বলিতেছ? তিনি বলিলেন, আর কি বলিব? তুমি আপনার ইচ্ছা মত চলিবে, কাহার কথাত শুনিবে না! অন্যের মুখ বন্ধ করিতে পার, কিন্তু পণ্ডিত হইয়া ইহা বিচার কর না যে বিধবার সন্তানের প্রতি এত দূর স্নেহ প্রদর্শন করা উচিত কি না? যদিও সে বিধবা সতী এবং তপস্বিনী, কিন্তু তথাপি তাহার সৌন্দর্য্য এবং যৌবন দোষের কারণ হইয়াছে, এবং তুমিও এক জন পরম সুন্দর যুবা পুরুষ বট। লোককাণাকাণির অবসর তুমি কেন দিতেছ?" এই বলিয়া দামোদর মৌনাবলম্বন করিলেন। গৌরসুন্দর হাসিয়া কহিলেন, তুমি নবদ্বীপে যাও, তথায় গিয়া জননীর রক্ষক হইয়া থাক। তুমি নিরপেক্ষ হইয়া আমাকেও সাবধান করিয়া দিলে, এরূপ না হইলে ধর্ম্ম থাকে না,

যাহা আমার দ্বারা হয় না, তাহা তোমা হইতে হয়, অতএব তুমি মাতৃ সন্নিধানে গমন কর। অনন্তর স্বরূপ দামোদর কিছু দিনের জন্য চৈতন্যের গৃহের অভিভাবক হইয়া নবদ্বীপে বাস করেন।

নামমাহাত্ম্য কথন।

হরিদাসের নির্জ্জন কুটীরে গৌর প্রায়ই গতায়াত করিতেন। নামমাহাত্ম্যসম্বন্ধে এই যবন ভক্তের কথা বড় প্রামাণ্য ছিল। তাঁহার সমস্ত জীবনটি যেন নামময়। এক দিন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, কলিকালে এই যে সকল অসংখ্য যবন, যাহারা গো ব্রাহ্মণ বধ করে, ইহাদের কিরূপে নিস্তার হইবে তাই ভাবিয়া আমি বড় দুঃখিত হইতেছি। তিনি বলিলেন, সে জন্য তুমি চিন্তা করিও না, তাহারা "হারাম" "হারাম" বলিয়া মুক্ত হইবে। অজামিল নারায়ণ নামক পুত্রকে ডাকিয়া তরিয়া গিয়াছে, নামের এমনি গুণ। [ গৌর ] আচ্ছা তবে পৃথিবীতে যে বহুল স্থাবর জঙ্গম আছে ইহাদের দশা কি হইবে ? [ হরি ] তুমি যে উচ্চৈঃস্বরে নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছ তাহার ধ্বনিতে তাহারা উদ্ধার হইয়া যাইবে। স্থাবরে যে হরিধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিয়াছ, তাহা প্রতিধ্বনি নহে, তাহারাও কীর্ত্তন করিয়াছে। পুনরায় গৌর বলিলেন, সমস্ত জীব যদি মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গে চলিয়া যায়, তাহা হইলেত ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই রহিল না, সব শূন্য হইয়া গেল! হরিদাস বলিলেন, আবার সূক্ষ্ম জীব উৎপন্ন হইয়া স্থাবর জঙ্গমের সহিত জগৎকে পরিপূর্ণ করিবে। হরিদাসের কথায় গৌরাঙ্গ প্রীত হইয়া ভক্তমণ্ডলীমধ্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কেমন সরল বিশ্বাস! জীবসাধারণের মুক্তির জন্য কি চমৎকার আগ্রহ! গৌরের এই সকল প্রশ্নের মধ্যে তাঁহার কি সুকোমল ভাব, কি মধুর অমায়িকতাই প্রকাশ পাইতেছে!

সনাতনের নীলাদ্রি দর্শন।

সনাতন গোস্বামী কিছু কাল বৃন্দাবনে অবস্থানান্তর ঝারিখণ্ডের বনপথ ধরিয়া নীলাচলে উপস্থিত হন। একে কঠোর বৈরাগ্যের পেষণে তাঁহার শরীর নিতান্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর আবার অনাহার, অনিদ্রা, পথভ্রমণ এবং ঝারখণ্ডের অস্বাস্থ্যকর জলপান, নানা কারণে সনাতনের সর্ব্বাঙ্গে চর্ম্মরোগ উৎপন্ন হইল এবং তাহা হইতে শোণিত ও রস নিঃসৃত হইতে লাগিল। তখন তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল এবং ভগ্নদেহ হইয়া পড়িলেন। এই ব্যাধির জন্য বৈরাগীর মনে অত্যন্ত গ্লানি ও নির্ব্বেদ

উপস্থিত হয়। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, একে আমি নীচ জাতি, তাহাতে জগন্নাথের মন্দিরের নিকট প্রভুর বাসা, সেখানে জগন্নাথের পরিচারকগণের অঙ্গস্পর্শ করিলে আরও আমার অপরাধ বৃদ্ধি হইবে, অতএব রথের অগ্রে গৌর যখন নৃত্য করিবেন সেই সময় তাঁহার সম্মুখে রথ-চক্রে আমি প্রাণত্যাগ করিব। এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া সনাতন হরিদাসের আশ্রমে গিয়া অতিথি হইয়া রহিলেন, তাঁহার সঙ্গে আলাপে পরমানন্দ লাভ হইল, কতক্ষণে গৌরকে দেখিবেন কেবল এই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মহাপ্রভু তথায় আসিয়া দর্শন দিলেন। সনাতনকে দেখিবা মাত্র তিনি মহা হরষিত মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইলেন। গৌর কোল দিবার জন্য যত অগ্রসর হন, সনাতন তত পাছে হাঁটেন; শেষ নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, দোহাই প্রভু! আমাকে স্পর্শ করিবেন না! স্পর্শ করিবেন না! একে আমি নীচ তাহাতে গাত্রকণ্ডুরসে অপবিত্র, অতএব রক্ষা করুন! যে গৌরপ্রেম গলিত-কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছে তাহা কি আপনার প্রাণতুল্য শিষ্যের গাত্রকণ্ডু দেখিয়া পরাঙ্মুখ হইবে? অনন্তর বলপূর্ব্বক তিনি সনাতনকে আলিঙ্গন দান করিলেন। এই স্থানে আসিয়া সনাতন আপনার কনিষ্ঠ অনুপমের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার ভক্তিনিষ্ঠা আলোচনা করিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ শোক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

চৈতন্য গোসাঞী দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে সনাতনের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন;—দেহত্যাগে যদি কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, তবে কোটি দেহ নিমেষের মধ্যে ত্যাগ করিতেই বা ক্ষতি কি? তাহাতে কিছু হয় না, কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় ভক্তি আর ভজন। দেহনাশ তমোগুণের লক্ষণ, ইহাতে পাপ হয়। সাধক প্রেমভক্তির বিরহে প্রাণত্যাগ করিতে চায় বটে, গাঢ় অনুরাগের অভাব হইলে মৃত্যুবাঞ্ছা হয় সত্য, কিন্তু সেই বিরহজ্বালাই আবার প্রাণনাথকে নিকটে আনিয়া দেয়; সুতরাং তাহাকে আর মরিতে হয় না। তুমি এ কুবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তন কর, অচিরাৎ কৃষ্ণ প্রেমধন পাইবে। তাঁহার ভজনে নীচ জাতি অযোগ্য নহে, আবার সৎকুলোদ্ভব বিপ্র হইলেও তাহাতে যোগ্য হওয়া যায় না। এ বিষয়ে জাতি কুলের বিচার নাই, যে ভজনা করে সেই শ্রেষ্ঠ; সে ব্যক্তি হীন অভক্ত হইয়াও উচ্চ হইতে পারে। দীনের প্রতি ভগবানের অধিক দয়া; কুলীন

ধনী পণ্ডিত ইহারা বড় অভিমানী; হরিপদারবিন্দবিমুখ ষড়্গুণযুক্ত বিপ্র অপেক্ষা হরিগত-প্রাণ চণ্ডালকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়, ইহা ভাগবতে কথিত আছে। ভজনের মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, আত্ম-নিবেদনাদি ভক্তির নববিধ কার্য্য উৎকৃষ্ট বিষয়; হরিপ্রেমই হরিকে আনিয়া দিতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই। নিরপরাধে নামসঙ্কীর্ত্তন করা ইহাই সর্ব্বোপরি সার জানিবে। সনাতন অকস্মাৎ এ সকল কথা শুনিয়া একবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। অতঃপর প্রভুর চরণে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন ঠাকুর, আমাকে জীবিত রাখিলে তোমার কি লাভ হইবে? আমি অতি হীন পামর, তুমি সকলি জান, যাহা করাও তাহাই করি। গৌর বলিলেন, তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়া এক্ষণে আবার পরের দ্রব্য বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ? ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিতে পার না? তোমার শরীর দ্বারা আমি বহু প্রয়োজন সাধন করিব। ভক্ত, ভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব, বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্ম, এবং আচার ব্যবহার তোমা হইতে নির্দ্ধারিত ও প্রচারিত হইবে। মাতৃ আজ্ঞায় আমি নীলাচলে আছি, নিজ-বলে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে পারি না; যাহা আমি করিতে অক্ষম সে সকল আমি তোমা দ্বারা করাইব। তুমি দেহপাত করিবে ইহা কি আমি সহিতে পারি? তোমা হইতে লোকে বৈরাগ্য শিখিবে, ভক্তি ও প্রেমতত্ত্ব প্রচারিত হইবে, আমার প্রিয় স্থান লুপ্ততীর্থ মথুরা বৃন্দাবনের পুনরুদ্ধার হইবে। হরিদাস, তুমি নিষেধ করিও যেন সনাতন অন্যায় আচরণ না করে। এ ব্যক্তি পরের দ্রব্য বিনষ্ট করিতে চায়। হরিদাস বলিলেন, তোমার গম্ভীর হৃদয়ের কথা কে বুঝিবে? কাহার দ্বারা তুমি কি কাজ করাও তাহা তুমি না জানা-ইলে জানিতে পারি না। সনাতন তখন কথঞ্চিৎ পরিমাণে সুস্থির হইলেন এবং বলিলেন ঠাকুর, আমি কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ, আপনাকে আপনি চিনি না, তুমি যেমনি নাচাও তেমনি নাচি। বস্তুতঃ সনাতন যাহা বলিয়াছেন ইহা বড় ঠিক কথা। মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক গতি কিরূপ, সে কোন্ কার্য্যের উপযুক্ত, কি প্রণালীতে তাহার হৃদয়তন্ত্রীর স্বর মিলাইয়া তাহাকে বাজাইতে হয়, কোন্ স্থানে আঘাত করিলে তাহার ভিতর হইতে অমৃতের স্রোত বাহির হইতে পারে, এই জগদ্রূপ নাট্যশালায় কোন্ ব্যক্তি কোন্ অংশ সুন্দররূপে অভিনয় করিতে সক্ষম, অন্তরদর্শী মহাপুরুষেরাই কেবল তাহা জানেন। যখন মানব হৃদয়ের লুক্কায়িত সম্পত্তি তাঁহারা বাহির

করিয়া দেন, তখন মানুষ আপনাকে আপনি চিনিয়া আহ্লাদে পুলকিত হয়। আমাদের গুণের গৌর এই মহামন্ত্র জানিতেন। মহাপুরুষেরা যে কেবল জীবতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারেন তাহা নহে, ভগবানের গুপ্ত অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়া তাঁহারা সাধারণ জনসমাজকে অবাক্ করিয়া দেন। প্রেরিত মহাজনদের কার্য্যই এই যে, তাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিবেন, ইহারই জন্য তাঁহাদের আবির্ভাব। অনন্তর প্রভুর আজ্ঞায় হরিদাস ও সনাতন বৈরাগীকে বুঝাইয়া বলিলেন, দেখ সনাতন, তোমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে আছে? প্রভুর নিজদেহের কার্য্য তোমার দ্বারা তিনি করাইবেন, ভক্তির সিদ্ধান্তশাস্ত্র, আচারনির্ণয় তুমি প্রচার করিবে, ইহা অপেক্ষা তোমার সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? আমি বৃথা জীবন ধারণ করি, আমার এ দেহ প্রভুর কোন কার্য্যে আসিল না। সনাতন বলিলেন, তুমি প্রতি দিন তিন লক্ষ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে, নামের মহিমা জগতে প্রচার করিয়া গেলে, এমন আর কে পারিবে? ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে তোমার তুল্য ভাগ্যবান্ আর আমি কাহাকেও দেখি না। কেহ আপনি আচরণ করে প্রচার করে না, কেহ প্রচার করে আচরণ করে না, তুমি আচার প্রচার দুই কার্য্যই করিয়া থাক।

কিয়দ্দিবসান্তে রথযাত্রার কালে গৌড়ের সমস্ত ভক্তবৃন্দ এখানে আসিলেন, সনাতনের সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ পরিচয় হইল। এইরূপে তিনি থাকেন, এক দিন গৌরাঙ্গ যমেশ্বর টোটা নামক স্থানে গিয়া তাঁহাকে তথায় আহ্বান করিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে সমুদ্রের বালুকারাশি অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে আগুনের হল্কা ছুটিতেছে, সহজ পথ ছাড়িয়া সেই তপ্তবালুকারাশির উপর দিয়া সনাতন চলিলেন, পায়ের তলায় ফোস্কা পড়িল তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। প্রভু তদ্বিষয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি অস্পৃশ্য পামর, সিংহদ্বারের পথে জগন্নাথদেবের সেবকগণ যাতায়াত করে, সে পথে চলিবার আমার অধিকার নাই। চৈতন্য সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, যদিও তুমি দেব ও মুনিগণের বন্দনীয় পবিত্রস্বভাব, তথাপি মর্য্যাদাপালন করা বিধেয়, অন্যথা লোকে উপহাস করে, নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করিলে আমার মন সন্তুষ্ট হয়, তুমি না করিলে তাহা আর কে করিবে? তদনন্তর কণ্ডুরসব্যক্ত সনাতনকে তিনি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন দান করিলেন।

একে নিজের নিকৃষ্টতা স্মরণে গ্লানি বোধ, তাহার উপর গৌরপ্রেমের উৎপীড়ন, এই সকল কারণে সনাতন আপনাকে নিতান্ত অপরাধী বোধ করত ইতিকর্ত্তব্য বিষয়ে জগদানন্দ পণ্ডিতের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। তিনি বলিলেন, বৃন্দাবনই তোমার পক্ষে উপযুক্ত স্থান, রথযাত্রার পর তুমি সেই খানেই চলিয়া যাও। এ কথা সনাতন গৌরকে জ্ঞাপন করাতে তিনি বলিলেন, কি! কালিকার জগা সে নাবালক হইয়া কি না তোমাকে আবার উপদেশ দেয়? তুমি হইলে আমার উপদেষ্টা এবং গুরু তুল্য ব্যক্তি, সে তোমাকে শিক্ষা দিতে আসে? তুমি বিজ্ঞ জ্ঞানী, আমাকে তুমি ভক্তির কত ব্যবহার বুঝাইয়া দিয়াছ, বালক জগা তোমাকে উপদেশ দিবে? মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি সহ্য করিতে পারি না। তোমার দেহ আমার পক্ষে অমৃত সমান, ইহাকে তুমি প্রাকৃত মনে করিয়া ঘৃণা কর, কিন্তু আমি প্রাকৃত দেহ বলি না। আমি সন্ন্যাসী, তোমাকে ত্যাগ করা আমার অনুচিত কার্য্য, ঘৃণা করিলে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নষ্ট হয়। তাহা শুনিয়া হরিদাস বলিলেন, ঠাকুর! এ তোমার প্রবঞ্চনার কথা আমি মানি না। আমাদিগকে যে তুমি গ্রহণ করিয়াছ, ইহাতে তোমার দীনের প্রতি দয়া ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ করে না। গৌর ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন, "শুন হরিদাস, সনাতন, মনের কথা তবে বলি শ্রবণ কর। তোমাদিগকে বালক বোধে আমি স্নেহ করিয়া থাকি। মাতার পক্ষে বিষ্ঠামূত্রক্লেদদূষিত সন্তানের শরীর যেমন আদৃত, সনাতনের দেহ আমার পক্ষে তদ্রূপ, ইহা আলিঙ্গনে ঘৃণার উদয় হয় না। বৈষ্ণবের দেহ কখন প্রাকৃত নহে। ভক্ত যখন দীক্ষিত হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করে, তখন তিনি তাহার দেহকে অপ্রাকৃত চিদানন্দময় করিয়া লন; ভক্ত সেই অপ্রাকৃত দেহে হরিচরণ ভজনা করে। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা; নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে। তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো, ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥" সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাতে যে আত্মসমর্পণ করে সে অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সঙ্গে একাত্মা হইয়া যায়। সনাতনের দেহে ভগবান্ কণ্ডু উৎপাদন করিয়া আমাকে পরীক্ষা করিলেন। আমি যদি ইহাতে ঘৃণা করিতাম, তাঁহার নিকট অপরাধী হইতাম। আপনার পারিষদের দেহে কণ্ডুরস ইহা দুর্গন্ধ নহে। অতএব সনাতন, তুমি দুঃখিত হইও না, তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমি বড় সুখ পাই। আর এক বৎসর তুমি এখানে থাক, তাহার

পর আমি তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইব।" প্রভু সনাতনকে যে পুত্রবাৎসল্যের কথা বলিলেন ইহা বড় মিষ্ট কথা। ভক্ত মহাপুরুষেরা অনুগত শিষ্যদিগকে যেরূপ ভাল বাসেন তাহা মাতৃস্নেহ অপেক্ষাও মধুরতর, এ কথা গৌরভক্ত জনেরা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। জননী স্তনদুগ্ধদানে সন্তানের পার্থিব দেহকে পালন করেন, কিন্তু সাধু গুরু ঈশ্বরপ্রেরিত ধাত্রী হইয়া শিষ্যের শৈশব অমরাত্মাকে প্রেম ও পুণ্যদুগ্ধ দানে পরিপোষণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরাবিষ্ট সাধু দিব্যজ্ঞানামৃত পান করাইয়া আপনার সন্তান তুল্য শিষ্যদিগকে যে ভাবে প্রতিপালন করেন তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। সন্তান পোষণের জন্য যেমন মাতার প্রযোজন, আত্মার ধর্ম্মোন্নতির জন্য তেমনি দেবভাবাবিষ্ট ধর্ম্মগুরুর প্রয়োজন। তদনন্তর দোলযাত্রার উৎসব সাঙ্গ হইলে কি কি কার্য্য করিতে হইবে তৎসমুদয় উপদেশ দিয়া সনাতন বৈরাগীকে প্রভু বৃন্দাবন পাঠাইয়া দিলেন। তথায় রূপ সনাতন ভ্রাতৃদ্বয় একত্রিত হইয়া বহুল গ্রন্থ রচনা করেন। সনাতন ভাগবতামৃত গ্রন্থে ভক্ত, ভক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব; সিদ্ধান্তসার পুস্তকে বৃন্দাবনলীলারস; হরিভক্তিবিলাসে বৈষ্ণবগণের নিত্যকর্ম্ম; তদ্ভিন্ন আরও ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রন্থ অনেক প্রচার করিলেন। রূপ গোস্বামী রসামৃতসিন্ধুসার গ্রন্থে ভক্তিরসের ব্যাখ্যান বিবৃত করেন; উজ্জ্বলনীলমণিতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণন করেন; তদ্ভিন্ন আরও অনেক গ্রন্থ তাঁহা কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। অনুপমের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া এই সময় জ্যেষ্ঠতাতদিগের সঙ্গে মিলিত হন, এবং ষট্‌সন্দর্ভ, ভাগবতসন্দর্ভ, গোপালচম্পূ প্রভৃতি বহুল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

### প্রদ্যুম্ন মিশ্রের ভক্তিশিক্ষা।

এক দিন প্রদ্যুম্ন মিশ্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া চৈতন্যের নিকট গমন করাতে তিনি বলিলেন, আমি কিছু জানি না, তুমি রামানন্দ রায়ের নিকট যাও, তাঁহার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়া পরিতুষ্ট হইবে। প্রদ্যুম্ন রায়ভবনে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, রামানন্দ নির্জ্জন স্থানে উদ্যানমধ্যে দুইটী কিশোর বয়স্কা সুন্দরী নর্ত্তকীকে নাটকাভিনয় শিক্ষা দিতেছেন। নির্ব্বিকার চিত্ত রামানন্দ আপনাকে সেবক জ্ঞানে সেই দুই জনের অঙ্গ মার্জ্জনা, বেশ বিন্যাস কার্য্য সহস্তে করিতেন এবং তাহাদিগকে গীতাভিনয় শিক্ষা দিতেন।

তাহারা জগন্নাথের মন্দিরে গিয়া নৃত্য গীত করিত, দেবদাসী নামে তাহারা আখ্যাত। সিদ্ধাত্মা রামানন্দ রায় তাহাদের দেহকে কাষ্ঠ পাষাণনির্ম্মিত মূর্ত্তির ন্যায় অনুভব করিতেন। ইহা একটী আশ্চর্য্য ক্রিয়া বিশেষ। প্রথম দিবসে মিশ্রের সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মালাপ হইল না, পর দিন তিনি তাঁহাকে আসিতে অনুমতি করিলেন। মিশ্রের মুখে গৌর এই সকল কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, দর্শন দূরের কথা, প্রকৃতির নাম শুনিলে আমার বিকার উপস্থিত হয়, কিন্তু রামানন্দ এ বিষয়ে কেমন নির্ব্বিকার! তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত, কে তাঁহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে? ভাগবত শাস্ত্রে কেবল শুনা গিয়াছে যে, বিশ্বাসী হইয়া রাসবিলাসের কথা শ্রবণ করিলে হৃদ্রোগ কাম বিনষ্ট হয়, মনুষ্য মহাধীর হইয়া প্রেমভক্তির উজ্জ্বল মধুর রসের আস্বাদন পায় এবং কৃষ্ণের মাধুর্য্য রসে আনন্দে বিহার করে। পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃনুয়দাথ বর্ণয়েদ্বা। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ। ইহা যে পাঠ করে এবং শুনে সে নিত্যসিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। রায়ের ভজনপ্রণালী রাগানুগা, তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন। পরমাসুন্দরী কিশোরী নর্ত্তকীদ্বয়কে রায় স্বহস্তে বসন ভূষণ পরাইয়া দেন, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনা করেন, তথাপি তাঁহার চিত্তে কোন বিকার উপস্থিত হয় না। মিশ্র, তুমি পুনরায় তাঁহার নিকট যাও, তিনি কি শিক্ষা দেন আমাকে আসিয়া বলিও। অপর দিনে প্রদ্যুম্ন রামানন্দের সভায় উপস্থিত হইয়া প্রেমরসতত্ত্ব শুনিতে আরম্ভ করেন। সৎপ্রসঙ্গের এমনি গুণ, তৃতীয় প্রহর বেলা হইয়া গেল তথাপি কাহারো ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ নাই; পরিশেষে রায়ের এত দূর উৎসাহ বৃদ্ধি হইল যে তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর মিশ্র তাঁহার উপদেশে বিগলিতচিত্ত হইয়া পুনর্ব্বার চৈতন্যকে সমস্ত বিবরণ অবগত করিলেন, রামানন্দের বিনয় ও নম্রতার কথা কহিলেন। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, রামানন্দ আপনার গুণ আমার উপর আরোপ করে, গৃহস্থ বিষয়ী হইয়াও ইন্দ্রিয়গণকে পরাজয় করত সে সন্ন্যাসীদিগকে উপদেশ দেয়। প্রধান বৈষ্ণব দলের মধ্যে রায় রামানন্দ যদিচ উচ্চ পদস্থ এক জন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সকলে বিজিতেন্দ্রিয় নির্ব্বিকার চিত্ত বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন।

কোন কবির মনঃপীড়া।

স্বরূপ দামোদর কিরূপ তেজীয়ান্ লোক ছিলেন তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। তিনি বিদ্যা, সরলতা এবং নিষ্ঠাতে গৌরের অতিশয় প্রিয়পাত্র হন। কিন্তু বড় মুখর ছিলেন। এক বার কোন এক জন গৌড়দেশ-বাসী ব্রাহ্মণ চৈতন্যলীলার এক খানি নাটক লিখিয়া আনে, তাহাকে তিনি যেরূপ বিপদগ্রস্ত করিয়াছিলেন তাহা শুনিলে বড় দুঃখ বোধ হয়। ভয়ানক তেজস্বী সারগ্রাহী সুপণ্ডিত; নবীন গ্রন্থকারদিগের রসনাভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের অল্পতা তাঁহার নিকট অমার্জ্জনীয় ছিল। গৌরের শিষ্যদলের মধ্যে অনেকগুলি কৃতবিদ্য প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। ভক্তির তরঙ্গ যখন এ দেশে প্রবাহিত হইল, তখন অনেক নূতন কবি ও গ্রন্থকার বৈষ্ণবদলের মধ্যে উদিত হইলেন। ব্যাপারটি বাস্তবিক আদ্যোপান্ত কবিত্বরসেরই প্রতিকৃতি। বঙ্গদেশীয় উপরিউক্ত বিপ্রটি গৌরচরিত্রের এক নাটক লিখিয়া তাঁহাকে শুনাইবার জন্য নিতান্ত আগ্রহান্বিত হন। এ সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, যে কোন ব্যক্তি কিছু রচনা করিবে অগ্রে স্বরূপকে সে তাহা শুনাইবে, তিনি অনুমোদন করিলে তবে গৌরাঙ্গ তাহা শুনিবেন। সিদ্ধা-ন্তের বিরুদ্ধ কোন রসাভাস তিনি শ্রবণ করিতেন না। ব্যাকরণ ও অলঙ্কার দোষযুক্ত ভক্তিরসবিরহিত অসার কাব্য নাটক শুনিলে দামোদরও বড় বিরক্ত হইতেন। ভগবান্ আচার্য্যের অনুরোধে এই নাটক শুনিতে বসিয়া শেষে তিনি সেই নবীন গ্রন্থকারকে এমন ভর্ৎসনা করিলেন যে তাহাকে এককালে মাটী করিয়া দিলেন। সভার মধ্যে তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া অপর সকলের বড় দুঃখ হইয়াছিল। পরে তাহাকে কোনরূপে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া দেশে পাঠান হয়। অনন্তর ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখী হইয়া দামোদর তাহাকে মিষ্ট বচনে বলিলেন, বৈষ্ণবের নিকট গিয়া তুমি ভাগবত পাঠ কর, গৌরপদে শরণ লও, তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গে সঙ্গ কর, তাহার পর এ সব তত্ত্ব লিখিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ তখন অতিশয় লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইয়া গৌরচন্দ্রের সঙ্গে বৈরাগী হইয়া রহিল।

এই সময় হইতে চৈতন্যের হৃদয়ে অন্য এক উচ্চ ভাবের বিরহ ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। প্রেমময়ের প্রেমে যত তাঁহার অনুরাগ আসক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে সময়ে সময়ে প্রেমবিকার ও বিচ্ছেদানলও অন্তরে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। দিবসে নানাবিধ সদালোচনা, দেবদর্শন, সঙ্কীর্ত্তন,

ভক্তসঙ্গ ইত্যাদি কার্য্যে ভুলিয়া থাকিতেন, রাত্রি হইলে বিরহবিকারে প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইত। হৃদয়নাথকে সর্ব্বক্ষণ নয়নে নয়নে রাখিতে না পারিলে তাহার পিপাসার নিবৃত্তি হইত না। এই অবস্থায় স্বরূপ দামোদর নিকটে থাকিয়া প্রেমলীলার সঙ্গীত করিতেন, এবং রামানন্দ রায় জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কৃত আদিরসের কবিতা, ভাগবতের রাসলীলার শ্লোক এবং বিবিধ প্রেমতত্ত্ব ও মাধুর্য্য রসের কবিতা শুনাইতেন, তাহাতে তাঁহার কথঞ্চিৎ তৃপ্ত্যনুভব হইত। কখন রাধার ভাবে, কখন গোপীদিগের ভাবে বিরহে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেন, প্রাকৃত প্রেমের বিরহসঙ্গীত এবং শ্লোক শুনিয়া আরো মাতিয়া উঠিতেন। গৌড়দেশস্থ ভক্তগণ যে চারি মাস নীলাচলে বাস করিতেন, তাঁহাদের সহবাসে সে সময় মহাপ্রভুর মন অপেক্ষাকৃত সুস্থির থাকিত।

### রঘুনাথ দাসের বৈরাগ্য।

রঘুনাথ দাসের বৈরাগ্যবৃত্তান্ত পূর্ব্বেই কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। যেরূপে পরে তিনি সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া গৌরের সঙ্গী হইলেন তদ্বিবরণও অতীব আশ্চর্য্যজনক। রঘুনাথ মর্কটবৈরাগ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্লিপ্তভাবে কিছু দিন সংসারে ছিলেন। তদনন্তর বৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুর নীলাচলপ্রত্যাগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তথায় যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার পিতৃব্য হিরণ্য দত্ত সপ্তগ্রাম অঞ্চলের জমীদারি মকরা করিয়া লইলেন। তিনি বিশ লক্ষ মুদ্রা কর সংগ্রহ করিয়া বার লক্ষ মাত্র নবাবকে দিতেন। উক্ত জমীদারির পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা এক জন মুসলমান এই কথা নবাবকে জানাইয়া বাদ সাধিল। উজির তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে আসিলেন, হিরণ্য এবং আর আর সকলে পলাইল, রঘুনাথ বন্দীভূত হইলেন। তিনি শান্তভাবে মিষ্ট বাক্যে ঐ মুসলমানকে অনেক বলিয়া কহিয়া তাহাকে কিছু অংশ দিতে স্বীকৃত হইয়া সমস্ত গণ্ডগোল মিটাইয়া এক বৎসর কাল পরে পলায়নের পথ দেখিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ রজনীযোগে গোপনে প্রস্থান করেন, আর বারংবার তাঁহার পিতা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন। রঘুনাথের মাতা গোবর্দ্ধন দাসকে বলিলেন, পুত্র উন্মাদ হইয়াছে, উহাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখ। পিতা তাহাতে এই উত্তর করিলেন যে, ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্য, অপ্সরাতুল্যা স্ত্রী যাহাকে বাঁধিতে পারিল না, সামান্য রজ্জু দ্বারা কি তাহাকে বাঁধিয়া রাখা যায়? ইহার উপর চৈতন্যের কৃপা হইয়াছে,

তাঁহার পাগল কে ধরিয়া রাখিতে পারে? অতঃপর রঘুনাথ পাণিহাটী গ্রামে নিত্যানন্দের নিকট চলিয়া গেলেন। অবধূত নিতাই তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, ওরে চোর! এত দিনে তুই এলি? এস! এস! আজ আমার বন্ধুগণকে তুমি দধি চিড়ার ফলার খাওয়াও। রঘুনাথ মহা আনন্দিত হইয়া সেইখানে এক চিড়ামহোৎসব করিলেন। যত লোক সেখানে ছিল, এবং যত লোক দেখিতে আসিয়াছিল প্রত্যেককে এক মাল্‌সা দুধচিড়া এবং এক মাল্‌সা দধিচিড়া দেওয়া হয়। শত শত বৈষ্ণব প্রেমের ঝাঁকি দিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলার খাইলেন, তদ্দর্শনে নিত্যানন্দের যৎপরোনাস্তি সুখ বোধ হইল। তিনি নিজেও দুই মাল্‌সা চিড়ার ফলার খাইলেন! মাল্‌সাভোগ বড় উপাদেয় ভোগ্য। ভক্তির ধর্ম্মের আহার্য্য সকলও অতি সরস এবং কোমল। যে দেখিতে আসে সেই খায়, মহা মহোৎসব লাগিয়া গেল। দ্রব্যবিক্রেতাগণ দ্রব্য বিক্রয় কবিয়া মূল্য লইল এবং তাহা নিজেরাই ভক্ষণ করিল। আহারের পর মহা উদ্যমের সহিত হবিনাম সঙ্কীর্ত্তন হয়। মহোৎসব শেষ হইলে রঘুনাথ সভক্ত নিত্যানন্দের নিকট চৈতন্যসঙ্গ লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইলেন। ভোজনের পর বৈষ্ণবগণকে যে যেমন পাত্র দশ বিশ শত মুদ্রা এবং নিত্যানন্দের সেবার জন্য তাঁহাব ভৃত্যহস্তে গোপনে এক শত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া দাসরঘুনাথ গৃহে প্রস্থান করিলেন। গৃহে গিয়া তদবধি অন্তঃপুরে আব প্রবেশ করেন নাই, যে কয় দিন বাড়ীতে ছিলেন প্রহরীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বহির্ব্বাটীতেই থাকিতেন। এক দিন সুযোগ পাইয়া বনে বনে নীলাচলাভিমুখে একাকী পলায়ন করিলেন। রথযাত্রিগণও এই সময় শ্রীক্ষেত্রের পথে বাহির হইয়াছিল। গোবর্দ্ধনদাস পুত্রকে ফিরাইবার জন্য শিবানন্দের নিকট পত্র লিখিয়া লোক প্রেরণ করেন। কিন্তু রঘুনাথ যে পথ ধরিয়াছিলেন সে পথে লোক জনের গতিবিধি ছিল না। নদী পর্ব্বত বন প্রান্তর পার হইয়া, অনাহার অনিদ্রায় বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া তিনি দ্বাদশ দিবসে একবারে চৈতন্যসমীপে গিয়া উপনীত হইলেন। রঘুনাথকে পাইয়া মহাপ্রভু অতুল আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কোল দিয়া তিনি সভাস্থ সকলকে বলিতে লাগিলেন, ইহার পিতা এবং পিতৃব্য বিষয়ের কীট, কিন্তু ভগবানের কৃপায় রঘুনাথ তাহা হইতে উদ্ধার হইল। তাঁহাকে পথশ্রমে ক্লিষ্ট ও মলিন দেখিয়া দামোদরকে প্রভু বলিয়া দিলেন, তুমি ইহাকে পুত্র সমান দেখিয়া পালন করিবে, আমি তোমার হস্তে রঘুনাথকে সমর্পণ

করিলাম। নিজভৃত্য গোবিন্দকেও বলিলেন, রঘুনাথ পথে বড় ক্লেশ পাইয়া আসিয়াছে, ইহাকে ভালরূপে শুশ্রূষা কর। শেষে এই রঘুনাথ এমন বৈরাগী হইলেন যে, কিছু দিন পর্য্যন্ত সিংহদ্বারে কাঙ্গাল ভক্তদিগের সঙ্গে অন্ন ভিক্ষা করিয়া খাইতেন। পরে তাহাও গেল, গাভীদিগের মুখভ্রষ্ট পরিত্যক্ত পর্য্যুষিত অন্ন সংগ্রহপূর্ব্বক ধৌত করিয়া তাহার দ্বারা প্রাণ ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যাচরণের কথা শুনিয়া যদিও গৌর সকল বিষয়ে অনুমোদন করিতেন না, কিন্তু বীতস্পৃহা ত্যাগস্বীকার দেখিয়া তাঁহার মনে মনে বড় আহ্লাদ হইত। এক দিন তিনি বলিলেন, রঘুনাথ উত্তম কার্য্য করিতেছে; বৈরাগী হইয়া যাহারা ভোগ বাসনা, জিহ্বার লালসা রাখে, নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়সুখের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, তাহাদের পরমার্থ বিনষ্ট হয়, ভগবান্‌কে তাহারা লাভ করিতে পারে না। বৈরাগী সর্ব্বদা নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া শাক পত্র ফল মূলে আত্মরক্ষা করিবে। রঘুনাথের আহার্য্য সেই পর্য্যুষিত ধৌত অন্ন প্রভু এক দিন খাইয়া আনন্দ প্রকাশ করত বলিয়াছিলেন, তুমি এমন সামগ্রী নিত্য খাও, আমাকে দাও না! অনন্তর রঘুনাথ তাঁহাকে বলিলেন, আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি, কি আমার কর্ত্তব্য তাহা আমাকে সবিশেষ বুঝাইয়া দিউন। গৌর তাঁহাকে এই উপদেশ দিলেন যে, তুমি স্বরূপের নিকট সাধ্য সাধনতত্ত্ব শিক্ষা কর, তিনি তোমার উপদেষ্টা হইলেন; আমি যাহা জানি না, তাহা তিনি জানেন। তথাপি আমার কথায় যদি তোমার শ্রদ্ধা হয়, তবে এই বলিতেছি, গ্রাম্যকথা শুনিবে না এবং বলিবে না, ভাল খাইবে না, ভাল পরিবে না, অমানিকে মান দিবে, সর্ব্বদা হরিনাম লইবে, মানসে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিবে; সংক্ষেপে এই যথা কর্ত্তব্য বলিলাম। "তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরি॥"

রঘুনাথের ক্লেশ মোচনের জন্য তাঁহার পিতা একবার চারি শত মুদ্রা এবং কয়জন ভৃত্য ও পরিচারক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তিনি তাহা স্পর্শও করেন নাই। সেই অর্থে মাসে দুই দিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইতেন। পরে তাহাও আর প্রীতিকর বোধ হইল না; ভাবিলেন, বিষয়ীর দ্রব্যে প্রভুর চিত্ত প্রসন্ন হয় না, ইহাতে আমারও কেবল প্রতিষ্ঠা মাত্র লাভ। এ কথা চৈতন্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, বিষয়ীর অন্নে মন মলিন হয়, ইহা রাজসিক নিমন্ত্রণ, দাতা ভোক্তা উভয়েরই

মনকে ইহাতে কলুষিত করে, পরমার্থতত্ত্ব ভুলাইয়া দেয়; রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া বড় উত্তম কার্য্যই করিয়াছে। রঘুনাথ জপ ধ্যান সঙ্কীর্ত্তনে সমস্ত দিন রাত্রি মগ্ন থাকিতেন, চারি দণ্ড মাত্র সময় আহার নিদ্রার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ভেকধারী হওয়ার পর ভাল দ্রব্য রসনায় আর কখন স্পর্শ করেন নাই, মলিন ছিন্ন বসন পরিতেন, এইরূপে তিনি গৌরপ্রিয় হরিভক্ত পরম বৈরাগী হইয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়া যান। গৌরাঙ্গদেব রঘুনাথকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কাহাকেই বা না ভাল বাসিতেন? প্রত্যেকেই মনে করিত প্রভু সর্ব্বাপেক্ষা আমাকে অধিক প্রীতি করেন। মনুষ্যের অভ্যন্তরে কি বস্তু আছে তাহা তিনি যেমন বুঝিতেন তেমন আর কে বুঝিবে? এইজন্য আপনি ভক্তচূড়ামণি হইয়াও ছোট বড় সমস্ত সাধু বৈষ্ণবকে উপযুক্ত সম্মান ও প্রীতি প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার ন্যায় নরোত্তমেরাই নরগণের প্রকৃত মর্য্যাদার পক্ষপাতী।

### বল্লভ ভট্টের গর্ব্ববিনাশ।

প্রয়াগের নিকট যমুনাতটবাসী সুবিজ্ঞ পণ্ডিত বল্লভ ভট্ট, (যিনি একবার চৈতন্যকে নিজালয়ে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন) কিছু দিন পরে তিনিও নীলাচলে আসিলেন। ভট্টের কিছু জ্ঞানাভিমান ছিল, প্রভুর সঙ্গে তর্ক বিতর্ক জ্ঞানালোচনা করেন এই ইচ্ছা; অন্য ভক্তগণের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ দিতেন না, একটু বিজ্ঞতা এবং পাণ্ডিত্য দেখান যেন উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার বচনচাতুর্য্য শুনিয়া চৈতন্য বলিলেন, আমি নিতাই অদ্বৈত হরিদাস প্রভৃতি সমস্ত ভক্তদিগের নিকট নানা বিষয় শিক্ষা করিয়াছি, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়াই আমার ভক্তিলাভ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভট্টের মনে মনে অভিমান ছিল যে সর্ব্বাপেক্ষা তিনিই ভাগবতে পণ্ডিত, বৈষ্ণবতত্ত্ব তাঁহার মত আর কেহ জানে না, পরে গৌরাঙ্গের মুখে অপর ভক্তগণের প্রশংসা শুনিয়া এবং তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার গর্ব্ব কিছু খর্ব্ব হইল। তথাপি বিদ্যার অভিমান কি শীঘ্র যায়? আমি বিদ্যাবাগীশ, বহুশাস্ত্রদর্শী জ্ঞানী, অমুক অমুক অনভিজ্ঞ অল্পজ্ঞ আধুনিক, অন্ধোৎসাহী ভাবুকেরা তত্ত্ববিষয়ে কি জানে? এই অভিমানের বিষ জ্ঞানাভিমানীর অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া থাকে; সে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিলেও উহা ধর্ম্মাভিমানরূপে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করে। কোন কল্পিত আদর্শের সঙ্গে তুলনা করিয়া সে আপনার গ্রীবাদেশ সর্ব্বদা উন্নত এবং বক্র

করিয়া রাখে, তদূর্দ্ধে আর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। ভট্ট মহাশয় এক দিন প্রভুকে অনুরোধ করিলেন, আমি ভাগবতের টীকা করিয়াছি, তোমাকে তাহা একবার শুনিতে হইবে। তিনি তাঁহার ব্যবহারে তমোগুণের আঘ্রাণ পাইয়া এবং ভাবগতি বুঝিয়া পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তথাপি ভট্ট কিছুতেই ছাড়িবেন না, একবার নিজের বিদ্যাটা দেখাইবেন। গুরুদেবের উদাসীন ভাব দর্শনে অপর ভক্তগণও কেহই আর তাঁহার কথা শুনিলেন না। শেষ ব্রাহ্মণ নিতান্ত লজ্জিত এবং অপদস্থ হইতে লাগিল। তাঁহার কথা কেহ শুনিতে চাহেন না, অথচ তাঁহাকে শুনাইতেই হইবে, ইহা এক প্রকার অত্যাচার বিশেষ, এবং ইহা জ্ঞানাভিমানের প্রত্যক্ষ দণ্ডও বটে। অন্য এক দিন চৈতন্যের সভায় তিনি এই কথা উত্থাপন করিলেন যে, জীব যদি প্রকৃতি এবং কৃষ্ণ যদি পতি হইলেন, তবে পতির নাম উচ্চারণ তোমরা কেন কর? প্রভু সে দিন স্পষ্টই তাঁহাকে বলিলেন, তোমার ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই; স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন পতিব্রতার ধর্ম্ম, সেই আজ্ঞানুসারে জীব কৃষ্ণনাম লয়, তাহাতে কৃষ্ণপদে প্রেম হয়, ইহাই নামের ফল। ভট্ট তখন অধোবদন হইয়া স্বীয় আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্রাহ্মণ কিছুতেই আর প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে পারে না, মহা বিপদ হইল। বিদ্যার অভিমান মনুষ্যকে মূর্খের ন্যায় কি অসার করিয়াই ফেলে! ভট্ট জয়ী হইবেন, দশ জনের উপর পাণ্ডিত্য করিবেন, এই ইচ্ছাটি ভিতরে বিলক্ষণ প্রবল। আর এক দিন গৌরাঙ্গের সভায় উপস্থিত হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন, স্বামীকৃত ভাগবতের ব্যাখ্যা আমি খণ্ডন করিয়াছি, তাঁহার ব্যাখ্যানে একতা নাই, যাহার যেমন ইচ্ছা সে তেমনি ভাবে উহার অর্থ করে; অতএব স্বামীকে আমি মানিতে পারি না। চৈতন্য গোসাঞী হাসিয়া বলিলেন, যে স্বামীকে মানে না তাহাকে আমি বেশ্যার মধ্যে গণ্য করি! এ কথা শুনিয়া সভাশুদ্ধ লোক হাস্য করিয়া উঠিল, ভট্ট চক্ষে আর কিছু দেখিতে পান না, মুখ শুকাইয়া গেল, লজ্জিত হইয়া গৃহে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এবার প্রভু আমার প্রতি কেন এত নির্দ্দয় হইলেন? শেষ আপনিই বুঝিতে পারিলেন যে আমার অভিমান বিনাশের জন্যই প্রভু এমন করিয়াছেন। তখন নতশিরা হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গৌর প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন, শ্রীধর স্বামীর টীকা দ্বারা ভাগবতের মর্ম্ম জানা যায়, তাঁহার উপর কোন কথা বলিও না, তাঁহার অনুগত হইয়া টীকা

রচনা কর, ভক্তিপূর্ব্বক নাম গান কর, ভগবানের পাদপদ্ম পাইয়া কৃতার্থ হইবে।

### প্রভুর ভোজন সঙ্কোচ।

পুরাতন ভক্ত মাধবেন্দ্রপুরীর রামচন্দ্রপুরী নামে এক জন অকাল কুষ্মাণ্ড বচনবিলাস সন্ন্যাসী শিষ্য ছিল। মাধব এক দিন প্রেমবিরহে খেদ করিতেছেন, রামচন্দ্র তাঁহাকে উপদেষ্টার ন্যায় বলিতে লাগিল, তুমি পূর্ণব্রহ্মকে স্মরণ কর, ব্রহ্মবিদ্ হইয়া কেন রোদন করিতেছ? সে ব্রাহ্মণ আপনার মনের দুঃখে মরিতেছে, রামচন্দ্র শিষ্য হইয়া গুরুকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল। মাধব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, দূর হও তুমি! আমাকে আর মুখ দেখাইও না, যেখানে ইচ্ছা সেইখানে চলিয়া যাও। তোর সম্মুখে মরিলে আমার অসদগতি হইবে। রামচন্দ্র গুরুকর্ত্তৃক এইরূপে পরিত্যক্ত ও তাড়িত হইয়া নানা স্থানে কেবল লোকের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়াইত। সে এক জন কঠোর-হৃদয় বিশ্বনিন্দক সন্ন্যাসী ছিল, ভক্তির ধার কিছুই ধারিত না। ঈশ্বরপুরী এই সময় মাধবের সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হন। মাধবের ভক্তি প্রেম ঈশ্বরপুরীতে সংক্রামিত হইয়া তাহা গৌরপ্রেমোন্মাদের প্রথম উপলক্ষ হয়। রামচন্দ্র নীলাচলে আসিয়া চৈতন্যের আশ্রমে এক দিন নিমন্ত্রণ খাইল। তাহাকে জগদানন্দ প্রভৃতি সকলেই চিনিতেন। ভয়ে ভয়ে যত্নপূর্ব্বক অনেক সামগ্রী তাহাকে ভোজন করান হইল। রামচন্দ্র আপনি আহার করিয়া জগদানন্দকে খাইতে অনুরোধ করিল, এবং খাও খাও বলিয়া আগ্রহের সহিত তাঁহাকে অধিক ভোজন করাইয়া শেষে বলিতে লাগিল, "আমি শুনিয়াছিলাম চৈতন্যের লোকেরা অনেক বেশী খায়, তাহা অদ্য প্রত্যক্ষ করিলাম। সন্ন্যাসীকে ইহারা এত আহার করায়, ইহাতে বৈরাগ্য রক্ষা পাইবে না!" এইরূপ তাহার নিন্দা করিবার রীতি ছিল। সে বিনা নিমন্ত্রণে অপরের প্রস্তুত ভিক্ষান্নের ভাগ লইত।

চৈতন্যের প্রতি দিনের আহারের ব্যয় চারিপণ কড়ি নির্দ্দিষ্ট ছিল, তন্মধ্যে কাশীশ্বর এবং ভৃত্য গোবিন্দ প্রসাদ পাইতেন। প্রভু কি প্রণালীতে পান ভোজন শয়ন উপবেশন করেন, রামচন্দ্র তাহার অনুসন্ধানে রহিল। অন্য কোন দোষ না পাইয়া এক দিন বলিতেছে, "সন্ন্যাসী হইয়া এত মিষ্টান্ন খাইলে ইন্দ্রিয় দমন কিরূপে হইবে?" নানা কথা বলিয়া, সত্যকে মিথ্যারূপে ব্যাখ্যা করিয়া যেখানে সেখানে লোকের নিকট এইরূপে সে প্রভুর নিন্দা

করিয়া বেড়াইত, আবার প্রত্যহ তাঁহার আশ্রমেও আসিত। পুরীর বিদ্যা তিনি টের পাইয়াও গুরুকুল জ্ঞানে তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। এক দিন চৈতন্যের বাসগৃহে কতকগুলি পিপীলিকা দেখিয়া নিন্দুক রামচন্দ্র বলিতে লাগিল, "রাত্রাবত্র ঐক্ষবরসমাসীৎ তেন হেতুনা পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো! বিরক্তানাং সন্ন্যাসীনামিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ।" ইহার নিন্দার জ্বালায় নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রভু গোবিন্দকে বলিলেন, অদ্য হইতে পিণ্ডাভোগের একচতুর্থাংশ অন্ন এবং পাঁচগণ্ডা কড়ির ব্যঞ্জন আনিবে, ইহার অধিক আর আমাকে কিছু দিবে না; যদি দাও, তবে আর আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না। এ কথায় সকলের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পড়িল। রামচন্দ্রকে তাঁহারা বহু তিরস্কার ও ভৎর্সনা করিয়া বলিতে লাগিলেন. এই পাপিষ্ঠ হতভাগ্য সকলের প্রাণ নষ্ট করিবে। তদবধি কিছু দিন পর্য্যন্ত গৌর অর্দ্ধ ভোজন করিতে বাধ্য হন। সুতরাং শিষ্যদিগকেও তদনুসারে চলিতে হইল। ইহাতে রামচন্দ্রের উপর ভক্তগণের জঠরাগ্নিপ্রসূত অজস্র কোপাগ্নি বর্ষিত হইয়াছিল। এইরূপে কিছু দিন যায়, আর এক দিন সেই হতভাগ্য পরনিন্দক দুষ্ট আসিয়া ঠাকুরকে হাসিতে হাসিতে বলিতেছে, তোমাকে যে বড় ক্ষীণ দেখিতেছি? তুমি নাকি অর্দ্ধ ভোজন করিয়া থাক? এরূপ শুষ্ক বৈরাগ্যত সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে। যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিলে তবে যোগ সিদ্ধ হয়। এই জন্য গীতায় কথিত হইয়াছে, "যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।" নিরীহ স্বভাব কোমলহৃদয় গৌরচন্দ্র দুষ্টাশয় রামচন্দ্রের নিকট অবশেষে পরাস্ত হইয়া বলিলেন, আমি অজ্ঞ বালক, তোমার শিষ্যস্থানীয়, যাহা কিছু শিক্ষা দাও তাহাই সৌভাগ্য জ্ঞান করি। কয়েক দিন পরে সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ও ব্যক্তি বিশ্বনিন্দক, উহার কথায় শরীর ক্ষয় করিলে কি হইবে? প্রভু তখন অর্দ্ধেক অর্থাৎ দুই পণ কড়িতে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দিনান্তে রামচন্দ্রপুরী অন্যত্র প্রস্থান করিলে ভক্তগণ নির্ব্বিঘ্নে পূর্ব্ববৎ আহারাদি করিতে লাগিলেন। আপদ দূর হইয়া গেল দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন।

### চৈতন্যের বৈষয়িক নিরপেক্ষতা।

রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ক কোন এক জমিদারীর করসংগ্রাহক ছিলেন। অনেক টাকা বাকি পড়াতে

তাঁহার উপর রাজপুরুষেরা শাসন আরম্ভ করেন। অধিকন্তু রাজপুত্রকে উপেক্ষা করিয়া গোপীনাথ আরও বিপদাপন্ন হন। নীচে খাঁড়া পাতিয়া মাচার উপর হইতে গোপীনাথকে ফেলিয়া দেওয়া হইবে নগরমধ্যে এই জনরব উঠিল। ইহা শুনিয়া কোন লোক গৌরাঙ্গকে আসিয়া বলিল, এক্ষণে আপনি যদি রক্ষা করেন তবেইত গোপীনাথের প্রাণ বাঁচে, নতুবা রাজদণ্ডে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে। ভবানন্দ রায় সবংশে তোমার সেবক, তাহার পুত্রের এই বিপদ, এ বিষয়ে তোমার সাহায্য করা কর্ত্তব্য। তিনি সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ব'লিতে লাগিলেন, রাজার ইহাতে দোষ কি? রাজস্ব ভাঙ্গিযা গোপীনাথ বাবুগিরি করিয়াছে, দণ্ডভয় করে নাই, চতুর লোকেরা রাজকার্য্য করুক, আমি ইহার কিছু জানি না। রাজস্ব শোধ দিয়া যাহা থাকে তাহাই ব্যয় করা তাহার উচিত ছিল। ক্ষণকাল পরে আর এক জন আসিযা সংবাদ দিল, রাজানুচরগণ বাণীনাথ প্রভৃতিকেও বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। স্বরূপ দামোদরাদি ভক্তগণ নিতান্ত ভীত হইয়া প্রভুকে অনুরোধ করিলেন, রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী তোমার দাস, তাহাদের এই বিপদ দেখিয়া তোমার উদাসীন থাকা কি এখন ভাল দেখায়? চৈতন্য বলিলেন, রাজা আপনার পাওনা গণ্ডা লইবে, আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী হইয়া তাহার কি করিতে পারি? তবে তোমরা আজ্ঞা দাও আমি রাজ দ্বারে যাই, আঁচল পাতিয়া কড়ি ভিক্ষা করি! দুই লক্ষ কাহন কড়ি তাহার বাকি, ভিক্ষা করিলেই বা আমাকে তাহা কে দিবে? আমিত সন্ন্যাসী, পাঁচ গণ্ডার পাত্র! আবার এক জন লোক দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, গোপীনাথকে খাঁড়ার উপর ফেলিয়া দিতেছে। তখন সকলে নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া পুনর্ব্বার প্রভুকে ধরিয়া পড়িলেন যে তোমাকে ইহার কিছু করিতে হইবে। তিনি শেষ স্পষ্টাক্ষরে বলিতে বাধ্য হইলেন, "আমি ভিক্ষুক, আমা দ্বারা কিছু হইবে না, তোমরা জগন্নাথের চরণে ধর, তিনি ঈশ্বর এবং সকল কার্য্যের কর্ত্তা। অনন্তর হরিচন্দন পাত্র রাজাকে অনেক বলিয়া কহিয়া গোপীনাথকে সে বিপদ হইতে মুক্ত করেন। রাজা এ সকল সংবাদ জানিতেন না। শেষসংবাদদাতাকে গৌর এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন, রাজার লোক যখন বাণীনাথকে বাঁধিয়া লইয়া গেল তিনি তখন কি করিলেন? সে বলিল ঠাকুর, বাণীনাথ অবিশ্রান্ত কেবল হরিনাম জপে মগ্ন ছিলেন এবং জপ করিয়া সহস্র সংখ্যা পূরণ হইলে স্বীয়

অঙ্গে রেখা কাটিতেছিলেন। ইহা শুনিয়া প্রভুর মন অতিমাত্র পরিতুষ্ট হইল। কিয়ৎকাল পরে কাশীশ্বর মিশ্র আসিলে তিনি খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, দেখ মিশ্র, আমি আর এখানে থাকিতে পারিব না, আলালনাথে গিয়া থাকিব, এখানে বিষয় কার্য্যের বড় কোলাহল। আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, নির্জ্জনবাসী, আমার নিকট ভবানন্দ রায়ের লোক চারি বার আসিল। তাহারা নানা প্রকারে অর্থ ব্যয় করিয়া রাজার কর দিতে পারে না, শেষে আমাকে আসিয়া জানায়, তাহাতে আমার মনে দুঃখ হয়। জগন্নাথ এবার তাহাকে রক্ষা করিলেন, পুনরায় যদি সে রাজস্ব পরিশোধ না করে তখন কে রাখিবে? বিষয়ীর কথা শুনিয়া আমার মনে ক্ষোভ হয়, অতএব আমার এখানে আর থাকা পোষাইল না। কাশীমিশ্র বুঝাইয়া বলিলেন, তোমার সঙ্গে বিষয়ের কি সম্বন্ধ? বিষয়ের জন্য যে তোমার নিকট আসে সে অন্ধ এবং মূর্খ। তুমি স্বয়ংই ভক্তদিগের পুরস্কার। তোমার জন্য রামানন্দ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে। আপনার সুখ দুঃখের ভাগী আপনি হইয়া তোমার অনুগ্রহ যাহারা প্রার্থনা করে তাহারাই শুদ্ধ লোক। তুমি এখানে থাক, কেহ আর তোমাকে এ জন্য বিরক্ত করিবে না। কোন শিষ্যকে বিষয়সুখে সুখী করিতে চৈতন্য কখনই অভিলাষী হন নাই, বরং সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইতে অনেককে পরামর্শ দিয়াছিলেন। গুরু শিষ্যের মধ্যে বিষয়ঘটিত স্বার্থের কোন সংস্রব থাকা উচ্চ ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ। এই জন্য সামান্য পার্থিব কারণ উপলক্ষে চিরদিনের ধর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। পরিত্রাণের জন্যই গুরুর আবশ্যকতা, অর্থ সুখ মান সম্পদ লাভের স্থান পৃথিবীতে অনেক আছে। প্রাচীন কালের মুমুক্ষু শিষ্যগণ এ বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

পরে কাশীশ্বরেব মুখে রাজা এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হন, এবং গোপীনাথকে ঋণমুক্ত করিয়া তাঁহার বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেন। কাশীমিশ্রের নিকট এই সংবাদ পাইয়া প্রথমে গৌর বলিলেন, কি! তুমি আমাকে রাজপ্রতিগ্রহ করাইলে? শেষে যখন শুনিলেন রাজা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন তখন প্রভু তাঁহার বিনয় সদ্‌গুণের জন্য যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। কোন রাজা কি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট বিষয়সংক্রান্ত বাধ্যতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। ধন সম্পদ আপনা হইতে অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে পাইত না। বৈরাগীর

স্বাধীনতা কেমন উচ্চ ইহাতে বুঝা যায়। কয়েক দিবসান্তে গোপীনাথ বাণীনাথ প্রভৃতি পঞ্চপুত্র সহ ভবানন্দ রায় চৈতন্যের চরণে শরণাপন্ন হইয়া নিবেদন করিলেন, এবার প্রভু আমাকে বিষয় বন্ধন হইতে মুক্ত কর। তিনি কহিলেন, পঞ্চজনে সন্ন্যাসী হইলে তোমাদের বহু কুটুম্ব কে পোষণ করিবে? উদাসীন হও বা বিষয়কর্ম্ম কর, এই মাত্র আমার অনুরোধ, যেন রাজার মূলধন কেহ আত্মসাৎ না করেন। মূলধন রক্ষা করিয়া লাভ করিবে এবং তদ্দ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্মে সদ্ব্যয় করিবে, অসদ্ব্যয়ে দুই লোক বিনষ্ট হয়। সাংসারিক বিষয়ব্যাপারসম্বন্ধে চৈতন্য বড় নিরপেক্ষ ন্যায়বান্ ছিলেন। একবার অদ্বৈতের এক কর্ম্মচারী কমলাকান্ত বিশ্বাস রাজা প্রতাপরুদ্রকে মিথ্যা করিয়া লিখিয়াছিল যে, অদ্বৈত গোস্বামী ঈশ্বর, এবং তাঁহার কিছু ঋণ হইয়াছে, অতএব তিন শত টাকা পাঠাইবে। সেই পত্র প্রভুর হাতে পড়ে, তিনি তাহা পড়িয়া বড় দুঃখিত হন এবং কমলাকান্তকে শাসন করেন।

### সেবকদত্ত উপহার গ্রহণ।

প্রতি বর্ষে বর্ষে গৌড়বাসী প্রধান প্রধান ভক্তগণ যখন রথযাত্রার সময় নীলাচলে আসিয়া চৈতন্যসহবাসে চারি মাস কাল থাকিতেন তখন প্রত্যেকে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন, এবং তজ্জন্য আসিবার কালে প্রভুর প্রিয় বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে আনিতেন। এ বিষয়ে পাণিহাটীর রাঘব পণ্ডিত বিশেষ রসগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার পত্নী দময়ন্তী অতি পারিপাটি করিয়া ভক্তির সহিত নানাবিধ আচার বড়ি মিষ্টান্ন মসলা শুক্তপাতা দ্বারা পেটারা সাজাইয়া দিতেন। রাঘবের ঝাল প্রসিদ্ধ ছিল। অনেক বিধ সামগ্রী তিনি লইয়া আসিতেন। প্রত্যেকেই এক একটি উপাদেয় বস্তু ভৃত্য গোবিন্দের হাতে দিয়া অনুরোধ করিতেন যেন তাহা প্রভুর সেবায় ব্যবহৃত হয়। এইরূপে ক্রমে রাশীকৃত দ্রব্য সঞ্চিত হইয়া যাইত। সে সকল জিনিষ গৌরের খাইবার অবসর হইত না। গোবিন্দ এক দিন বলিল, সকলেই আমাকে এ জন্য ব্যস্ত করে, ভক্তগণের প্রেমের উপহার গ্রহণ না করিলে তাহাদের মনে বড় দুঃখ হইবে। এক দিন উৎসাহের সহিত গৌরচন্দ্র সমুদয় দ্রব্য হইতে কিছু কিছু আহার করিলেন, তন্মধ্যে বাসি পুরাতন বিস্বাদু সকল প্রকারই ছিল। এরূপ ভোজনে কেবল অনাসক্তিরই পরিচয় প্রদান করে।

### গোবিন্দের প্রভুভক্তি।

ভৃত্য গোবিন্দ এক জন পরম ভক্ত, সে প্রতি দিন প্রভুর পদসেবা করিয়া তিনি ঘুমাইলে তবে আপনি আহার করিতে যাইত। এক দিন চৈতন্য নাম সঙ্কীর্ত্তনের অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া দরজায় আড় হইয়া পড়িয়া রহিলেন, কিছুতেই পথ ছাড়িয়া দেন না, ভৃত্যের সঙ্গে আমোদ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ আর কিছুতেই ভিতরে যাইবার পথ পায় না, শেষ বহির্ব্বাস খানি তাঁহার বুকের উপর রাখিয়া উপর দিয়া ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক পদসেবা আরম্ভ করিল, কিন্তু আহারের জন্য প্রভুর দেহ লঙ্ঘন করিয়া আর আসিতে পারিল না। নিদ্রাভঙ্গের পর গৌর তাহাকে বলিলেন, এখনও তুমি বসিয়া কেন? আহার করিলে না? গোবিন্দ বলিল, যাই কিরূপে? তুমি যে পথরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে ভিতরে আসিলে কিরূপে? সেবা করা আমার ব্রত, তাহাতে নরক হউক আর যাহা হউক, তোমার উপর দিয়া আসিলাম, কিন্তু নিজপ্রয়োজন সাধনের জন্য সেরূপত পারি না, গোবিন্দ এই প্রকার উত্তর দিয়া আহার করিতে গেল। নীলাচলে গোবিন্দ এবং স্বরূপ এই দুই জন তাঁহার সদাকালের সঙ্গী ছিলেন। ভৃত্য গোবিন্দ এক জন ভক্তের মধ্যে গণ্য। সাধু মহাজনদিগের সকল দিকই মিষ্ট রসে পূর্ণ। তাঁহাদের সংযোগে লৌহও স্বর্ণের রূপ ধারণ করে। প্রতি পাদবিক্ষেপ, প্রতি নিশ্বাস, মুখের প্রত্যেক কথাটি, স্নানাহার নিদ্রা সমস্ত যেন সুধারসে পরিপূর্ণ।

### হরিদাসের লীলাসংবরণ।

গোবিন্দ এক দিন প্রসাদ দিবার জন্য হরিদাসের আশ্রমে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, আমি কিরূপে প্রসাদ ভক্ষণ করিব, নামের সংখ্যা পূরণ হয় নাই; এই বলিয়া কণিকামাত্র প্রসাদ গ্রহণ করত উপবাসী রহিলেন। অপর দিবসে গৌরাঙ্গ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিদাস, সুস্থ আছত? তিনি প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, শরীর সুস্থ বটে, কিন্তু মন বড় অসুখী, নামজপের সংখ্যা পূর্ণ হইতেছে না। তাহা শুনিয়া প্রভু কহিলেন, তুমি এখন প্রাচীন হইয়াছ, সংখ্যা হ্রাস কর। সিদ্ধদেহ পাইয়া এখন সাধনের জন্য এত আগ্রহই বা কি জন্য? নামের মহিমাত প্রচার করিলে, আর কেন? সংখ্যা কমাইয়া লও। হরিদাস মিনতি করিয়া বলিলেন, আমি হীন জাতি, অস্পৃশ্য, তুমি আমার প্রতি অনেক দয়া করিয়াছ; ম্লেচ্ছ

হইয়া বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র পর্য্যন্ত আমি খাইলাম; এক্ষণে আমার এই বাঞ্ছা যে তোমার লীলা সংবরণের পূর্ব্বে যেন আমি দেহত্যাগ করিতে পারি। তোমার ঐ চন্দ্রবদন দেখিয়া এবং পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া যেন আমার মৃত্যু হয়। আমি বুঝিতেছি, তোমার লীলা শীঘ্র শেষ হইবে। তাহার পূর্ব্বে আমাকে বিদায় দাও। ফলতঃ হরিদাস এ সময় অতিশয় স্থবির হইয়া পড়িয়াছিলেন। গৌর বলিলেন, কৃপাময় হরি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন, কিন্তু তোমাকে লইয়াই আমার সুখ, আমাকে ছাড়িয়া তুমি আগেই যাইবে? হরিদাস কাতর হইয়া প্রভুর চরণে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, আমার মস্তকের মণি স্বরূপ কত কত মহাত্মা তোমার লীলার সহায় থাকিলেন। একটি পিপীলিকা মরিলে পৃথিবীর আর কি ক্ষতি হইবে? বৃদ্ধের ইচ্ছানুসারে পর দিন প্রাতে চৈতন্যদেব ভক্তগণসঙ্গে হরিদাসের কুটীরে উপনীত হইয়া তাঁহার প্রতি শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন। প্রথমে মৃত্যুশয্যার চারিদিকে দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনের সঙ্গে হরিদাসের গুণ বর্ণনা করত প্রভু নাচিতে লাগিলেন, এবং আর সকলে সেই মুমূর্ষপ্রায় প্রাচীন সাধুর চরণধূলি লইতে লাগিলেন। এইরূপে হরিসঙ্কীর্ত্তনের সুবিমল পবিত্র হিল্লোলের মধ্যে গৌরচন্দ্রের সম্মুখে হরিনাম করিতে করিতে হরিদাসের প্রাণ বিয়োগ হইল। এমন সুখের মৃত্যু প্রায় কাহারো ভাগ্যে ঘটে না। তাঁহার মৃতদেহ কোলে লইয়া মহাপ্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তে ভক্তে কেমন স্বজাতীয়ত্ব এবং কুটুম্বিতার সম্বন্ধ তাহা চৈতন্য হরিদাসের মৃত্যুতে দেখাইয়াছেন। অতঃপর সেই দেহ সংস্কারপূর্ব্বক বালুকা খনন করত তন্মধ্যে প্রোথিত করা হয়। হরিনামসাধক হরিদাসের জীবন মৃত্যু ও সাধন ভজন সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে এক হরিনামেরই প্রাধান্য লক্ষিত হইয়াছে। সমাধিকার্য্য সমাপনান্তে সাগরজলে স্নান করিয়া ভক্তপ্রাণ গৌরচন্দ্র নিজে দোকানে দোকানে ভিক্ষা করিয়া হরিদাসের মহোৎসব করিলেন। এই মহোৎসবের জন্য তিনি আপনি ভিক্ষা করিয়া তাহা দ্বারা স্বহস্তে বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করান। হরিদাসের প্রতি শ্রীচৈতন্যের দয়া স্নেহ, প্রেম শ্রদ্ধা আত্মীয়তা একটি অতীব প্রীতিকর সদ্দৃষ্টান্ত।

### স্বদেশস্থ বন্ধুগণের প্রতি গৌরের কৃতজ্ঞতা।

নিত্যানন্দের প্রতি আদেশ যে তিনি বঙ্গদেশে থাকিয়া দ্বারে দ্বারে

কেবল নাম প্রচার করিবেন। কিন্তু তিনি মধ্যে মধ্যে একবার গৌরকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, রথযাত্রীদিগের সঙ্গে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। এখানে উভয়ে নিভৃতে বসিয়া অনেক গূঢ় কথাবার্ত্তা হইত। শিবানন্দ সেন পথের মধ্যে যাত্রী সকলের নিমিত্ত বাসা এবং আহারাদির আয়োজন করিয়া দিতেন। এক দিন এ বিষয়ের যোগাযোগ হইয়া উঠে নাই, তজ্জন্য নিতাই মহা উত্তেজিত হইয়া শিবানন্দকে গালি দিতে দিতে বলিলেন, তোর ছেলে মরুক! তাহা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিল। অবশেষে নিতাই শিবানন্দকে এক লাথি মারিলেন। লাথি খাইয়া তাঁহার আহ্লাদ বৃদ্ধি হইল, আপনাকে তিনি কৃতার্থ বোধ করিলেন। এ বৎসর অন্য যাত্রীদিগের মধ্যে পরমেশ্বর মোদক ছিল। মোদকের নিকট গৌর বালককালে অনেক মিষ্টান্ন খাইয়াছেন। তাহার প্রতি প্রভু যথেষ্ট ভালবাসা দেখাইলেন। মুকুন্দের মাতা আসিয়াছে তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠেন। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এমনি শাসন ছিল যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরিবার সকল দূরে থাকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিত। প্রতি বৎসর সকলে কষ্ট পাইয়া যাওয়া আসা করেন, এজন্য চৈতন্য প্রভু এক দিন মিনতি করিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, তোমাদের পথকষ্ট দেখিয়া বার বার আসিতে নিষেধ করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমি বড় সুখ পাই। নিতাই আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াও এখানে আসেন। আচার্য্য গোস্বামীর আমার প্রতি বড় কৃপা। এই খানে বসিয়াই আমি তোমাদের দেখা পাই, একটু পরিশ্রম করিতে হয় না, আমি দীন দরিদ্র সন্ন্যাসী কিরূপে তোমাদের এ ঋণ পরিশোধ করিব জানি না। দেহমাত্র ধন আছে তাহাই সমর্পণ করিলাম, যেখানে ইচ্ছা সেখানে ইহা তোমরা বিক্রয় কর, এই বলিয়া ভাবাবিষ্ট হৃদয়ে কম্পিত কলেবরে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন; তাঁহারাও সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইলেন। প্রতি বর্ষে বর্ষে মিলন ও বিচ্ছেদের সময় প্রায় এইরূপ ভাবের তরঙ্গ উঠিত। গৌড়ের ভক্তগণ বিদায় হইলে পুনরায় তাঁহার প্রেমবিরহানল আবার প্রবল হইল।

### জগদানন্দের অভিমানভঞ্জন।

একবার চৈতন্য প্রভু প্রিয়শিষ্য জগদানন্দ পণ্ডিতকে শচীর নিকট প্রেরণ করেন। ইনি গুরুদেবকে কিঞ্চিৎ সুখস্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য বিশেষ

অনুরাগী ছিলেন। নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় এক কলস চন্দনাদ তৈল অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত করিয়া আনেন। গৌর সময়ে সময়ে প্রিয়বিরহোত্তাপে অতিশয় ক্লেশ পাইতেন। তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য এই স্নিগ্ধ তৈল গোবিন্দের হস্তে দিয়া ইহা ব্যবহার জন্য পণ্ডিত তাহাকে অনুরোধ করিলেন। গোবিন্দ এ কথা প্রভুকে জানাইল। তিনি বলিলেন, সন্ন্যাসীর তৈলে কোন অধিকার নাই বিশেষতঃ সুগন্ধি তৈল, ইহা জগন্নাথের প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য দিতে বল, তাহার পরিশ্রম সফল হইবে। জগদানন্দের মন সে কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইল। পুনর্বার তিনি গোবিন্দ দ্বারা এ জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। তখন গৌর সুন্দর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তবে তৈল মর্দ্দনের জন্য এক জন ভৃত্য নিযুক্ত কর! এই জন্য আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি কি না! তোমাদের পরিহাস, আমার সর্ব্বনাশ। তৈলের গন্ধ পাইয়া পথের লোকেরা বলুক যে এই সন্ন্যাসী বিবাহিত, বিলাসপরায়ণ! গোবিন্দ নিস্তব্ধ হইল। পর দিন প্রাতে জগদানন্দকে দেখিয়া প্রভু বলিলেন, তুমি সেই তৈল কলসটি জগন্নাথের প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য দাও, শ্রম সফল হইবে। পণ্ডিত অভিমানভরে কহিলেন, কে তোমাকে এ কথা বলিয়াছে যে আমি তৈল আনিয়াছি? এই বলিয়া কলসটি ঘর হইতে উঠানে বাহির করিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া তিন দিন ঘরে দুয়ার দিয়া তিনি উপবাসী রহিলেন। জগদানন্দের এরূপ অভিমান নূতন নহে। অনন্তর তাঁহার সন্তোষের জন্য চৈতন্য নিজে গিয়া তাঁহার অভিমান ভঞ্জন করেন এবং আপনা হইতে তাঁহার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ লয়েন। পণ্ডিত তখন আহ্লাদিত হইয়া স্বহস্তে নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করত বহু সমাদরে গুরুদেবকে অন্ন পরিবেশন করিলেন। তিনি বলিলেন, তোমাকেও একসঙ্গে আজ বসিতে হইবে। জগদানন্দ কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার হস্তের পবিত্র অন্ন ব্যঞ্জন খাইয়া গৌর বলিতে লাগিলেন, ক্রোধাবেশের রন্ধন বড় উত্তম হয়! তদনন্তর তিনি সে দিন নিজে সেখানে বসিয়া থাকিয়া বিশেষ অনুরোধ করিয়া পণ্ডিতকে ভোজন করাইয়া আসেন। চৈতন্যের শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই নিরামিষ ব্যঞ্জন ভাল রাঁধিতে পারিতেন। সামান্য সুলভ সামগ্রী অথচ পরিষ্কার শুদ্ধ, এরূপ আহার্য্য বস্তু গৌরের অতিশয় প্রিয় ছিল। আহার বিলাস ভোগের জন্য ইহা তিনি মনে করিতেন না, ভক্তি প্রেম

বৈরাগ্যের সঙ্গে ইহার বিলক্ষণ যোগ ছিল। আহারকালীন অন্নের সুঘ্রাণ পাইলে তাঁহার ভক্তির উচ্ছ্বাস হইত। সুখত্যাগী বৈরাগী শিষ্যগণ সামান্য বস্তু রন্ধনপূর্ব্বক আহার করিতেন, তাহা দেখিয়া প্রভু আপনা হইতে তাঁহাদিগের বাসায় গিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে আসিতেন। একবার গদাধরের হাতে কচি তেঁতুলপাতার অন্ন খাইয়া অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৈরাগ্য উদ্দীপনের আহার্য্য তাঁহার লোভের বিষয় ছিল। যে সকল সামগ্রী পাতের কাছে থাকিলে তোমার আমার ক্রোধ বিরক্তি উত্তেজিত হয়, তাঁহার তাহাতে মহা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার উদয় হইত। শেষাবস্থায় প্রেমের উত্তেজনায় প্রভুর শরীর কিছু কৃষ হয়। কদলিবৃক্ষশাখার শয্যায় তিনি শয়ন করিতেন, এজন্য অস্থিতে বেদনা লাগিত, কিন্তু সে বেদনা অনুভব হইত জগদানন্দের হৃদয়ে। পণ্ডিত ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া এক দিন সূক্ষ্ম গেরুয়া বসনে তুলা পুরিয়া তদ্দ্বারা বালিশ তোষক প্রস্তুত করিয়া গৌরাঙ্গের হস্তে সমর্পণ করিলেন। প্রথমে ইহা দেখিবামাত্র প্রভু বিরক্ত হইলেন, এবং পরিহাস পূর্ব্বক বলিলেন, তবে একখান খাট আন! পরে যখন শুনিলেন ইহা জগদানন্দের কার্য্য, তখন চুপ করিয়া রহিলেন; কিন্তু সে শয্যা স্পর্শও করিলেন না। পরিশেষে অনেকের উপরোধে বহির্ব্বাসাবৃত ছিন্ন কদলিপত্রের শয্যায় শয়ন করিতেন।

### কোন নারীর সঙ্গীতে প্রভুর মুগ্ধ হওন।

এক দিন মহাপ্রভু যমেশ্বর টোটায় যাইতেছিলেন, পথের মধ্যে এক স্থানে হঠাৎ বামাকণ্ঠের মধুর ধ্বনি তাঁহার কর্ণকে আঘাত করিল। রমণীকণ্ঠ বিনিঃসৃত জগন্নাথের গুণসঙ্গীত শুনিয়া তিনি বাতুলের ন্যায় তাহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। সঙ্গে কেবল প্রিয়ভৃত্য গোবিন্দ মাত্র ছিল। সঙ্গীতের স্বর লক্ষ্য করিয়া তিনি অন্ধের মত বিপথে চলিতে লাগিলেন, কোথায় কোন্ দিকে যাইতেছেন কিছুই বোধ নাই, একবারে যেন পাগল হইয়া পড়িলেন। পদতলে মনসা সিজুর সুতীক্ষ্ণ কাঁটা ফুটিতে লাগিল তাহাও জ্ঞান নাই। এমন সময় "স্ত্রীলোকের গান" এই বলিয়া গোবিন্দ তাঁহাকে কোলে চাপিয়া ধরিল। স্ত্রীলোক, এই শব্দ শুনিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ গৌরের প্রেমসুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া গেল। তখন জাগ্রত হইয়া গোবিন্দকে আশীর্ব্বাদ করত বলিলেন, আজ তুমি আমার জীবন রক্ষা করিলে, নতুবা স্ত্রীস্পর্শ হইলে আমার প্রাণ বিয়োগ হইত। তোমার ঋণ অপরিশোধনীয়, তুমি

সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকিয়া সাবধান করিয়া দিও। স্ত্রীঅঙ্গস্পর্শ দূরে থাকুক, তাহা দর্শন সম্বন্ধে চৈতন্তের অতিশয় কঠোর নিয়ম ছিল। যদিও প্রেমোন্মত্ততার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থল, ভাবরসের অদ্বিতীয় আদর্শ, কিন্তু নীতি পবিত্রতা বৈরাগ্য বিরতি বিষয়ে প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের স্থায় তিনি অতি কঠোর ব্রত পালন করিতেন। তাদৃশ প্রেমাবেশ, তথাপি "স্ত্রীলোকের গান" এই শব্দ শুনিবামাত্র নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, ইহা কি সহজ সতর্কতা!

### ভট্ট রঘুনাথ।

কাশীবাসী তপনমিশ্রের পুত্র ভট্ট রঘুনাথও একজন পরম বৈরাগী ছিলেন। তিনি এই সময় গৌড়ের রামদাস বিশ্বাস নামক জনৈক সম্রান্ত বিষয়ীর সঙ্গে পথে মিলিয়া গৌরসন্নিধানে উপনীত হন। আট মাস কাল রঘুনাথকে নিকটে রাখিয়া প্রভু এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন, অবিবাহিত থাকিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা কর, বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন কর, এবং আর একবার এখানে আসিও। পরে তিনি বৃন্দাবনে গিয়া রূপ সনাতনের সঙ্গের সঙ্গী হন। ভট্ট রঘুনাথ প্রতি দিন সহস্র বৈষ্ণবকে প্রণাম করিয়া লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। তিনি এক জন অতি নিষ্ঠাযুক্ত প্রধান সাধুর মধ্যে গণনীয়।

### কোন নারীর একাগ্রতা।

একদিন গৌরাঙ্গ জগন্নাথের মন্দিরমধ্যে গরুড়ের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া ঠাকুর দর্শন করিতেছেন, লোকের অত্যন্ত ভিড় হইয়াছে, একটী দেবদর্শনপিপাসু উড়িয়া স্ত্রী নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই জনতার ভিতর গরুড়ের উপর এক পা এবং গৌরের স্কন্ধের উপর আর এক পা রাখিয়া জগন্নাথ দেখিতে লাগিল। গোবিন্দ তাহাকে তিরস্কার করাতে সে ভীত হইয়া পরে প্রভুর চরণধূলি গ্রহণ করে। কিন্তু চৈতন্ত বলিয়াছিলেন, "আহা! উহাকে কিছু বলিও না, আশানিবৃত্ত করিয়া ঠাকুর দেখিতে দাও; ইহার যেমন ব্যাকুলতা আগ্রহ আমার তেমন নাই। এই নারী ভাগ্যবতী, আমি ইহার চরণ বন্দনা করি, আমার যেন এইরূপ আর্ত্তি হয়।" ক্ষণকাল পরে সচকিত হইয়া তিনি দূরে প্রস্থান করিলেন।

### প্রভুর প্রেমবিকার।

শেষ অবস্থায় চৈতন্তের বিরহোন্মাদ এবং প্রেমবিকার এমন বৃদ্ধি হইয়া পড়িল যে তাঁহার কিছুই আর জ্ঞানগোচর থাকিত না, অভ্যাসের গুণে

কেবল স্নান আহার ঠাকুর দর্শন করিতেন মাত্র। ক্রমে মহাভাবময়ী ভক্তির লক্ষণ সকল শেষ সীমায় উপনীত হইতে লাগিল। বিহ্বল হইয়া কেবল হাহাকার করেন, স্বরূপ ও রামানন্দের গলা ধরিয়া কাঁদেন; তাঁহাদের মুখে প্রেমলীলা শ্রবণ করিয়া এক এক বার স্থির হইয়া থাকিতেন। এক দিন রাত্রে শুইয়া আছেন, চক্ষে নিদ্রাত প্রায় ছিলই না,—সমস্ত যামিনী নাম জপ ও কীর্ত্তন করিতেন,—খানিক রাত্রে আর কিছু সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। গোবিন্দ দ্বার খুলিয়া দেখিল প্রভু নাই, মহাব্যাকুল হইয়া সকলে চারিদিক্ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, প্রভু সিংহদ্বারে মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। মত্ততার দুর্জ্জয় বিকারে শরীর দীর্ঘাকার, অস্থির গ্রন্থি শিথিল, জ্ঞান চৈতন্যবিহীন দেখিয়া সকলে মিলে তাঁহার কর্ণমূলে উচ্চরবে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ করিতে করিতে প্রভুর চেতনা লাভ হইল, তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন। এক দিন হঠাৎ উঠিয়া চটক পর্ব্বতের দিকে এমনি বায়ুবেগে ধাবিত হইলেন যে কেহ আর ধরিতে পারে না। সে দিনকার দৃশ্য আর এক প্রকার। প্রত্যেক লোমকূপে রক্তবর্ণ ব্রণ উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে রুধিরধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল, শরীর কদম্বাকৃতি হইল, কণ্ঠে ঘর্ঘর শব্দ, মুখে বাক্য নাই, দুই চক্ষে অনবরত জল ঝরিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ, শেষ কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পতিত হইলেন। গোবিন্দ ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে জল সিঞ্চন করিয়া বাতাস করিতে লাগিল, সকলে কাঁদিয়া অস্থির হইলেন; পুনঃ পুনঃ অঙ্গে জলসেক করিয়া, কর্ণে হরিনাম শুনাইয়া বহু কষ্টে সে দিন চৈতন্য সম্পাদন করা হয়। মহাভাবের এই সকল অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ এ পৃথিবীতে অতি বিরল দৃশ্য। তদনন্তর জ্ঞান লাভ করিয়া সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় চারিদিকে চাহিয়া গৌর বলিলেন, এখানে আমি কিরূপে আসিলাম? কোন্ ভাবের প্রাবল্যহেতু সে প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছিল পরে তাহা সমস্ত বর্ণন করিলেন। আর এক দিন সকলের অগোচরে বহির্গমন করিয়া কুম্মাণ্ডাকৃতি হইয়া পথের মধ্যে মাংসপিণ্ডের ন্যায় পড়িয়াছিলেন, অনেক অনুসন্ধানের পর তবে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। হরি বলিয়া কাণের কাছে চীৎকার করিলে তবে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইত। ভাবাবেশে মত্ত হইয়া একবার কূপের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলেন। শরীরের পঞ্চেন্দ্রিয় এক সময় পূর্ণমাত্রায় স্ব স্ব বিষয় ভোগের জন্য অধৈর্য্য হইলে মনের যেরূপ অবস্থা হয়, তেমনি তাঁহার দর্শন, আলিঙ্গন, প্রেমরস

পান ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ক্ষুধা পিপাসা সমস্ত বলিষ্ঠ অশ্বের ন্যায় এক সময় নানাদিকে ধাবিত হইত। এত বড় প্রেমিক অদ্বিতীয় ভক্ত হইয়া চৈতন্যদেব এরূপ বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতেন ইহা সহসা মনে হইলে কিছু আশ্চর্য্যজনক বোধ হয়, কিন্তু তাহার অন্য কোন কারণ নাই। ভগবানের ঐশ্বর্য্য অনন্ত, রূপগুণে তিনি অসীম, ভক্তের সীমাবদ্ধ হৃদয় তাহা কত ধারণ করিবে? যতই উন্নতি ততই লালসা আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। হরিপদারবিন্দের মকরন্দ লোভে তাঁহার চিত্তভৃঙ্গ নিরন্তর উন্মত্ত থাকিত; মস্তিষ্ক সেই পদকমলের মধুর আঘ্রাণে সর্ব্বক্ষণ বিঘূর্ণিত হইত; এবং হৃদয় সেই পরম প্রভুর চরণালিঙ্গনের জন্য অবিশ্রান্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। কিছু দিন পরে রথযাত্রার সময় গৌড়ের ভক্তগণ নীলাচলে আসিলেন, তখন ঐ সকল মহাভাবের উত্তেজনা কিছু নরম পড়িল।

### কালিদাসের কথা।

রঘুনাথ দাসের পিতৃব্য কালিদাস কিছু দিন পরে বৈরাগী হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের পথ অনুসরণ করেন। এ ব্যক্তি কেবল বৈষ্ণবের পাত্রাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট খাইয়া ভক্তি উপার্জ্জন করে। বৈষ্ণব গৃহস্থদিগকে তিনি উত্তম সামগ্রী উপহার দিয়া পরে তাহাদের বাটীতে প্রসাদ খাইয়া আসিতেন। কেহ কোন আপত্তি করিলে গোপনে তাহার আঁস্তাকুড় হইতে পাত কুড়াইয়া খাইতেন। এইরূপে গৌড়ের শত শত সাধুর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া শেষে নীলাচলে প্রভুসমীপে কালিদাস উপস্থিত হন। বৈষ্ণবের প্রসাদ ভক্ষণে তাহার এমনি আস্থা ছিল যে, ঝড়ুঠাকুর নামে এক ভূঁইমালি জাতীয় বৈষ্ণবকে অন্ন উপহার দিয়া পরে লুক্কায়িতভাবে তাহার এবং তাহার পত্নীর পরিত্যক্ত খোসা ও আঁঠি ইনি চুষিয়া খান। কালিদাসকে গৌরাঙ্গ যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। বৈরাগী হইতে হইলে কত দূর অভিমানশূন্যতা, দীনতা আবশ্যক কালিদাস তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

### সৎপ্রসঙ্গ।

চৈতন্য জননীর তত্ত্ব লইবার জন্য প্রায় বর্ষে বর্ষে হয় জগদানন্দ, না হয় দামোদরকে নবদ্বীপে পাঠাইতেন। তিনি যখন কাহারো কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহার অর্থ এই ছিল যে, সে ব্যক্তির ভক্তি আছে কি না। একবার দামোদরকে জিজ্ঞাসা করেন, মাতার বিষ্ণুভক্তি কিরূপ দেখিলে বল? স্পষ্টবক্তা দামোদর এ জন্য গৌরকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন,

শচীর ভক্তির কথা আবার তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ? তাঁহার প্রসাদেইত তোমার ভক্তি? চৈতন্য ইহা শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভক্তিমান্ ব্যক্তিকেই তিনি ধনবন্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন, তদ্ভিন্ন অভক্ত জীব তাঁহার মতে সকলেই দরিদ্র। উড়িয়া এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিত। কেহ নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে তিনি বলিতেন, যাও আগে তুমি লক্ষেশ্বর হও, যে লক্ষপতি তাহার গৃহেই আমার ভিক্ষা হয়। ইহা শ্রবণে এক দিন কেহ কেহ বলিলেন ঠাকুর, লক্ষ দূরের কথা, সহস্রও কাহারো ঘরে নাই। তুমি যদি নিমন্ত্রণ গ্রহণ না কর, তবে আমাদের গৃহাশ্রম পুড়িয়া ছারখার হউক! গৌরচন্দ্র বলিলেন, কাহাকে আমি লক্ষেশ্বর বলি তাহা কি জান? প্রতি দিন যে ব্যক্তি লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করে তাহাকেই আমি লক্ষেশ্বর বলি, তাহারই গৃহে আমার ভিক্ষা হয়, অন্য ঘরে আমি যাই না। তাঁহাকে আহার করাইবার জন্য অনেকে লক্ষ হরিনাম জপের ব্রত গ্রহণ করিলেন, চৈতন্যেরও উদ্দেশ্য সফল হইল। লৌকিক ভাবে অসার সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিতেন না। হরিনাম আর ভক্তি, ইহা ছাড়া তাঁহার মুখে অন্য কথা ছিল না।

অবতারত্বের প্রতিবাদ।

এক দিন সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া বৃদ্ধ অদ্বৈত গোসাঞী বলিলেন, এস ভাই, আজ প্রাণ ভরিয়া চৈতন্যাবতারের মহিমা গান করি। যিনি সঙ্কীর্ত্তন প্রচার দ্বারা আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন, যাঁহার প্রসাদে আমরাও সর্ব্ব-পূজিত হইলাম, এস অদ্য তাঁহার গুণ সকলে মিলিয়া গাই। কোন প্রকার প্রশংসাসূচক কথা কিংবা গান শুনিলে গৌরাঙ্গ প্রভু বিরক্ত হইতেন তাহা অনেকে জানিতেন, এই জন্য ভয়ে সকলে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু শেষ প্রাচীন সাধুর অনুরোধ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে হইল। অদ্বৈত নিজেই এক নূতন পদ রচনা করিয়া উৎসাহের সহিত ভক্তসঙ্গে তাহা গাইতে লাগিলেন। ইহাতে সকলের বিশেষ আমোদ বোধ হইল। কীর্ত্তনের মহাধ্বনি শ্রবণে গৌর তথায় উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তগণের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। আনন্দের বেগে ভয় লজ্জা সমস্ত বিলুপ্ত হইল। শেষে তাঁহার সম্মুখেই এই গান সকলে গাইতে লাগিলেন। দাস্য ও মধুর ভাবই চৈতন্যের ধর্ম্ম, দাস ভিন্ন ঈশ্বর বলিয়া তাঁহাকে কেহ সম্বোধন করিতে পারিত না, তথাপি অদ্বৈতের চক্রে পড়িয়া সে দিন এই প্রকার

ঘটনা হয়। চৈতন্য যখন তাঁহার নিজের স্তুতিবাদ শুনিলেন, তখন লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়া আপনার বাসায় ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর সঙ্কীর্ত্তন শেষ করিয়া বৈষ্ণব সাধুগণ প্রভুর আশ্রমে উপস্থিত হন। তিনি তখন রাগ করিয়া ঘরের মধ্যে শুইয়াছিলেন। বন্ধুদিগকে নিকটে সমাগত দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "ওহে শ্রীবাস পণ্ডিত! আজ তোমরা ভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তন না করিয়া কি গান গাইলে বুঝাইয়া বল দেখি শুনি?" অন্য সকলে তাঁহার ভাবগতি দেখিয়া ভীত হইল, কিন্তু শ্রীবাস আকাশের দিকে করতল বিস্তার করিয়া বলিলেন, সূর্য্যের প্রকাশ কি কখন হস্তে আচ্ছাদিত হয়? এমন সময় ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট এবং অন্যান্য স্থানের শত শত যাত্রী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া গৌরগুণ সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল, মহা ধুম উঠিল, তাহা দেখিয়া শুনিয়া বৈষ্ণবেরা হাসিতে লাগিলেন। শ্রীবাস বলিলেন, এখন কি করিবে? আমিত আর এ সকল লোককে ডাকিতে যাই নাই! উহারা কি বলিতেছে শুন দেখি? তখন প্রভু নির্ব্বাক্ হইলেন। গৌরভক্তগণের এ প্রকার করিবার কারণ কি তাহা সহজেই বুঝা যায়। গুরু শিষ্যে এই স্থলেই ভয়ানক প্রভেদ ঘটে। এ সকল ব্যবহার দেখিলে সহজেই মনে হয়, তবে কি চৈতন্য প্রভু অপেক্ষা ইহাঁরা বেশী জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক হইলেন? মনুষ্যে ঈশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাব, আর স্বয়ং ঈশ্বর এই উভয়ের প্রভেদ লোক সাধারণতঃ বুঝিয়া উঠিতে পারে না, এই জন্য তাহারা সাধু মহাপুরুষদিগকে অন্য কোন শব্দে এবং ভাবে প্রশংসা করিয়া তৃপ্ত না হইয়া শেষ ঈশ্বর বলিয়া মনঃ ক্ষোভ দূর করে। কিন্তু ঈশ্বররূপে গৃহীত ঐ সকল ভক্ত মহাজনেরা যেমন জীবের ক্ষুদ্রত্ব এবং ভগবানের মহত্ব এই দুয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারেন, এমন আর কেহ পারে না। সুতরাং তাঁহারা যেমন ইহার প্রতিবাদ করেন এমন কে করিতে পারে? যাঁহারা ভগবানের অনুপম গৌরব দেখিয়াছেন, তাঁহারাই মনুষ্যের হীনতা পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছেন, এই নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাহা শুনিবে কে? তিনি যদি এক গুণ বিনয় প্রকাশ করেন, শিষ্যগণ সহস্র গুণ করিয়া তাঁহাকে বাড়াইয়া তোলে; একা তিনি কি করিবেন?

একবার পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নীলাচলে আসিয়াছিলেন। এখানে অন্ন-বিচার নাই দেখিয়া তিনি বলেন, ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্ম হইয়াছে না কি?

গৌরাঙ্গের শিষ্যগণ শাস্ত্রের বিধি নিষেধ বড় গ্রাহ্য করিতেন না। ভক্ত-চূড়ামণির নিকট থাকিয়া এ বিষয়ে তাঁহারা যথেষ্ট প্রশ্রয় পাইয়াছিলেন।

# মহাপ্রভুর লীলাসমাপ্তি।

চৈতন্যদেবের শেষ জীবনের অভূতপূর্ব্ব বিচিত্র ভাব সকল দেখিয়া প্রধানতম ভক্তগণ পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতেন, স্বয়ং ভগবানই ভক্তের আনন্দ এবং সুখ সম্ভোগের জন্য গৌরদেহে ভক্তা-বতার হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা বাস্তবিক কথাই বটে। মানব-জীবনে এরূপ অসামান্য ধর্ম্মোন্মত্ততা কেহ কখন দেখে নাই, এই জন্য লোকে তাহা কি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবে কিছু বুঝিতে পারিত না। ফলতঃ জীব যখন ভগবানের একান্ত অনুগত হয়, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন আর ভেদাভেদ জ্ঞান বড় থাকে না; যেন অগাধ সিন্ধুনীরে স্রোতঃস্বতী মিলিয়া গিয়াছে এইরূপ মনে হয়। সে ভাবের মানুষ যাহা বলে এবং যাহা করে তাহা অলৌকিক।

একদা জ্যোৎস্নাশোভিত পূর্ণচন্দ্রবিরাজিত নিশীথ সময়ে ভক্তগণ সঙ্গে গৌরচন্দ্র টোটা নামক পর্ব্বতোপরি বিহার করিতে করিতে চন্দ্রিকা-রঞ্জিত সুনীল জলধিবক্ষ দর্শন করিয়া সেই দিকে চলিয়া যান। সকলেই আমোদে মত্ত, কোন্ দিক দিয়া কখন তিনি প্রস্থান করিলেন কেহ জানিতে পারেন নাই। পরে অনুসন্ধান করিতে করিতে সমুদ্র উপকূলে জনৈক ধীবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে দামোদরকে সে বলিল, "আমি মৎস্য ধরিতে গিয়া একটি মৃতদেহ জালে পাইয়াছিলাম, তাহাকে স্পর্শ করিয়া অবধি ভয়ে আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, আতঙ্কে অঙ্গ কাঁপিতেছে, সে ব্রহ্মদৈত্য কি ভূত হইবে জানি না; তাহার দুই চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, অস্থি মাংসের বন্ধনী সমস্ত শিথিল, প্রকাণ্ড দীর্ঘাকার শরীর, মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ শব্দ করে; আমাকে সেই ভূতে পাইয়াছে। আমি মরিলে আমার স্ত্রী পুত্র কি খাইবে! হায়! আমি দুঃখী লোক, একাকী রাত্রিতে মাচ ধরিয়া বেড়াই; এখন ওঝার বাড়ী যাইতেছি, তোমরা ওদিকে যাইও না।"

স্বরূপ তাহার কথার প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং সেই দিকেই দৌড়িতে লাগিলেন। গিয়া দেখেন যে গৌরচন্দ্র স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়া আছেন, দেহ পাংশু বর্ণ হইয়াছে, ঠিক যেন শবাকৃতি। সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কর্ণের নিকট হরিধ্বনি করাতে তখন তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল। প্রভু অচেতনাবস্থায় সমুদ্রের জলে ভাসিতেছিলেন, ঐ ধীবর জালে ধরিয়া উপরে তোলে, তাহাতেই সে দিন রক্ষা পান।

এইরূপে তিনি কখন একাকী রজনীযোগে বাহির হইয়া যান, কোন দিন বা দ্বার খুলিতে না পারিয়া দেয়ালে মুখ ঘর্ষণ করেন; ইহা নিবারণের জন্য শঙ্কর নামক একটি শিষ্য কিছু দিন প্রহরিরূপে নিযুক্ত ছিল। সে আবার অতিশয় নিদ্রালু, মাঝে মাঝে ঘুমাইয়া পড়িত। কিন্তু এত যে বিরহোন্মাদ, প্রেমপ্রলাপ, তথাপি প্রভু জননীকে বিস্মৃত হন নাই। জগদানন্দ দ্বারা প্রতি বৎসর বস্ত্র ও প্রসাদ মাতার জন্য পাঠাইতেন। সমুদ্রের জলমগ্ন হইতে রক্ষা পাইয়া শেষ অবস্থায় জগদানন্দকে নবদ্বীপ পাঠাইয়া বলিয়া দেন যে, জননীকে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে বলিও। তাঁহার আজ্ঞায় আমি নীলাচলে আছি। বাউল হইয়া ধর্ম্ম নাশ করিলাম, এ অপরাধ যেন তিনি গ্রহণ না করেন। শচীমাতার জন্য বস্ত্র এবং প্রসাদ ও অন্যান্য ভক্তগণের জন্য প্রসাদ লইয়া জগদানন্দ নবদ্বীপ এবং শান্তিপুরে পৌঁছিলেন। প্রত্যাগমনকালে তাঁহা দ্বারা অদ্বৈত চৈতন্যকে এই তর্জ্জা বলিয়া পাঠান, "প্রভুকে কহিবা আমার কোটি নমস্কার। এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার। বাউলকে কহিও লোক হইল আউল। বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল। বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল। বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছেন বাউল।" এ কথার অর্থ কেহ বুঝিতে পারেন নাই। আমরাও পারিলাম না।

মহাভাবের প্রভূত প্রভাবে মহাপ্রভুর শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক দেহ আর কত সহ্য করিবে? স্বর্গের জলন্ত অগ্নি তাহাকে জীর্ণ শীর্ণ এবং ক্রমশঃ বিকল করিয়া ফেলিয়াছিল। তথাপি পুণ্যের শরীর বলিয়া এত দিন সে অমরাত্মার গুরুভার বহন করিতে পারিয়াছিল। তাঁহার এক দিনের প্রেমাবেশে, ভাবের মত্ততায় অস্থি চূর্ণ হইয়া যায়, জীবনী শক্তি নিঃশেষিত হয়। ঈদৃশ ধর্ম্মভাব সচরাচর কাহারো হয় না, যাহার হয় সে অধিক দিন বাঁচে না। ঠিক অণ্ডের মধ্য

হইতে পক্ষীশাবক যেমন যথাসময়ে আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হয়, তেমনি গৌরপ্রেমবিহঙ্গ চিদাকাশস্থিত পক্ষীমাতার ক্রোড়ে বিচরণ করিবার জন্য পার্থিব দেহপিঞ্জর ভগ্ন করত নিষ্ক্রান্ত হইল। ইহলোক পরিত্যাগের অল্পকাল পূর্ব্বে পরম অন্তরঙ্গ চিরসঙ্গী স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায়কে এক দিন এই শেষ কথা কয়েকটি তিনি বলেন ;—"কলিতে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই ভগবচ্চরণ প্রাপ্তির পরমোপায়, ইহাতে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।" তদনন্তর নিজকৃত এই শ্লোক কয়টি আবৃত্তি করিলেন।

"নাম্নাকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি, স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি, দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগ" ॥ হে ভগবন্! ভক্তগণের বাঞ্ছানুসারে নানাবিধ নাম ধারণ করিয়া তাহাতে তোমার সমগ্র শক্তি সঞ্চার করিয়াছ। শয়নে ভোজনে যাহার যখন ইচ্ছা সে এই নাম লইয়া সিদ্ধমনোরথ হইতে পারে। এমন কৃপা তোমার, তত্রাপি দুর্দ্দৈব বশতঃ সে নামে আমার অনুরাগ হইল না। স্বরূপ ও রামানন্দকে বলিলেন, কিরূপে নাম লইলে প্রেমোদয় হয় তাহা বলি শ্রবণ কর। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" যে ব্যক্তি উত্তম হইয়াও আপনাকে তৃণাধম মনে করে, বৃক্ষ যেমন সহিষ্ণু হইয়া সকল সহ্য করত ফল ফুল ছায়া দান করে, তদ্রূপ সমুদায় সহ্য করে এবং আপনি অমানী হইয়া অন্যকে মান দান করে, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক হরি কীর্ত্তনীয় হন। অনন্তর নিজের দীনতা ও প্রেমহীনতার জন্য খেদ করিয়া এই শ্লোকটি পড়িলেন। "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি"। হে জগদীশ! ধন জন সুন্দরী কবিতা এ সকল কিছুই প্রার্থনা করি না, জন্ম জন্মান্তর তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি হউক এই কামনা। পরে অন্যকৃত আর একটি শ্লোক পড়িয়া এইরূপে তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। হে প্রভো! আমি তোমার নিত্য দাস, তোমায় বিস্মৃত হইয়া আমি ভবার্ণবে পড়িয়াছি, কৃপা করিয়া আমাকে তোমার চরণধূলির সমান কর। পুনরায় দীনতা এবং উৎকণ্ঠা সহকারে নিজকৃত এই শ্লোক দ্বারা প্রার্থনা করেন,—"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥" হে প্রভো! তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার নয়নে গলদশ্রুধারা বহিবে এবং কবে আমার কণ্ঠ অবরোধ

এবং বাক্য গদ্গদ হইবে, এবং কবে আমার বপু পুলকে পরিপূর্ণ হইবে। তদনন্তর নিজের রচিত এই শ্লোক পড়িয়া লীলা শেষ করিলেন। "যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।" হায়! গোবিন্দবিরহে আমার সমুদয় জগৎ শূন্য, নিমেষ যুগপ্রায় এবং নয়ন বর্ষাকালের ন্যায় হইল।

কৃষ্ণ আমার প্রাণ ধন জীবন, তাঁহাকে আমি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে রাখিব, তাঁহার সেবাই আমার সর্ব্বস্ব, ইত্যাদি বাক্য কহিয়া কয়েক দিবস পরে প্রভু দেহলীলা সংবরণ করেন। বিরহোত্তাপে সন্তপ্ত হইয়া প্রেমের প্রজ্বলিত হুতাশনের মধ্যে ক্রমে সেই সুবর্ণ প্রতিমা গৌরতনু বিলীন হইয়া গেল। সে বিরহে নিরাশার নাম গন্ধ নাই, বাহিরের সন্তাপের মধ্যে ভিতরে এক প্রকার অপূর্ব্ব শান্তি অনুভূত হইত।

প্রেমবিরহোন্মাদ শেষে এত দূর বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তাহাতেই শরীর ভগ্ন হইয়া যায়। কখন কোন্ ভাব হয়, কোথায় কখন চলিয়া যান এই ভয়ে সর্ব্বদা সকলকে সশঙ্কিত থাকিতে হইত। এইরূপ করিতে করিতে একদিন আর তাঁহাকে পাওয়া গেল না। একবার সমুদ্র হইতে ধীবরকর্ত্তৃক রক্ষা পান, শেষে তদীয় প্রিয় সঙ্গী গদাধর পণ্ডিতের আশ্রমে গিয়া আর প্রত্যাগমন করিলেন না। চৈতন্য এই স্থানে মধ্যে মধ্যে গিয়া গদাধরের মুখে ভাগবতব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। তাঁহার অদর্শন সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, গদাধরের আশ্রমে গোপীনাথ বিগ্রহের মন্দিরে প্রভু প্রবেশ করিলেন আর ফিরিলেন না। তিনি গোপীনাথের দেহে বিলীন হইয়া গেলেন। ইদানীং আর জ্ঞান চৈতন্য বড় থাকিত না, সর্ব্বদা প্রেমে বিহ্বল; বিশেষ কথাবার্ত্তাও কহিতে পারিতেন না। ১৪৫৫ শকে আট চল্লিশ বৎসর বয়সে মহাপ্রভু মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন।

যাঁহাকে এক দিন না দেখিলে ভক্তগণ মাতৃহারা শিশুর ন্যায় অস্থির হইতেন, যাঁহার প্রফুল্ল মুখচন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মধ্যে তাঁহারা অহোরাত্র বিহার করিতেন, চিরদিনের জন্য তিনি মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিলেন ইহা কিরূপ শোকাবহ অবস্থা তাহা স্মরণ করিলেও প্রাণ আকুল হয়। সোণার সংসার, আনন্দের মেলা, চির মহোৎসবের ক্ষেত্র একবারে শোকসিন্ধুনীরে মগ্ন হইল। প্রেমের পূর্ণ শশধরকে ভীষণ কাল আসিয়া একবারে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ধর্ম্মবিধানপ্রবর্ত্তকের তিরোভাবে অনুবর্ত্তিগণের কি অবস্থা

হয় তাহা এই পুরাতন পৃথিবী বার বার নিরীক্ষণ করিয়াছে। সেই নবদ্বীপের চন্দ্র অষ্ট চত্বারিংশ বৎসর কাল সুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া নীলাচলে অস্তমিত হইল। নীলাচলধাম অষ্টাদশ বর্ষ পরে মৃত্যুর আকার ধারণ করিল। তিনি যেন সকলকে বলহীন জীবনশূন্য করিয়া স্বর্গা-রোহণ করিলেন। প্রেমোৎসবের রজনী প্রভাত হইল, বসুন্ধরা বিষাদ ও ঘোর মায়ান্ধকার মধ্যে ডুবিয়া গেল। স্বর্গের দেবতা স্বর্গে চলিয়া গেলেন, কেবল ছায়া মাত্র এখানে পড়িয়া রহিল। আর সে লোকসমা-রোহও নাই, নৃত্য কীর্ত্তন জয়োল্লাসের ভীষণ গর্জ্জনও নাই, কালের নিষ্ঠুর দণ্ডাঘাতে প্রেমের প্রতিমা চূর্ণ হইয়া গেল। এক জনের অভাবে যেন সমুদায় দেশ শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মহাপুরুষ-গণ যখন বাষ্পীয় পোতের ন্যায় ভবনদীর বক্ষ বিদারণ করিয়া চলিয়া যান তখন তাহার পশ্চাদ্ভাগ উত্তাল তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত হয়। গৌরপ্রেমের জাহাজ বঙ্গদেশ, উৎকল কম্পিত করিয়া পুরীর উপকূলে শেষ অন্তর্দ্ধান হইল, কিন্তু ইহার পশ্চাদ্বাহিনী তরঙ্গমালা বহু যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, আসাম, মণিপুর এই কয়টি স্থানের কতকগুলি শাক্তব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ব্যতীত সকল জাতীয় নরনারী গৌরপ্রেমরাজ্যের প্রজা। এই সকল দেশের পনর আনা লোক বৈষ্ণবধর্ম্মপথের পথিক বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এক জন মহাপুরুষের কি আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! ইহার ভিতর এখনও জীবনীশক্তি আছে সেই জন্য সামান্য সামান্য নূতন সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

# গৌরলীলা সমাপ্তির পরবর্ত্তী অবস্থা।

মহাত্মা গৌরাঙ্গদেবের দেহলীলা সংবরণের অব্যবহিত পরে বৈষ্ণব-সমাজের অবস্থা কিরূপ হইল, তিনি আপনার মহজ্জীবনের স্থায়ী ফল পৃথিবীতে কি রাখিয়া গেলেন, প্রধান ভক্তগণ কি প্রণালীতে কাল

হরণ করিতে লাগিলেন, কি ভাবে কাহা কর্ত্তৃক এ দেশে গৌরের ভক্তি-ভাব প্রচারিত হইল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা যাইতেছে।

চৈতন্য গোসাঞী ইহলোক পরিত্যাগ করিলে ভক্তসমাজের কিদৃশ অবস্থা হয় তাহা শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। এই সময় তিনি পুরী গৌড়দেশ বৃন্দাবন পর্য্যায়ক্রমে ভ্রমণ করেন। গৌরের পরবর্ত্তী সময়ে ইনি বঙ্গদেশের মধ্যে ভক্তিতত্ত্ব প্রচার বিষয়ে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, এই জন্য ইহাঁকে তৎকালে অনেকে গৌরপ্রেমাব-তার বলিয়া বিশেষ সম্মান প্রদান করিত। ভাগীরথী তটে চাখুন্দিয়া নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে শ্রীনিবাসের জন্ম হয়, পিতার নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। তিনি নবদ্বীপের কোন অধ্যাপকের চৌপাঠির ছাত্র ছিলেন। যুবাকালে গৌরের প্রভাব স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মোহিত হন। নিমাই সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিলে গঙ্গাধর তাঁহার শোকে নিতান্ত উন্মাদ প্রায় হইলেন, এই হেতু তাঁহাব নাম পরে চৈতন্যদাস হয়। শ্রীনিবাস এই চৈতন্যদাসের শেষ বয়সের সন্তান। পিতার মুখে ইনি গৌরগুণানু-বাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রেমে একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর শ্রীনিবাস মাতামহাশ্রয় জাজিগ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। গৃহে থাকিয়াই তিনি গৌরপ্রেমে হৃদয়কে অভিষিক্ত করেন। পরে শ্রীখণ্ড গ্রামের নরহরি রঘুনাথ প্রভৃতি গৌরপ্রিয়গণের পরামর্শে পুরীধামে গৌর দর্শনার্থ বহির্গত হন। তখন গৌড়দেশ এবং পুরীর পথে চৈতন্যের শিষ্যগণ প্রায় বার মাসই গমনাগমন করি-তেন; উৎকলবাসীরা ইহাঁদের দেখিলেই চিনিতে পারিত। শ্রীনিবাসের অপরূপ লাবণ্য, মনোহর ভক্তিভাব পথিকদিগের চিত্ত হরণ করিয়াছিল। পথিমধ্যে যাহাকে দেখেন তাহার নিকটে তিনি পুরীর সমাচার জিজ্ঞাসা করেন; এইরূপে চলিতে লাগিলেন। কতক দূরে আসিয়া এক দিন শুনিলেন, প্রভু লীলা সংবরণ করিয়াছেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে শ্রীনিবাস একবারে শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। দুঃখেতে মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া আছেন, কিঞ্চিৎ নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে, এমন সময় স্বপ্নাদেশ হইল। গৌর দেখা দিয়া বলিলেন, প্রত্যাগমন করিও না, নীলাচলে যাও, তথায় গদাধরাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। শ্রীনিবাস

তদনুসারে পুরীতে উপস্থিত হন এবং স্থানে স্থানে ভক্তবৃন্দের শোকভগ্ন মলিন মুখ দর্শন করেন। পণ্ডিত গদাধরের বাসায় গিয়া দেখিলেন, তিনি প্রভুশোকে নিরন্তর হাহাকার করিতেছেন, বর্ণ মলিন, দুই চক্ষে অজস্র বারিধারা বহিতেছে, তথাপি শ্রীনিবাসকে পাইয়া পণ্ডিতের চিত্ত কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি অনুভব করিল। তার পর শ্রীনিবাস বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বাসায় গিয়া দেখেন যে তিনি রামানন্দের সঙ্গে বসিয়া প্রভুর বিরহশোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত, শিখি মাহিতি, মাধবী মাহিতি, কানাই খুলিয়া, স্বরূপ, পরমানন্দ সন্ন্যাসী প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাসায় বসিয়া কাঁদিতেছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র গৌরশোকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, রঘুনাথ দাসও শোকে মুহ্যমান হইয়া বৃন্দাবন প্রস্থান করিয়াছেন, সকলেই যেন শোকেতে একবারে আচ্ছন্ন। সেই দুঃখের সময় ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছিলেন।

অনন্তর আচার্য্য শ্রীনিবাস স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নবদ্বীপ দর্শনে যাত্রা করেন। পথে আসিতে আসিতে শুনিলেন, নিতাই অদ্বৈত প্রভুও অদর্শন হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার শোকানল আবার প্রদীপ্ত হইল। আচার্য্য নবদ্বীপ পৌঁছিয়া দেখিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া ক্ষীণ মলিন দেহে দিন রাত্রি যেন মৃত্যুর প্রতিক্ষা করিতেছেন। চক্ষে নিদ্রা নাই, অহর্নিশি পতিশোকে আকুল, ভূমিশয্যায় শয়ন, সোণার অঙ্গ ধূলায় মলিন হইয়া গিয়াছে। যে তণ্ডুলের দ্বারা নাম জপ সংখ্যা পূরণ হয়, তাহাই মাত্র আহার। সেই পবিত্র তণ্ডুল রন্ধনপূর্ব্বক দেবতাকে নিবেদন করিয়া অপরাহ্নে আহার করিতেন। আহারের শুদ্ধাচারিতা বিষয়ে ইহা একটি নূতনবিধ সুদৃষ্টান্ত, ইহা বৈরাগ্যধর্ম্মের পরাকাষ্ঠাও বটে। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীনিবাসের নয়নানন্দকর রূপ এবং অপূর্ব্ব ভক্তি প্রেম সন্দর্শনে অতিশয় পরিতৃপ্ত হন। তৎকালে ভ্রাতৃগণসহ শ্রীবাস, মুরারী গুপ্ত, ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর, গদাধর দাস, দামোদর, সঞ্জয়, বিজয় প্রভৃতি জীবিত ছিলেন। শচীমাতা ইতিপূর্ব্বেই পরলোকগত হন। নবদ্বীপের তাৎকালিক শোভা সৌন্দর্য্য লোকসমারোহ, ধর্ম্মভাব, কীর্ত্তনোৎসাহ দেখিয়া আচার্য্যের মন মুগ্ধ হইয়াছিল।

নবদ্বীপ হইতে আচার্য্য শ্রীনিবাস শান্তিপুরে অদ্বৈত গোস্বামীর পত্নী শ্রী ও সীতাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। সেখানেও দেখিলেন, অদ্বৈতের

অদর্শন শোকে পারিষদবর্গ রোদন করিতেছে। অনন্তর তিনি খড়দহে গিয়া উপনীত হইলেন। তথায় নিত্যানন্দের বিধবা পত্নীদ্বয় এবং বীরভদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় জাজিগ্রামে চলিলেন। তৎপর নানা স্থানের ভক্তগণের অনুমতিক্রমে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তথায় যাইতে যাইতে পথিমধ্যে রূপ সনাতনের পরলোক গমন বার্ত্তা শুনিয়া তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তখন বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, লোকনাথ, ভূগর্ভ আচার্য্য, হরিদাস আচার্য্য, রাঘব, নরোত্তম, শ্যামানন্দ প্রভৃতি অনেক গুলি প্রধান ভক্ত জীবিত ছিলেন। ইহাদিগকে দর্শন করিয়া শ্রীনিবাসের চিত্ত কতক পরিমাণে শান্তি লাভ করে। তথায় কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া তিনি গোপাল ভট্টের নিকট দীক্ষিত হন, এবং শ্রীজীবের নিকট ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা করেন। এখানেও দেখিলেন গৌর নিতাই অদ্বৈত এবং রূপসনাতনের শোকে সকলে অধীর হইয়া কাঁদিতেছেন, কেহ বা পাগলের ন্যায় পথে পথে কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করিতেছেন। বঙ্গদেশে ভক্তিশাস্ত্র প্রচারের ভার শ্রীনিবাসের উপর অর্পিত হয়, এই জন্য তিনি বিশেষ যত্নের সহিত গোস্বামিগণের প্রণীত ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করেন। কিছু দিন পরে তাঁহাকে সকলে বিশেষ অনুগ্রহের সহিত গৌড়দেশে প্রেরণ করিলেন এবং কতকগুলি গ্রন্থ গাড়ি বোঝাই করিয়া সঙ্গে দিলেন। শ্যামানন্দ এবং নরোত্তম ঠাকুরও এই সঙ্গে দেশে প্রত্যাগমন করেন। বিদায়কালে সমুদয় ভক্তমণ্ডলী শ্রীনিবাসকে ভক্তিশাস্ত্র প্রচারকার্য্যে বিশেষরূপে অভিষেক করিয়াছিলেন এবং গাড়ির সঙ্গে মথুরা পর্য্যন্ত কেহ কেহ আসিয়াছিলেন। আচার্য্যের জ্ঞানপ্রতিভা বিদ্যাবত্তা দেখিয়া পণ্ডিত ভক্তগণ অতিশয় আহ্লাদিত হন।

পথে আসিবার কালে বনবিষ্ণুপুরের নিকট ঐ সকল গ্রন্থ চুরি যায় এবং প্রধান চোর সেই সুযোগে ভক্তিপথ আশ্রয় করে। ঐ স্থানে বীরহাম্বির নামে এক দস্যুরাজ কতকগুলি দুষ্টলোক দ্বারা পথিকগণের ধনবস্ত্রাদি হরণ করিত। গ্রন্থের গাড়ি দেখিয়া রাজা মনে করিল অনেক মূল্যবান্ সামগ্রী আছে, এই সংস্কারে লোকদিগকে বলিয়া দিল যে তোমরা কৌশলে দ্রব্যাদি হরণ করিবে, কিন্তু কাহারো প্রাণ হানি করিবে না। রঘুনাথপুরের নিকট বৈষ্ণব বাবাজীরা রাত্রিকালে নিদ্রিত আছেন এমন সময় দস্যুগণ গ্রন্থের গাড়ি লইয়া পলায়ন করিল। এই স্থান পঞ্চকোট পর্ব্বতের

নিকট, সীতারামপুর ষ্টেশনের কিছু দক্ষিণে; এখানে অদ্যাপি দস্যুভয় কিছু কিছু আছে। রাজা হাম্বীর অত্যন্ত আশার সহিত গ্রন্থের আবরণ উন্মুক্ত করিল এবং একটা সিন্ধুক দেখিয়া মহা আহ্লাদিত হইল। কথিত আছে যে ভক্তিগ্রন্থের দৈব মহিমায় রাজার মন মোহিত হয় এবং বাবাজী-দিগের দর্শন লাভের জন্য সে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া নানা স্থানে লোক প্রেরণ করে। এ দিকে নিদ্রাবসানে আচার্য্য গ্রন্থ না দেখিয়া মহা দুঃখিত হইলেন। কে লইল, কোথায় গেল, কিছুই সন্ধান না পাইয়া সঙ্গিগণের সহিত বহু শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি শ্যামানন্দ ও নরোত্তমকে গৃহে পাঠাইয়া আপনি গ্রন্থানুসন্ধানে প্রবৃত্ত রহিলেন। রাজা গ্রন্থ চুরি করিয়া অবধি ধর্ম্মের জন্য এত দূর ব্যাকুল হইয়াছিল যে দস্যুবৃত্তি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা পরমার্থতত্ত্ব শ্রবণে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। তাহার গৃহে প্রতিদিন ভাগবত পাঠ হয় ইহা শুনিয়া শ্রীনিবাস তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভক্তিরসরঞ্জিত দিব্যকান্তি অবলোকনে রাজার মন মোহিত হইল এবং বুঝিল যে ইনিই সেই ব্যক্তি হইবেন যাঁহার গ্রন্থ আমি চুরি করিয়াছি। তখন সে আচার্য্যের পদতলে পড়িয়া কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল এবং যেখানে যত্নপূর্ব্বক গ্রন্থাদি রাখিয়াছিল সেই-খানে তাঁহাকে লইয়া গেল। শ্রীনিবাস তাহার দীনতা অনুতাপ ব্যাকুলতা দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন এবং তাহাকে মন্ত্র দিয়া কৃতার্থ করিলেন। এই হইতে রাজা হাম্বীর পরম বৈষ্ণব হইয়া যায়। তাহার স্ত্রী পুত্র পারিষদবর্গ সকলেই ক্রমে বৈষ্ণব হইয়াছিল। আচার্য্য দুই মাস কাল এখানে থাকিয়া যাজিগ্রামে গমন করিলেন এবং তথায় ছাত্রদিগকে ভক্তিশাস্ত্র শিখাইতে লাগিলেন। এ সময়ে শ্রীনিবাসকেই বঙ্গদেশের প্রধান প্রচারক বলিতে হইবে।

কিছু দিন পরে দাস গদাধর নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া কাটোয়া নগরে গঙ্গাতীরে যেখানে গৌর সন্ন্যাসী হন সেই স্থানে বাস করেন এবং তথায় তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। শ্রীখণ্ডবাসী সরকার নরহরিও ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে লীলা সংবরণ করেন। এই দুই জনের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে মহা মহোৎসব হইয়াছিল, তাহাতে গৌড়ীয় প্রধান ভক্তগণ সকলেই প্রায় উপস্থিত ছিলেন। গদাধরের শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী কাটোয়ার প্রধান বৈষ্ণব, তিনি মহোৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবে নবদ্বীপের প্রাচীন ভাগবত যে কয় জন তখন জীবিত ছিলেন তাঁহারাও আসিয়াছিলেন।

গৌরাঙ্গের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ের সাধারণ অবস্থা যত দূর আমরা বুঝিতে পারিলাম তাহাতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, গৌরাঙ্গের দেহলীলা শেষ হইবার অল্পকাল পরেই নিতাই অদ্বৈত সনাতন রূপগোস্বামীও পরলোকগত হন। জীবগোস্বামী পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং আরও বিশ পঁচিশ জন উচ্চ প্রকৃতির সাধু তাঁহার সঙ্গে একযোগে গ্রন্থ প্রচার, বিগ্রহসেবা, নামকীর্ত্তন, ভজন সাধন করিতেন। বৃন্দাবনে তখন এক প্রকার ভাবের জমাট মন্দ ছিল না। পুরীতে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহারা ক্রমে কেহ কেহ পরলোকে চলিয়া গেলেন, কেহবা স্থানান্তরিত হইলেন। বঙ্গদেশে অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দের পুত্রগণ শ্রীনিবাসাদির সহিত কিছু দিন নানা স্থানে মহোৎসব নৃত্যগীতাদি করেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইবে, গৌরজীবনবৃক্ষে যে কয়েকটি সুপক্ক সুফল প্রসূত হইয়াছিল তাহা হইতেও কয়েকটি ফলবান্ বৃক্ষ সমুৎপন্ন হয়; এবং তাহা হইতেও তৃতীয় বংশে কয়েকটি সুচরিত্র বৈষ্ণব জন্মে, কিন্তু তার পরে ভক্তবংশ লুপ্তপ্রায় হইয়া আইসে। যদিও গৌরাঙ্গ ভক্তপরিবারকে শোকসাগরে মগ্ন করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার সাধুচরিত্র যে সকল সাধুচরিত্র উৎপন্ন করিয়াছিল তাহা দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মাভাস জগতে রহিয়া গেল। এখন যদিও আধুনিকদিগের অনেক কথা এবং ব্যবহার উপহাসের বিষয় হইয়াছে, এই কারণে যে তাহাতে সারতা নাই; কিন্তু মূলে আসল জিনিষ ছিল তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। চৈতন্যের শিষ্য ও প্রশিষ্যদিগের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পাণ্ডিত্য বিনয় ভক্তির অধীন থাকাতে সমকক্ষদিগের প্রতি তাঁহাদের উপেক্ষা বা দ্বেষ হিংসা প্রকাশ পাইত না; পরস্পর পরস্পরের অনুমতি না লইয়া কেহ কোন সাধুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। হয় জপ, না হয় গ্রন্থপাঠ, হয় সৎপ্রসঙ্গ, না হয় কীর্ত্তন, ইহাতেই সাধুদিগের জীবন অতিবাহিত হইত; বিষয়কার্য্য আলোচনা বা অসার গ্রাম্য কথা ছিল না। এ সকল ব্যক্তি যে কেবল সংস্কৃত ভাষায়, শাস্ত্রচর্চ্চায় পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে, ইহাঁদের দ্বারা তৎকালে সঙ্গীত শাস্ত্রের এবং কবিত্বেরও বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। নরোত্তম প্রভৃতির গানে সকলে মোহিত হইতেন। প্রধান প্রধান বাবাজীদিগের সাধুজীবন ধর্ম্মভাব ভক্তিনিষ্ঠা সাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এত বিনয় বৈরাগ্য ভাবুকতা

হিন্দুস্থানে বোধ হয় কেহ কখন দেখে নাই। অল্পকালের মধ্যে যে বহু লোক এই পথের পথিক হয় তাহার প্রধান কারণ ঐ সকল সাধুদিগের সদ্দৃষ্টান্ত। তদ্ব্যতীত নিতাই গৌর অদ্বৈতের এবং কৃষ্ণ রাধার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, ভদ্রসমাজের লোকদিগের জাতিভেদ প্রথার উপর কোন হাত না দিয়া, বৈষ্ণব সাধুরা সাধারণ শ্রেণীর শূদ্র জাতীয় বহু শত নর-নারীকে ভক্তিপথে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। কোন নির্য্যাতন ত্যাগ-স্বীকার নাই, অথচ ভজনপ্রণালী বহু পরিমাণে সমতলকারী; এই জন্য শীঘ্র শীঘ্র দল বৃদ্ধি হইয়া যায়। প্রথমতঃ শাক্তদিগের সঙ্গে যে কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ ভাব ছিল, শেষে জাতিভেদ রক্ষা এবং বিগ্রহসেবার মিলনভূমিতে তাহা তিরোহিত হইয়া গেল। মহোৎসব উপলক্ষে আহারাদিরও দিব্য আয়োজন হইত। ঠাকুরের প্রসাদী ক্ষীর সর ছানা মাখন মালপুয়া পুরী কচুরি মোহনভোগ এবং ফলাদি যাহা এখন গুলিখোর গোস্বামী ঠাকুরদের চাটনিরূপে পরিগৃহীত হয় তাহা ভোজন করিয়া তখনকার ভক্তগণ হৃষ্ট পুষ্ট হইতেন এবং মহা উদ্যমের সহিত সিংহরবে হরিসঙ্কীর্ত্তনে নাচিতেন গান করিতেন। ভাবের উল্লাস, ক্রন্দনকোলাহল, কোলাকুলি, পদ-ধূলিগ্রহণ, সেবা শুশ্রূষা, কীর্ত্তনানন্দ এ সমস্ত এ দেশের মধ্যে এক বিচিত্র দৃশ্য। চৈতন্যের মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক তাহা পূজা করা যদিও তাঁহার রুচি ও ভাবের বিপরীত আচরণ, কিন্তু স্থানে স্থানে এইরূপ বিগ্রহ স্থাপন দ্বারা বাবাজীরা তৎকালে গৌরের বাহ্য বর্ত্তমানতাকে কতকটা জাগ্রত রাখিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত পরলোকগত সাধুগণের লীলাস্থান ও সমাধিক্ষেত্র ইহাঁরা যেরূপ ভাবের সহিত দেখিতেন তাহা পড়িলেও মনে উল্লাস জন্মে। এক দিকে ভিতরে গৌরের অনুরূপ ভাবের প্রবাহ ছিল, অপর দিকে বাহিরে তাঁহার বাহ্য আকারের অনুরূপ প্রতিমাও ছিল, সুতরাং প্রভুর বিচ্ছেদের আঘাত তাদৃশ কাহাকেও সহ্য করিতে হয় নাই। ইহা দ্বারা ফটোগ্রাফের অভাব বিমোচন হইয়াছিল।

# উপসংহার।

দ্বিতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত ভক্তিভাবের স্রোত একরূপ চলিয়াছিল। কিন্তু হায়! এখন কোথায় সে প্রেমের গৌরাঙ্গ, আর কোথায় বা সে দেবদুর্লভ ভগবদ্ভক্তি। কেবল বাহিরের ঠাট মাত্র এখন বজায় আছে, ভিতরকার পদার্থ বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। যে পবিত্রতার জন্য চৈতন্য এত শাসন করিয়াছেন, নীচ শ্রেণীর বৈষ্ণবগণ তাহাই অগ্রে নষ্ট করিয়া বসিয়া আছে। চারিদিকে গৌরলীলার চিহ্ন সকল দেদীপ্যমান পড়িয়া রহিয়াছে, অথচ তিনি নাই, তাঁহার ভাবের ভাবুক তেমন মানুষও আর প্রায় পাওয়া যায় না। মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন এই সমস্ত জনপদকে তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল জাগ্রৎ রাখিয়াছিলেন, তাঁহার পদার্পণে পৃথিবী ধন্য হইয়াছিল। সহস্র সহস্র নর নারী ভক্তিরস পানে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিল। তেমন শুভ সময় আর কি ঘটিবে! এক সময়ে এতাধিক উন্নত চরিত্র সাধুর সমাগম এ দেশে আর কি দেখিতে পাইব! তেমন দেবের দুর্লভ ভক্তিসুধা আর কি এখানে জন্মিবে! কি স্বর্গের অমৃতই তিনি আনিয়াছিলেন! তেমন নৃত্যও আর কেহ দেখিবে না, তেমন হরি-সঙ্কীর্ত্তনও আর কেহ শুনিবে না। হায়! প্রেমরস-সিন্ধু গোরাচাঁদের প্রেমাশ্রুবিগলিত মুখচন্দ্রমা পরকালের মেঘে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। গোলোকের সম্পত্তি হরিপ্রেমামৃত বিলাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন, কিছু দিন পরে সে বস্তু তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল, দুর্ভাগ্য মানবগণ তাহা ধরিয়া রাখিবে এমন স্থান নাই, কেবল ইতিহাসে সেই প্রেমলীলার ছায়ামাত্র এখন জাগিতেছে। পাপানলে সন্তপ্ত, সংসারভারে আক্রান্ত জরা দারিদ্র্য শোক দুঃখে অভিহত মানব মানবী কোথায় এক বিন্দু ভক্তিরস পানে হৃদয়কে শীতল করিবে, তাহা না করিয়া তাহারা সংসারের দুঃখ ক্লেশ সংসারের দ্বারাই মোচন করিতে চায়; পারে না, তথাপি হরিভক্তি অন্বেষণ করিবে না, গৌরপ্রেমের দৃষ্টান্ত লইবে না। তাহারা পদে পদে বিপদাপন্ন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াও হরিপদে শরণ লইতে চাহে না। চক্ষের সম্মুখে এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পড়িয়া রহিয়াছে তাহা

দেখিয়াও দেখিবে না, সে দিকে চলিবার সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিবে। হায়! কি দুর্ভাগ্য, হরিপ্রেমে হরিভক্তি ভিন্ন আর কি কিছু সুমিষ্ট হৃদয়গ্রাহী পদার্থ পৃথিবীতে আছে? অযোগী অজ্ঞানী বেদবিমুখ সাধারণ নরনারী এবং শুষ্কহৃদয় কুতার্কিকদিগের জন্য এমন সহজ পথ গৌরাঙ্গ দেখাইয়া গেলেন, তথাপি মূঢ় জীবের দুর্নিবার বিষয়বাসনা ঘুচিল না। যাহারা দুই দিন পরে ফেলিয়া পলাইবে, স্নেহ মমতা দেখাইয়া ইহ পরলোক নাশ করিবে, সেই অসার কুটুম্বভরণে জীবন চলিয়া গেল, অথচ তাহাদেরই অনুরোধে মনুষ্য মায়ামুগ্ধ হইয়া কত পাপ করিতেছে; দিনান্তে একবার ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে স্মরণ করিবে তাহারও অবসর পায় না। ঈশ্বর, সাধু, ধর্ম্ম, পরকালকে ফাঁকি দিতে গিয়া তাহারা আপনারা বিড়ম্বিত, প্রতারিত হইতেছে তাহা বুঝাইয়া দিলেও বুঝে না। পক্ষান্তরে কত ব্যক্তি কেবল ভেকমাত্র অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। তাহাদের ভিতর প্রকৃত ধর্ম্ম নাই, এ কথা তাহারা বলিতে দিবে না। কত শত গোস্বামিগণ শিষ্যব্যবসায়ী হইয়া ধর্ম্মের নামে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করত উন্মার্গগামী হইয়াছেন। গৌরাঙ্গকে ইহারাই হত্যা করিয়া তাঁহার পবিত্র প্রেমে দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। বঙ্গীয় দুঃখী শ্রমজীবী সাধারণ লোকেরা হৃদয়ের শোণিতস্বরূপ রাশি রাশি অর্থ দিয়া ইহাদের সেবা করে, আর ইহারা তাহাদের অর্থে সুখ বিলাস চরিতার্থ করেন; এক্ষণে গুরু শিষ্যের মধ্যে এই প্রকার সম্বন্ধ। ব্যবসায়ী বৈরাগী এবং গোস্বামীদিগের মধ্যে গৌরের ভক্তিপ্রভাব কিছুমাত্র নাই কেবল তাহা নহে, তাহার বিপরীত যাহা কিছু সমুদায়ই বিদ্যমান আছে। কিন্তু গৃহস্থ বৈষ্ণব এবং ভক্তিপন্থাবলম্বী ভদ্র, কৃষক, নবশাক জাতির মধ্যে কিছু কিছু ভক্তির সরল মধুর ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যা হউক, এ সকল দোষ দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও গৌরশিষ্য বৈষ্ণববৃন্দকে আমরা ভালবাসি, কারণ ইহাদের ভিতরে গৌরপ্রেমের মধুর আভ্রাণ এখনও কিছু কিছু পাওয়া যায়। সাধু বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিনয় ভাবুকতা নামসঙ্কীর্ত্তন সাধুসেবা এবং মদ্যমাংসপরিত্যাগ সারল্য দীনভাব সাত্ত্বিকতা এখনও যাহা কিছু আছে তদ্দর্শনে প্রাণ সুখী হয়। ভগবান্ করুন যেন সাধারণ বৈষ্ণবসমাজের জীবনহীন বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে আবার ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হয়।

মহাপ্রভু চৈতন্যের জীবন যেরূপ চিত্রিত হইল, তাহার সমুদায় অঙ্গগুলি

একত্রিত করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে ইহা একটি অথণ্ড অবিমিশ্র প্রেমপদার্থ, ধর্ম্মোন্মত্ততার আদর্শ। ইহাতে ধর্ম্মবিজ্ঞান, কর্ম্মকাণ্ড, নীতি-শাস্ত্র বিস্তারিতরূপে বিকসিত হয় নাই। এ প্রকার প্রমত্ত জীবনের নিয়তিও তাহা নহে। গৌরজীবনের লক্ষ্য অন্তবিধ। মায়ামুগ্ধ কঠিন জড়বৎ বঙ্গসমাজকে আলোড়িত করিয়া তাহাকে ভক্তিরসে আর্দ্র করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল এবং তাহা সফলও হইয়াছে। যত দিন তিনি মর্ত্ত্যধামে ছিলেন তত দিন ধর্ম্মার্থীদিগকে নিদ্রা যাইতে দেন নাই, দিবানিশি দুর্জ্জয় স্রোতের মুখে সকলকে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রেমভক্তির যে প্রবল আঘাত অনুভূত হইত তাহার বেগ বহু সাধকের জীবনকে কম্পিত করিয়া তুলিত। একটি বিস্তৃত প্রেমরাজ্য স্থাপন করিয়া তাহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তিনি অহর্নিশি তড়িতের প্রবাহ সঞ্চালিত করিতেন।

চৈতন্ত সাকারবাদী ছিলেন, প্রথম বয়সে বিষ্ণুমূর্ত্তি পূজা করিতেন, তদনন্তর প্রেমোন্মাদের অবস্থায় রাধাকৃষ্ণের যুগল প্রেম অনুধ্যান করত মহাভাবে বিলীন হইয়া যান। তাঁহার কোন কোন সামাজিক ব্যবহার আচরণ পক্ষপাতশূন্ত উদার ছিল, ধর্ম্মানুরাগের আতিশয্য বশতঃ সঙ্কীর্ণতা সাম্প্রদায়িকতা তাঁহার ভিতরে স্থান পাইত না, এই জন্ত কাহারো কাহারো সংস্কার থাকিতে পারে যে তিনি নিরাকারবাদী এক ঈশ্বরের উপাসক ছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সাকারবাদী হওয়াতে তাঁহার ভক্তি প্রেম বৈরাগ্য পবিত্রতার কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই। আধুনিক বিজ্ঞান দর্শন-প্রিয় নিরাকারোপাসক জ্ঞানী একেশ্বরবাদিগণ হয়ত এ কথা শুনিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন, গৌরচন্দ্রকে পৌত্তলিক কুসংস্কারাপন্ন ভাবান্ধ পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে অনেক নিরাকারবাদী জ্ঞানীকে দয়ার পাত্র বোধ হইবে। নিরাকারবাদীর বুদ্ধি যুক্তি কিয়ৎপরিমাণে চরিতার্থ হইয়াছে ইহা মানি, কিন্তু অন্ধকারময় আকাশ এবং চৈতন্তশক্তিহীন নির্গুণ কারণের ও বিচিত্র কল্পনার পূজা করিয়া শত শত ব্রহ্মজ্ঞানী কার্য্যেতে জড়বাদীর ন্তায় পার্থিব পদার্থের সেবায় জীবন ঢালিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের সমস্ত জীবন অন্বেষণ করিলে এক বিন্দু হরিভক্তিরস পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ইহাঁরা যে পৌত্তলিকতা সাকারোপাসনার জন্ত অন্তকে হেয় জ্ঞান করেন, সেই পৌত্তলিকতাদোষে

অনেক সময় নিজেরাই দোষী। কেন না, কল্পিত প্রতিমূর্ত্তি এবং কল্পিত ভাব বা অভাব পদার্থ এক অর্থে উভয়ই সমান। যাঁহারা ঘনচিদানন্দ স্বরূপকে যোগনয়নে যথাযথরূপে দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে সংশয় নাই; কিন্তু চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া কেবল মতে নিরাকার-ব্রহ্মবাদ স্বীকার করা অতিশয় বিড়ম্বনার বিষয়। জ্ঞান বিজ্ঞানে কি করিবে, প্রত্যক্ষ দর্শন কোথায়? পক্ষান্তরে গৌরাঙ্গ সাকারবাদী হইয়াও দেখ কেমন ভক্ত ছিলেন! তিনি জড়মূর্ত্তির উপলক্ষে ঈশ্বরের দয়া প্রেম পবিত্রতার সৌন্দর্য্য এমন স্পষ্টরূপে অনুভব করিতেন, যে কত শত নিরাকার-বাদী কল্পনাতেও সেরূপ অনুভব করিতে পারিবেন না। তাঁহার এত মত্ততা আনন্দ উৎসাহ হাস্য ক্রন্দন কি দারু মৃত্তিকা প্রস্তর খণ্ডের গুণে? এ কথা বিশ্বাস করিতে পার না। আন্তরিক বিশ্বাস বিশুদ্ধ এবং উজ্জ্বল, তাহার প্রকাশ এবং আলম্বন উদ্দীপন পরিমিত পদার্থে নিবদ্ধ ছিল। পরিমিতই বা কি রূপে বলিব? তাঁহার চক্ষে সমস্ত বিশ্ব হরিময় ছিল। নিরাকারবাদীর সঙ্গে তিনি ভিতরে এক বাহিরে বিভিন্ন। প্রেম ভক্তি বিশ্বাসের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই। গৌরের বিশ্বাস ভক্তিপ্রেম এত বেশী ছিল যে, তাহাতে বিজ্ঞান বুদ্ধির অভাব আর অভাব বলিয়া বোধ হয় নাই। সচ্চিদানন্দ জ্বলন্ত জাগ্রৎ হরির রূপসাগরে যিনি অনুক্ষণ সন্তরণ করিতেন, সামান্য ভ্রমে তাঁহার কি করিবে? অবিশ্রান্ত যাঁহার হৃদয়ে প্রেমের উচ্ছ্বাস, পুণ্যের অগ্নি, মহাভাবের মত্ততা প্রদীপ্ত থাকিত, বাহিরের ভুল ভ্রান্তি কি সে স্রোতের মুখে তিষ্ঠিতে পারে? ভগবৎতত্ত্ববিষয়ে তাঁহার মত যেরূপই থাকুক, তিনি আপনার অভীষ্টদেবতাকে এত ভাল বাসিতেন যে, তাহা দ্বারা দিন রাত্রি কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া যাইত তাহা তিনি জানিতেও পারিতেন না। তেমন করিয়া ভাল বাসিতে, শ্রদ্ধা ভক্তি দান করিতে কয় জন নিরাকারবাদী সক্ষম হইবেন? ভালবাসায় একবারে পাগল। তিলেক বিচ্ছেদে প্রাণ আকুল। এক ভালবাসাতেই তাঁহার সকল অভাব মোচন হইয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞানীর শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞান যুক্তি বিচার শুনিয়া কি পিপাসিত ব্যাকুল চিত্ত তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? প্রাণের গভীর তৃষ্ণা, আত্মার দুঃসহ পাপ যন্ত্রণাও তাহা দ্বারা বিদূরিত হয় না। নিরাকারবাদী আবার যখন মাতিয়া মাতাইবে, কাঁদিয়া কাঁদাইবে, বৈরাগী হইয়া অন্যকে বৈরাগী করিবে, তেজস্বী পবিত্র চরিত্র হইয়া পাপ হৃদয়ের পরিবর্ত্তনসাধন করিবে, উপাস্য দেবতার দর্শন

স্পর্শ শ্রবণ আলিঙ্গন সুখ সম্ভোগ করিয়া প্রেমনীরে ভাসিয়া যাইবে; যখন তাহার আত্মায় ব্রহ্মের পবিত্র জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইবে, তখন তাহার বিশুদ্ধ বিজ্ঞানানুমোদিত নির্ম্মল ধর্ম্মশাস্ত্রের মহিমা বুঝিব। তদ্ভিন্ন কেবল বাক্য আর তর্ক, শূন্য অন্ধকার নিরাকারবাদ, ইহাতে মানবহৃদয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। এরূপ শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানের পরিণাম একদিকে সংশয়, নাস্তিকতা, অপর দিকে কুসংস্কার পৌত্তলিকতা।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভাশক্তি হইতে ভক্তির শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়া চৈতন্যজীবনে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণ ভক্তিপ্রেমে মাতিয়া যদি চৈতন্যের মত অচেতন হইতেন,তাহা হইলে আর এ বিষয়ের তত্ব তিনি প্রচার করিতে পারিতেন না। চৈতন্য মাতিলেন, সুতরাং স্বয়ং ভক্তিশাস্ত্রকর্ত্তা না হইয়া ভক্তি পদার্থের স্বরূপ প্রত্যক্ষ দেখাইয়া গেলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলারসপিপাসু হইয়া ভক্তির চরমাবস্থা মহাভাবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন; কিন্তু কৃষ্ণলীলা অনুকরণ না করিয়া বরং বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সন্ন্যাসী সর্ব্বত্যাগী হইয়া যোষিৎসঙ্গ এককালে পরিহার করত তদ্বিপরীত নীতি দেখাইলেন। এ বিষয়ে চৈতন্যদাস, ভগবানদাস প্রভৃতি আধুনিক বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের পথ অনুসরণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বর্ত্তমান বৈষ্ণবদলের কেহ কেহ যদি এইরূপ সন্ন্যাসব্রত ধারণ করিয়া ভক্তিযাজন করিতেন, তাহা হইলে এ ধর্ম্মের অনেক গৌরব রক্ষা পাইত। এখানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে চৈতন্তের কেমন প্রভেদ! এক জন স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তৎসঙ্গে প্রেম প্রচার করিলেন; এক জন স্ত্রীলোকের মুখ পর্য্যন্ত দেখিতেন না। প্রথমোক্ত প্রেম অত্যন্ত উচ্চ, নির্ব্বিকারচিত্ত পবিত্রমনা হইয়া তাহা পালন করিতে পারিলে স্বর্গ লাভ হয়; কিন্তু অনুকরণকারীদিগের ইহাতে প্রায়ই নরকভোগ ঘটিয়া থাকে। নারীজাতির সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রেমব্যবহার দেবতাদিগেরও প্রার্থনীয়, এবং ইহাই সর্ব্বোপরি সুমিষ্ট ধর্ম্ম। কৃষ্ণলীলা হইতে সাধারণ নারীকুলের প্রতি সাধকগণের স্নেহ প্রীতি সঞ্চারিত হইয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এ প্রকার পবিত্র প্রেমের সদ্দৃষ্টান্তও আছে। মুনি ঋষিদিগের আচরিত কঠোর বৈরাগ্য, সংসারত্যাগ, বনগমন ইত্যাদি প্রথার পরে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের ধর্ম্ম আনিলেন, স্ত্রীজাতিকে ভাল বাসিয়া গৃহাশ্রমে পরিবারমধ্যে জ্ঞান কর্ম্ম যোগ ভক্তি প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিলেন।

অনুমান উনিশ শত বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শৈবধর্ম্মের অত্যন্ত

প্রাদুর্ভাব ছিল। তৎকালের যে দুই একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহাদিগকে কেহ গণ্য করিত না। সপ্তম শতাব্দীর শেষে বা অষ্টম শতাব্দীর আরম্ভে ঐ দেশে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাকে লোকে শিবাবতার বলিত। পরে কেশবাচার্য্যের পুত্র রামানুজ আচার্য্য অবতীর্ণ হন। রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধবাচার্য্য এবং নিম্বাদিত্য; চৈতন্যের পূর্ব্বকালে হিন্দুস্থানে এই চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামানন্দী বা রামাৎ, দাদু, কবীর, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বহুতর বৈষ্ণব সম্প্রদায় যাহা দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয় তাহা উক্ত চারি প্রধান সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত শাখা প্রশাখা। ইহাতে বিষ্ণু এবং রামের উপাসনা প্রচলিত ছিল, রাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রায় দেখা যায় না; এবং ভক্তি প্রেমের প্রমত্ত ভাবও এ সকলের মধ্যে ছিল না; ভক্তির কোন কোন ভাব দেখা দিয়াছিল এই মাত্র। নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়েব লোকেরা রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি পূজা করিত। প্রকৃত ভক্তি চৈতন্যদেবই প্রদর্শন করেন। চৈতন্যপ্রদর্শিত ভক্তির ন্যায় প্রগল্‌ভা ভক্তি পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। পঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায়ের সংস্থাপক বাবা গুরু নানক সে দেশে যে ভক্তি প্রচার করিয়া যান তাহাও অতি আশ্চর্য্য। তিনি ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ চৈতন্যের ষোল বৎসব অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়া ৬৯ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন; এক সময়ে দুই জন দুই স্থানে এক হরিভক্তি প্রচার করেন। চৈতন্যের পাঁচ বৎসর পরে নানকের পরলোক প্রাপ্তি হয়। নানকপ্রচারিত হবিভক্তির প্রভা শিখ কুকা নিরাঙ্কাবী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্যাপি স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। নামগান, গ্রন্থপাঠ, সাধুভক্তি, নানক সম্প্রদায়েব মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহা যোগমিশ্র অদ্বৈতবাদের ভক্তি।

পূর্ণ অবিমিশ্র ভক্তির বিকাশ আমরা স্বদেশবাসী বঙ্গকুলতিলক চৈতন্যের জীবনেই কেবল দেখিতে পাই। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে যত যত বৈষ্ণবসম্প্রদায় দৃষ্টিগোচর হইত তাহা দ্বারা বৈধী অর্থাৎ সাধনপরতন্ত্রা ভক্তি প্রচারিত হইয়াছিল। চৈতন্য কর্ত্তৃক অহৈতুকী মহাভাবময়ী ভক্তির অসাধারণ ভাব জগতে প্রচারিত হইযাছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ ব্রহ্মের অবতার পিতা মাতা সখা স্বামী বলিয়া পূজা কবিতেন এবং তাঁহাব প্রেমময় সচ্চিদানন্দ রূপ সদা সর্ব্বক্ষণ দর্শন আলিঙ্গনেব জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। কি এক

অপূর্ব্ব রূপমাধুর্য্যরসে তাঁহার মন মজিয়াছিল যাহা আমরা কল্পনাতেও অনুভব করিতে পারি না। প্রকৃত দেবদর্শন না হইলে এমন অদ্ভুত প্রেমবিকার কি কখন উপস্থিত হয়? তিনি মৌখিক বাক্য কিম্বা লিখিত গ্রন্থ দ্বারা কোন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করেন নাই। দিবা নিশি ভাবরসেই উন্মত্ত, অন্য কাজের অবসর কোথায়? কেবল জীবন দ্বারা ভক্তির লক্ষণ দেখাইয়া গিয়াছেন। তৃণের ন্যায় বিনম্র, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, আপনি অভিমানশূন্য হইয়া অপরকে মান দান, এইরূপে সর্ব্বদা হরিসঙ্কীর্ত্তন কর, এই মাত্র তাঁহার উপদেশ। তাঁহার মত বিনয়ী এবং প্রমত্ত আর দেখা যায় না। বিজ্ঞানপ্রতিপাদিত উপদেশও তিনি কোন কোন পণ্ডিতমণ্ডলীতে দিয়াছিলেন; কিন্তু সে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের অবলম্বিত পথ নহে। জ্ঞান বুদ্ধি বিচার এ সকলকে তিনি ভক্তিরসে ডুবাইয়া ধর্ম্মার্থীদিগের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিতেন, এই জন্য বুঝিবার অগ্রে লোকে তাঁহার শিষ্য হইয়া পড়িত। প্রত্যক্ষ দৈবশক্তির নিকট উপদেশ আর কি করিবে? তাঁহার দুর্জ্জয় ভক্তিপ্রভাবে লোকের জ্ঞান বুদ্ধির গর্ব্ব অগ্রেই চূর্ণ হইয়া যাইত। পরে রূপ সনাতন জীব ইহাঁরা ধর্ম্মগ্রন্থ রচনাপূর্ব্বক প্রেম ভক্তির সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিলেন।

জীব ও রূপ গোস্বামীপ্রণীত ভক্তিগ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ ভক্তিতত্ত্ব এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। জীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"জীব তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে ঈশ্বরবিমুখ হয়। এই বৈমুখ্য হইতে জীবের সংসার দুঃখ ঘটিয়া থাকে। সমুদায় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে বৈমুখ্য নিবারিত হইয়া ঈশ্বরাভিমুখ্য হয়। ঈশ্বরাভিমুখ্যের নাম উপাসনা। এই উপাসনা হইতে জ্ঞানেব আবির্ভাব হয়। জ্ঞান হইতে ঈশ্বরানুভব হয়। ঈশ্বরানুভবের তাৎপর্য্য অন্তরে বাহিরে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার।

সাক্ষাৎ উপাসনারূপ ভগবদাভিমুখ্য দুই প্রকার। নির্ব্বিশেষ এবং সবিশেষময় আভিমুখ্য। নির্ব্বিশেষময় আভিমুখ্যে জ্ঞান প্রধান এবং সবিশেষময় আভিমুখ্যে অহংগ্রহোপাসনা এবং ভক্তি। প্রথমতঃ লোকে যে পরিমাণে জড়াতিরিক্ত চিদ্বস্তু অনুভব করিতে সমর্থ হয়, সেই পরিমাণে বিবেকী হয়। কিন্তু এই চিদ্বস্তু অনুভব করিয়াও তাহার বিশেষ স্বরূপ সকল অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, এ জন্য নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম অনুভব করিয়া পরিশেষে তাহাতে বিলীন হয়। সাধুজনের কৃপাতে যখন

চিন্মাত্র পরব্রহ্মের বিশেষ স্বরূপ অবগতি হয়, তখন অহংগ্রহোপাসনা, না হয় ভক্তি সমুপস্থিত হয়। শক্তির আধার সেই ঈশ্বরই আমি, ঈদৃশ চিন্তার নাম অহংগ্রহোপাসনা। এতদ্দ্বারা উপাসকে তাদৃশ শক্তি আবির্ভূত হয়। ভক্তি ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করাকে ভক্তি বলে। সুতরাং ভয়দ্বেষ হিংসা বা অহংগ্রহ উপাসনা এখানে স্থান পায় না।

এই ভক্তি ত্রিবিধ;—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা, এবং স্বরূপসিদ্ধা। অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম স্বয়ং ভক্তি নয়; কিন্তু ঐ সকল ঈশ্বরে অর্পণ করিলে, আরোপসিদ্ধা ভক্তি হইয়া থাকে। জ্ঞানধর্ম্মাদি স্বয়ং ভক্তি নহে, কিন্তু ভক্তির সঙ্গে সে সকলকে সংযুক্ত করিলে উহারা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি হয়। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের আনুগত্য। এখানে জ্ঞানকর্ম্মাদির কোন ব্যবধান নাই। শ্রবণ কীর্ত্তন আদি সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে লইয়া হয় বলিয়া তাহারা ভক্তির অঙ্গ, সুতরাং ভক্তির স্বরূপসিদ্ধত্বে ইহারা ব্যাঘাত নহে।

এই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আর কিছু চায় না, এজন্য ইহা নির্গুণা নিষ্কামা কেবলা আত্যন্তিকী অকিঞ্চনা ভক্তি বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। এই ভক্তি দ্বিবিধ—বৈধী এবং রাগা। শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভক্তিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে বৈধী ভক্তি বলে। এই ভক্তিতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান এবং অর্চ্চন ব্রতাদি অনুসৃত হয়। বৈধী ভক্তিতে শরণাপত্তি অর্থাৎ একান্তভাবে শরণাপন্ন হওয়া সর্ব্বপ্রধান। শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে শরণাপত্তি হইয়া থাকে। শরণাপত্তির পর আরো উন্নতি হয়, এই জন্য ঈশ্বরোপদেষ্টা গুরু এবং সাধু সজ্জনের সেবা প্রয়োজন। মৃত্যুমোচক গুরু লাভ হইলে ব্যবহারিক গুরু পরিত্যাগ করিবে।

ঈশ্বরের সংসর্গলাভে স্বাভাবিক ইচ্ছা অনুরাগা ভক্তি। ইহা বৈধী ভক্তি অপেক্ষা প্রবলতর, কেন না, বৈধী ভক্তি বিধিসাপেক্ষ বলিয়া দুর্ব্বল। সাধকের যেখানে স্বাভাবিক রুচি না থাকে সেখানে কষ্টে বিধিনিষেধ অনুসরণ করিয়া সাধন করিতে হয়; কিন্তু যেখানে রুচি, সেখানে স্বভাবতঃ ঈশ্বরের সন্তোষকর অনুষ্ঠান সকল হইয়া থাকে; সুতরাং ইহা শ্রেষ্ঠ এবং বিধিনিষেধনিরপেক্ষ। অনুরাগের পথে এই জন্য পরম ঘৃণাস্পদ পাপক্রিয়া সকল হওয়া অসম্ভব। যদি প্রমাদ বশতঃ কিছু হয়, ভগবানের অনুগ্রহে তাহা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

যে সকল ব্যক্তির হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে, অথবা যাঁহাদিগের প্রতি মহতের কৃপাদৃষ্টি হয়, তাঁহাদিগের ঈশ্বরের কথা শ্রবণ মাত্রেই ঈশ্বরের দিকে চিত্তের আভিমুখ্য এবং ঈশ্বরানুভব হইয়া থাকে। তদনন্তর শ্রবণ কেবল রসোদ্দীপন জন্য। সাধারণ ব্যক্তি সকলের শ্রবণ মাত্র আভিমুখ্য হইয়াও কামাদি দোষজন্য উহা প্রতিহত হইয়া অবস্থিতি করে। ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ মাত্র সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় এ কথা সত্য; যদি তাহা কোথাও না হয়, তবে মহৎ অপরাধে ফল অবরুদ্ধ হইয়া আছে মানিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণ এই অপরাধ নিবারণের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। কুটিলাত্মা ব্যক্তি সকলের নানা প্রকার আরাধনা অর্চ্চনাও ফলোপধায়ক হয় না। তাহারা অন্তরে ভগবান্ এবং তাঁহার ভক্তগণের প্রতি অশ্রদ্ধাবান্, সুতরাং তাহাদিগের ভজনার্চ্চনা গ্রাহ্য হয় না। ভজনাভাস দ্বারাও মুক্তি হয়, শাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে, কিন্তু উহা অকুটিল মূঢ়গণ-সম্বন্ধে। অপুণ্যবান্ কুটিলাত্মা মূঢ়গণের ভক্তি সিদ্ধ হয় না। "ন হ্যপুণ্য-বতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাং। ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা॥"

ভক্তিতে শৈথিল্য জন্মান অসম্ভব। তবে দেহরক্ষণাদি জন্য কখন কখন ভক্তের যে শৈথিল্য দৃষ্ট হয়, তাহা অন্য বুদ্ধিতে নহে, উপাসনা বুঝিতে। যেখানে মূঢ়তা বা অসামর্থ্য বশতঃ শৈথিল্য জন্মে, সেখানে তদ্দ্বারা ভগবা-নের অনুগ্রহ আরো বর্দ্ধিত হয়। অত্যন্ত দৌরাত্ম্য ভিন্ন বিবেকযুক্ত ব্যক্তির ভক্তিতে শৈথিল্য হয় না। শাস্ত্রশ্রবণজনিত শ্রদ্ধা জন্মিলে আর পাপে প্রবৃত্তি হয় না। পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ যদি ইন্দ্রিয়াদির বিষয় দ্বারা ভক্ত আকৃষ্ট হন, তবে তদ্দ্বারা আরো দৈন্য বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাকে আরো ভক্তি-মান্ করে। শ্রদ্ধা যখন সিদ্ধাবস্থা লাভ করে, তখন অসত্যপরিবর্জ্জন সত্যানুষ্ঠান সহজ হইয়া উঠে। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে, "কিং সত্যমনৃতঞ্চেতি বিচারঃ সংপ্রবর্ত্ততে। বিচারেঽপি কৃতে রাজন্নসত্যপরিবর্জ্জনম্। সিদ্ধং ভবতি পূর্ণা স্যাত্তদা শ্রদ্ধা মহাফলা॥"

হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন;—ভক্তিতে পাপ এবং তন্মূল বিনষ্ট হয়। ইহাতে সমুদায় সদ্গুণ লাভ হয়, সমুদায় লোকের অনুরাগভাজন হওয়া যায়, এবং বিবিধ সুখ উৎপন্ন হয়। ভক্তি বহুসাধনেও লাভ হয় না, ঈশ্বরের কৃপাতে আশু লাভ করা যায়।

ইহাতে মোক্ষ নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়। ভক্তিতে যে পরম আনন্দ লাভ হয়, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্মানন্দ পরার্দ্ধ গুণ করিলেও তাহার পরমাণুর তুল্য হয় না। ভক্তি ঈশ্বরকে সপার্ষদ ভক্তের নিকট আকর্ষণ করিয়া আনে। ভক্তির এই সকল গুণকে ক্লেশঘ্নী, শুভদা, সুদুর্ল্লভা, মোক্ষলঘুতাকৃৎ, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা, এবং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

সাধন, ভাব এবং প্রেমভেদে ভক্তি ত্রিবিধ। [ সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে ভক্তি দ্বিবিধ;—সাধনরূপা এবং সাধ্যরূপা। ঈশ্বরে অন্তঃকরণের বিকাশ সাধ্যরূপা। ভাব, প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, রাগ এই পাঁচ, এবং মান, অনুরাগ এবং মহাভাব এই তিন, সমুদায়ে আট প্রকার সাধ্যরূপা ভক্তি। ]

[ সাধন ] সাধনরূপা ভক্তি দ্বিবিধ;—বৈধী এবং রাগানুগা। এই ভক্তির চৌষট্টি অঙ্গ। গুরুপদাশ্রয়, মন্ত্রগ্রহণ, গুরুসেবা, সাধুজনের অনুগমন, সদ্ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, ভোগাদিত্যাগ, তীর্থস্থানে নিবাস, কথঞ্চিৎ জীবননির্ব্বাহ, উপবাস, অশ্বত্থাদিসম্মাননা, এই দশটি ভক্তির আরম্ভ। ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির সঙ্গত্যাগ, শিষ্যবৃদ্ধিবর্জ্জন, কার্য্যের আড়ম্বরত্যাগ, বহু গ্রন্থাদি অভ্যাসবর্জ্জন, লাভালাভে অক্লিষ্টভাব, শোকাদির অবশবর্ত্তিতা, দেবতান্তরে অনবজ্ঞা, ভূতগণের উদ্বেগের কারণ না হওয়া, সেবাপরাধত্যাগ, ঈশ্বর এবং তাঁহার ভক্তের প্রতি বিদ্বেষনিন্দাদি সহ্য করিতে না পারা, এই দশটি অভাব পক্ষের ভক্ত্যঙ্গ। চিহ্নধারণ, নৃত্য, দণ্ডাবনতি, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, গীত, সঙ্কীর্ত্তন, জপ, বিজ্ঞপ্তি, আত্মনিবেদন প্রভৃতি অবশেষ চৌয়াল্লিশ অঙ্গ লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ চৌষট্টি। এই সকল সমুদায় অঙ্গ সাধন করিতে হইবে তাহা নহে। এক অঙ্গ বা বহু অঙ্গ লইয়া সাধন হইতে পারে। শাস্ত্রোক্ত এই সকল অঙ্গের সাধন বৈধী ভক্তিতে প্রধান।

রাগাত্মিকা ভক্তি দ্বিবিধ। কামরূপা এবং সম্বন্ধরূপা। সমুদায় কামের বিষয়কে অবিশুদ্ধতা পরিত্যাগ করাইয়া প্রীতিপাত্রের সুখার্থ নিয়োগ কামরূপা। ঈশ্বরে পিতৃত্বাদি অভিমান সম্বন্ধরূপা। রাগাত্মিকা ভক্তিতে ঈশ্বরের লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন এবং তদুপযোগী ভক্ত্যঙ্গ সাধন বিহিত।

[ভাব] ভাব প্রেমসূর্য্যের কিরণসদৃশ, ইহা প্রেমের প্রথমাবস্থা। ইহাতে ইষ্টবিষয়ে রুচি হয় এবং সেই রুচি দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়। সাধনে অথবা

ঈশ্বর বা তদ্ভক্তের অনুগ্রহে ভাবোদয় হয়। সচরাচর সাধারণ লোকের সাধন দ্বারা ভাবোদয় হইয়া থাকে; অনুগ্রহে ভাবোদয় অতি অল্প লোকের সম্বন্ধে ঘটে। ভাবোদয় হইলে ক্ষোভের বিষয় উপস্থিত হইলেও ক্ষোভ হয় না, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভিন্ন বৃথা সময় হরণ নিবৃত্ত হয়, ইন্দ্রিয়ভোগবিষয়ে বিরাগ জন্মে, শ্রেষ্ঠ হইয়াও তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র অভিমান থাকে না, ঈশ্বর-প্রাপ্তির আশা সুদৃঢ় হয়, অভীষ্ট দেবতাকে লাভ করিবার জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠা জন্মে, ঈশ্বরের নাম গানে সর্ব্বদা রুচি, তাঁহার গুণগানে সর্ব্বদা আসক্তি, এবং তাঁহার বসতিস্থলে বাস করিতে একান্ত প্রীতি হয়। ভাবোদয় হইলেও ভক্তে দোষ থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা লইয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ উচিত নয়; কেন না, তিনি ভাবোদয়ে কৃতকৃত্য হইয়াছেন। তাঁহার দোষ চন্দ্রস্থ কলঙ্করেখার ন্যায়।

[প্রেম] ভাব গাঢ় হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয়। ইহাতে হৃদয় সম্যক্ নির্ম্মল হয়, ইষ্টে অতিশয় মমতা জন্মে। এই প্রেমও দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। এক ভক্তির অন্তরঙ্গ অঙ্গসকল সাধন করিতে করিতে ভাবোদয় হয়, সেই ভাব গাঢ় হইয়া প্রেম হয়। দ্বিতীয় ঈশ্বর আপনি অনুগ্রহ করিয়া সাক্ষাৎপ্রদান করাতে প্রেমোদয় হইয়া থাকে। প্রেম দুই প্রকার;—মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত এবং মাধুর্য্যজ্ঞানযুক্ত। ঈশ্বরের মহিমাজ্ঞান হইতে মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম হয়, এটি বৈধী ভক্তিতে হইয়া থাকে; রাগাত্মিকা ভক্তিতে প্রায়শঃ মাধুর্য্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম হয়।

এইরূপে ক্রমে প্রেমোদয় হইয়া থাকে;—সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা, [শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস] তদনন্তর সাধুসঙ্গ, তদনন্তর ভজনা, তদনন্তর অনর্থনিবৃত্তি, [ভজনের বিঘ্ন সকলের তিরোধান] তদনন্তর নিষ্ঠা, তদনন্তর রুচি, তদনন্তর ভাব, তদনন্তর প্রেম। এই প্রেমোদয় হইলে আর বাহিরের সুখদুঃখজ্ঞান থাকে না; সুখ দুঃখ কেবল ঈশ্বরের প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তিতে।

[ভক্তিরস] ঈশ্বরেতে রতি স্থায়ী ভাব। এই স্থায়ী ভাব বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক এবং সঞ্চারী ভাব সহযোগে ভক্তিরসরূপে পরিণত হয়। ইহাতে ভক্তহৃদয়ে চমৎকার ভক্তিরসাস্বাদ হইয়া থাকে। ঈশ্বর এবং তাঁহার ভক্ত আলম্বন বিভাব, ঈশ্বরের গুণাদি এবং ভক্তের ঈশ্বরজন্য চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় অর্থাৎ সুখদুঃখাদিবোধশূন্যতা, এই সকল সাত্ত্বিক ভাব। নির্ব্বেদ, বিষাদ,

দৈন্য, গ্লানি প্রভৃতি তেত্রিশটি সঞ্চারী ভাব। ঈশ্বরে রতি পাত্রভেদে ভিন্ন হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, প্রিয়তা, এই পাঁচ প্রকারে উহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। যখন কোন সাধকে ইহার এক একটি মাত্র প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে কেবলা রতি, এবং যখন বিমিশ্রভাবে উপস্থিত হয় তখন তাহাকে সঙ্কুলা রতি বলে। কিন্তু এতন্মধ্যে যিটি প্রধানতঃ প্রকাশ পায়, তদনুসারে সাধকের ভাব নিরূপিত হইয়া থাকে।

[ শান্ত ] শমদমাদিপরায়ণ জ্ঞাননিষ্ঠ যোগিগণেতে শান্ত রতি দৃষ্ট হয়। ইহাতে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধান। মহান্ ঈশ্বর এবং আত্মারাম শান্ত ঋষিগণ ইহাতে আলম্বন। উপনিষৎশ্রবণ, বিবিক্তবাস, তত্ত্ববিচার, বিশ্বরূপ-দর্শনাদি ইহাতে উদ্দীপন। নিরপেক্ষতা, নির্ম্মমতা, নিরহঙ্কারিত্ব, মৌন, জীবন্মুক্তিতে সমাদর, ইত্যাদি অনুভাব। প্রলয় ভিন্ন রোমাঞ্চ স্বেদ কম্পাদি সাত্বিক ভাব। নির্ব্বেদ, ধৃতি অর্থাৎ দর্শন জন্য সুখদুঃখাভাব এবং মনের নিশ্চাঞ্চল্য, হর্ষ, মতি, স্মৃতি প্রভৃতি সঞ্চারি ভাব। শান্ত পরোক্ষ এবং সাক্ষাৎকারভেদে দ্বিবিধ। যেখানে উদ্দেশে ভক্তি উদ্রিক্ত হয় সেখানে পরোক্ষ এবং যেখানে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তি উদ্রিক্ত হয় সেখানে সাক্ষাৎকার।

[ প্রীতি ] প্রীতিরস দাস্য, এবং লাল্যত্বভেদে দ্বিবিধ। ইহার একটীকে সম্ভ্রমপ্রীতি, অপরটীকে গৌরবপ্রীতি বলে। দাসগণের ঈশ্বরে সম্ভ্রমপূর্ব্বক এবং পুত্রত্বাদি অভিমানিগণের গৌরবপূর্ব্বক প্রীতি হয় বলিয়া একটীর নাম সম্ভ্রমপ্রীতি অপরটীর নাম গৌরবপ্রীতি। হরি এবং তাঁহার দাস-গণ একটীতে, হরি এবং তাঁহার লাল্যগণ অপরটীতে আলম্বন। ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি, কৃপা, শরণাগতপালকত্ব, ক্ষমাশীলত্ব প্রভৃতি গুণ একটীতে; রক্ষকত্ব, পালকত্বাদি গুণ অপরটীতে প্রধান। এ দুয়েতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্তি এবং স্নেহদৃষ্টি প্রভৃতি উদ্দীপন। আদেশপ্রতিপালন, প্রভুর নিকটে যাহারা প্রণত তাহাদিগের প্রতি মৈত্রী, ইত্যাদি একটীর অনুভাব; স্বেচ্ছা-চার পরিত্যাগ প্রভৃতি অপরটীর অনুভাব; হর্ষ নির্ব্বেদ প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব। প্রাচীনগণ দাস্যভাবকে সর্ব্বপ্রধান গণ্য করিতেন, এবং ইহাকেই তাঁহারা ভক্তিরস বলিয়াছেন।

[ রসত্রয় ] সখ্যরসকে প্রেয়োরস বলে। ইহাতে ঈশ্বর এবং তাঁহার সখাগণ আলম্বন। বৎসলরসে ঈশ্বরে বাৎসল্য অর্থাৎ আদরাধিক্য প্রকাশ পায়।

মধুর রস—সতী স্ত্রীর কামগন্ধশূন্য স্বামীর প্রতি একান্ত প্রীতির ন্যায়—ঈশ্বরে প্রীতি। [এই সকল রসের বিস্তারিত বর্ণন সময় ও স্থানোপযোগী নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। ]

[ভক্তিতে উপাস্য] ভক্তিতে উপাস্য কি ছিল নির্ণয় করিয়া আমরা প্রাচীন ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা সাঙ্গ করিতেছি। এ বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভক্তির প্রধান প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ উপাসকগণের উপাস্য কি স্থির করিয়াছেন, আমাদিগের দেখা উচিত। তিনি যখন গোকুলে নন্দকে শক্র-যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করেন, তখন প্রাকৃতিক পদার্থসকলের অর্চ্চনা উপদেশ করেন। আবার বসুদেব যখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তখন তিনি বলেন; "অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যঃ সচরাচরম্।" হে আর্য্য! হে যদুশ্রেষ্ঠ! আমি, তোমরা, ইনি [বলদেব] এই সমুদায় দ্বারকাবাসী, এমন কি সমুদায় চরাচর এইরূপ ব্রহ্মদৃষ্টিতে চিন্তা করিতে হইবে। ভক্তিমীমাংসাসূত্রকার শাণ্ডিল্য এই জন্যই গীতার অভিপ্রায়ানুসারে লিখিয়াছেন; "ভজনীয়েনাদ্বিতীয়মিদং কৃৎস্নস্য তৎস্বরূপত্বাৎ" অদ্বিতীয় এই জগৎ ভজনীয়, কেন না, সমুদায় জগৎ ঈশ্বরের স্বরূপ। সমুদায় জগৎ চিন্তার বিষয় হওয়া অসম্ভব, এজন্য ঈশ্বরের প্রকাশের তারতম্যানুসারে জগতের কোন অংশকে উপাস্য বলিয়া শাস্ত্রে স্থির করা হইয়াছে। যথা ভাগবতে লিখিত হইয়াছে; "তত্রৈব ভগবান্ রাজংস্তারতম্যেন বর্ত্ততে। তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুষো যাবানাত্মা যথেয়তে॥" হে রাজন্? মনুষ্য, তির্য্যক, ঋষি, দেবতাতে ভগবান্ তারতম্যে অবস্থিত। সুতরাং যাহাতে জ্ঞানাংশ যত অধিক প্রকাশ পায় তাহাই তত অর্চ্চনার বিষয়। মনুষ্য তির্য্যগাদিতে ভগবানের প্রকাশ যত হউক না, যাঁহার নিকট যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তিনি তাহার নিকট ভগবানের বিশেষ প্রকাশ স্থল। সুতরাং গুরুকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করা সর্ব্বোচ্চ বিষয়। "যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ। মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥" সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞানদীপপ্রদ গুরুতে যাহার মনুষ্যবুদ্ধি, তাহাব সমুদায় শাস্ত্রাভ্যাস কুঞ্জরশৌচবৎ বিফল। এই গুরুতে ভক্তি করিলেই কামাদি সমুদায় দোষ বিনষ্ট হয়। "এতৎসর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষোহ্যঞ্জসা জয়েৎ।" গুরুকে ঈশ্বর বলা উপচার মাত্র নয়, কারণ, পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে;—"এষ বৈ

মন্যতে নরম্‌॥” ইনিই সাক্ষাৎ ভগবান্‌, প্রকৃতি এবং জীবের ঈশ্বর। যোগেশ্বরেরা ইহাঁরই চরণ অন্বেষণ করেন, অথচ লোকে ইহাঁকে মনুষ্য বলিয়া মনে করে।

বিশেষ সময়ে যিনি সাধারণ লোকের আচার্য্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, সমুদায় পৃথিবীকে নূতন ধর্ম্ম অর্পণ করেন, তিনি সর্ব্বজন গুরু বলিয়া সাক্ষাৎ ভগবানের অবতাররূপে গৃহীত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ এই জন্য স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব আপনি ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিলেও প্রধান প্রধান শিষ্যগণ এই কারণেই তাঁহার ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। গুরুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করা ভক্তিশাস্ত্রের প্রধান ব্যাপার। তবে যে মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করা সে কেবল নিম্নাধিকারীর জন্য। পূর্ব্বে মূর্ত্তি গঠন করা ছিল না, কেবল লোকের পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধাই মূর্ত্তিগঠনের মূল। “দৃষ্ট্বা তেষাং মিথোনৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ। ত্রেতাদিষু হরেবর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা”॥ হে নৃপ! পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞা দর্শন করিয়া অর্চ্চনা জন্য ত্রেতাযুগ হইতে কবিগণ কর্ত্তৃক পুত্তলিকা প্রচলন করা হইয়াছে। কিন্তু যদি উপাসকের মনুষ্যাদিতে প্রকাশিত পুরুষের প্রতি বিদ্বেষ থাকে, পুত্তলিকা অর্চ্চনা করিয়া কিছু হয় না। “উপাসত উপাস্তাপি নার্থদা পুরুষদ্বিষাম্‌॥” এই গুরুকে পূর্ব্বে অষ্টভুজ বা চতুর্ভুজ রূপে দর্শন করিয়া পূজা করা হইত। পরিশেষে এই কাল্পনিকাংশ পরিত্যাগ করিয়া দ্বিভুজরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। “স্থূলমষ্টভুজং প্রোক্তং সূক্ষ্মঞ্চৈব চতুর্ভুজম্‌। পরন্ত দ্বিভুজং প্রোক্তং তস্মাদেতত্রয়ং যজেৎ॥ অষ্টভুজ মূর্ত্তি স্থূল, কেন না ইহাতে সমুদায় জগৎকে এইরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। চতুর্ভুজ সূক্ষ্ম, কেন না সেই চরাচরের অভ্যন্তরবর্ত্তী অন্তর্যামী পুরুষকে সূক্ষ্মতত্ত্ব সহ এতদ্দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিভুজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কেন না যাঁহাতে ঈশ্বরের বিশেষ বিকাশ হয় কেবল তাঁহাকেই ইহাতে চিন্ময় ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ঈশ্বরের অনন্ত মূর্ত্তি, যে তাঁহাকে যেরূপে চিন্তা করে তিনি তাহার নিকটে সেইরূপে প্রকাশিত হন, প্রাচীন বৈষ্ণবগণের এই মত।

ভক্তিশাস্ত্রের অর্চ্চনাতে ঈশ্বর একাকী পূজিত হন না, সপার্ষদ তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। সনক সনন্দ নারদ প্রভৃতি বিষ্ণুর পার্ষদ, গোপ গোপিনী গোপবালক কৃষ্ণের পার্ষদ। অর্চ্চনাকালে ইহাঁদিগকে ঈশ্বরের সঙ্গে গ্রহণ করার গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। ইহাঁরা ভক্ত; ইহাঁদিগকে চিন্তা করিয়া তন্ময়

এই ছয় জনের অনুবর্ত্তী। এই ছয় গোস্বামীর শিষ্যেরা এখন শিষ্যদিগকে ছড়িদার ফৌজদার দ্বারা শাসন করেন, তাহাদিগের নিকট কর সংগ্রহ করেন, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র কার্য্যবিভাগ আছে। সখীভাবক, রাধাবল্লভী, বলরামী, গৌরবাদী, খুসিবিশ্বাসী, সহজী, আউল, সাঁই, দরবেশ, ন্যাড়া, বাউল, সাহেবধনী, রামবল্লভী, কর্ত্তাভজা, স্পষ্টদায়ক প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা গত চারি শত বৎসরের মধ্যে চৈতন্যের মূল বৃক্ষ হইতে বাহির হইয়াছে। এ সকল সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক অধিকাংশ সামান্য অজ্ঞান লোক, ইহাদের অনেকের ব্যবহার অতিশয় জঘন্য, কেহ কেহ উৎকৃষ্ট মত ও তত্ত্ব কথা প্রচার করে বটে, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার সাধারণ ভদ্রসমাজের নিকট অতিশয় ঘৃণিত। সামান্য লোকেরাই প্রায় ইহাদের শিষ্য।

প্রথমাবস্থায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়মধ্যে নাম গান, মালা জপ, উপবাস, দেবপূজা, ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদি চৌষট্টি প্রকার সাধনবিধি চলিত ছিল; এক্ষণে তাহার বাহ্য আড়ম্বর কিছু কিছু বিদ্যমান আছে। নিত্যানন্দ ভেক্ দিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। মস্তক মুণ্ডন, ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস, তিলক, জপমালা, কণ্ঠমালা, করঙ্গ কন্থা গ্রহণ করিয়া গোসাঞীকে পাঁচ সিকা দক্ষিণা দিলেই বৈষ্ণব বৈষ্ণবী হওয়া যায়। ভেকধারীদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই, বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ভদ্র গৃহস্থগণ হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করেন। চৈতন্যের ধর্ম্ম অত্যন্ত সহজ, অল্প ব্যয়ে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, এইজন্য দুঃখী অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী। নিতাই আবার ইহাকে আরও সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি গৌরপ্রচারিত ভক্তিধর্ম্মের বাহ্য আকার ও সহজসাধ্য আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করেন। ইহার সাধন ভজন শাস্ত্র ভাষা গীত বাদ্যযন্ত্র অতি সহজ এবং সুলভ। গ্রাম্য সুরের গীত, এবং সহজ রচনা সকলেরই বোধগম্য। বৈরাগী বৃক্ষমূলে কুটীরে বাস করিবে, কৌপীন বহির্ব্বাস পরিবে, হরি বলিয়া ভিক্ষা করিলেই তণ্ডুল পাইবে, বিবাহ শ্রদ্ধাদি অনুষ্ঠানের ব্যয় পাঁচ সিকা, ঝুলি করোয়া কন্থা সম্পত্তি, সহজবোধ্য কবিতা গাথা পদাবলী ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এব পরিবারে বদ্ধ হইবে, দ্বারে দ্বারে পথে পথে হরিনাম কীর্ত্তন করিবে, এ সমস্ত আচার ব্যবহারের মধ্যে গৌর নিতাই ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রকৃতি দৃষ্টিগোচ হয়। কিন্তু এইরূপ রসোদ্দীপক সহজ প্রণালী বলিয়াই দুষ্ট লোকেরা প চরিতার্থের উপায়রূপে ইহা গ্রহণ করিয়াছে।

চৈতন্যদেব যদি গভীর জ্ঞানগর্ভ বিশুদ্ধ যুক্তিসঙ্গত বিস্তীর্ণ ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিবিজ্ঞান কিম্বা সাধনপ্রণালী প্রচার না করিলেন, তবে তিনি কি করিলেন? তিনি দুই বাহু তুলিয়া আনন্দভরে একবার নাচিলেন, আর চারিদিকের লোকেরা ছায়াবাজীর পুত্তলিকার ন্যায় নাচিতে লাগিল। তিনি হরিবিরহে ব্যাকুল হইয়া চীৎকার রবে কাঁদিলেন, আর অমনি নয়নজলে সকলের বক্ষ ভাসিল। একবার ভীম গর্জ্জনে হরিনামের হুঙ্কার প্রদান করিলেন, অমনি মোহনিদ্রাচ্ছন্ন মানবসমাজ সচকিত নেত্রে জাগিয়া উঠিল। বক্ষ বিস্তার করিয়া দীনাত্মা পতিত চণ্ডালদিগকে আলিঙ্গন দিলেন, তাহা দেখিবা মাত্র সকলের প্রাণ বিমুগ্ধ হইল। আর কি করিলেন? সংসার বাসনার মস্তকে পদাঘাত করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন, আচণ্ডাল দুঃখীদিগকে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক কোলে গ্রহণ করিলেন, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে হরিনাম বিলাইলেন, বিনয়ী হইয়া পণ্ডিতগণের গর্ব্ব খর্ব্ব এবং নীচ জাতিকে উচ্চ করিলেন। আর কি করিবেন? প্রত্যেক কার্য্যে শত শত লোকের মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি কিছু শুনাইলেন না, সমস্ত দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার উদ্দণ্ড নৃত্যের ভীষণ পদাঘাতে পাষণ্ডহৃদয় কম্পিত হইত, ব্যাকুলতার উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি শুনিলে বুক ফাটিয়া যাইত; তাহার প্রেমবিস্ফারিত বদনকমলের উল্লাসকর হাস্যধ্বনি শ্রবণে প্রাণ পাগল হইয়া উঠিত; ভাবরসে ডগমগ পরম সুন্দর ভাগবতী তনু দর্শন করিলে মন নৃত্য করিত। যে ভাবে জননী ও সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন সেই জলন্ত বৈরাগ্যের আশ্চর্য্য বিবরণ শুনিলে প্রাণ এখনও উদাস হয়। পতিতপাবন হরিরনামে তিনি অদ্ভুত ভোজবাজী করিতেন। ভগবান্ হরির প্রেমমুখের মধুর হাসি ও সৌন্দর্য্যরসে মজিলে মানুষ কিরূপ অবস্থাপন্ন হয় তাহাই কেবল তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়া তাহাতে প্রমত্ত হওয়া তাঁহার কার্য্য ছিল। দর্শন, স্পর্শ আলিঙ্গন দ্বারা সেইরূপ গুণে মজিয়া তিনি পাগল হইয়াছিলেন। এমন সুমিষ্ট ভক্তিযোগ, ভগবানের সহিত জীবের এতাদৃশ ব্যক্তিগত প্রেমব্যবহার কোন ধর্ম্মে দৃষ্ট হয় না। যেমন তাঁহার বৈরাগ্য তেমনি ভাবুকতা। যদি কেহ তাঁহার স্বরূপ মূর্ত্তি দেখিতে চাও, তবে বন্ধুগণে মিলিত হইয়া মৃদঙ্গ করতালের সহিত গভীর স্বরে হরিনাম গান কর। তাহাতে যখন মন মাতিবে, হৃদয় গলিবে, নয়নে অশ্রুধারা বহিবে, শরীর রোমাঞ্চিত ও

পুলকিত হইবে, এবং প্রেমময় হরির মাধুর্য্যরসসাগরে চিত্ত ডুবিবে, তখ
সেই ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কিম্বা নামরসের মত্ততার মধ্যে প্রেমনয়ন উন্মীলি
করিলেই দেখিবে যে সোণার গৌরাঙ্গ দুনয়নে আনন্দ ধারা বর্ষণ করি
তেছেন আর নাচিতেছেন। এই তাঁহার বাহিরের রূপ। ভিতরের রূপ
ইহা অপেক্ষা আরো মনোহর। যখন যে হরিনামরসে মজে, তখনই সে
গৌরভাবাপন্ন হয়; যখন যে বিষয়বাসনা ছাড়িয়া প্রেমামৃত পান ও
বিতরণ করে, তখনই সে চৈতন্য হয়; তিনি ভক্তের শোণিতের সঙ্গে মিশিয়া
গিয়াছেন, কোন কালে আর সে রূপের ধ্বংস হইবে না।

ভক্তরাজ চৈতন্যচন্দ্রের পরমার্থ বিষয়ক মত সম্বন্ধে বঙ্গীয় যুবকগণ
যেরূপ ভাব পোষণ করিতে ইচ্ছা করেন করুন, কিন্তু তাঁহার নিকট যাহা
শিক্ষা করিবার আছে তাহা হইতে কেহ যেন বঞ্চিত না হন। তিনি
সাকারোপলক্ষে প্রেমভক্তি অর্পণ করিতেন, তোমরা না হয় তাহা নিরাকারে
অর্পণ কর। সুযুক্তি সুশাস্ত্র বিশুদ্ধ সংস্কৃত মত লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলেত
চলিবে না। গৌরাঙ্গ যে প্রগল্‌ভা ভক্তি প্রেম মহাভাব বৈরাগ্য অনাসক্তি
সাধুভক্তি শিষ্যবৎসলতা ভ্রাতৃপ্রেম বিনয় উৎসাহ জিতেন্দ্রিয়তা তেজস্বিতা
ঐকান্তিক আস্থা সাধুভাব জীবে দয়া নামে ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মভাব প্রদর্শন
করিয়া গেলেন তাহা পৃথিবী চিরকাল তাঁহার পদতলে পড়িয়া শিক্ষা করুক।
এ সকল ভাব বিনষ্ট হইবার নহে, ভগবদ্ভক্তগণের উপেক্ষণীয়ও নহে।

দয়াল শ্রীচৈতন্য পৃথিবীকে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন শিখাইয়া গিয়াছেন, যদি
কেহ তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া সুখী এবং পুণ্যাত্মা হইতে চাও,
তবে কখন একাকী কখন সবান্ধবে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কর।

দয়াময় হরি তাঁহার প্রিয় ভক্ত গৌরাঙ্গের দ্বারা অভূতপূর্ব্ব ভক্তিলীলা
দেখাইয়া বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কোটি কোটি
প্রণাম। চৈতন্য প্রভুর চরণেও সহস্র সহস্র নমস্কার।